

চারটি রহস্য উপন্যাস

অনীশ দেব

চারটি রহস্য উপন্যাস

চারটি রহস্য উপন্যাস

অনীশ দেব

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

CHARTI RAHASYA UPANYAS
By : Anish Deb
(A Collection of Four Thriller Novels)
Code : 48 C 22

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
www.devsahityakutir.com
Tel : 2350-4294/4295/7887
Email : dev_sahitya@rediffmail.com

ISBN. 978-81-945179-3-1

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৪২৭, জানুয়ারি ২০২১

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার ও শ্রীমতী রূপা মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার
কর্তৃক এ. টি. দেব প্রেস
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : রঞ্জন দত্ত

পাঁচঘড়া, সুভাষগ্রাম-এর
তীব্র পাঠক
রবি দাস
স্নেহাস্পদেষু

একমিনিট, আপনাকে বলছি

'বজ্রগোলাপ' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় পুজো সংখ্যা 'শুকতারা' পত্রিকায়। ঠিক একইরকম ইতিহাস 'সরি, রং নাম্বার' উপন্যাসটির। সেটিও প্রথম প্রকাশিত হয় পুজো সংখ্যা 'শুকতারা'-র পাতায়। 'তুমি পিশাচ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'শুকতারা' পত্রিকায়। আর এই সংকলনের শেষ লেখা 'আমি পিশাচ' প্রকাশিত হয়েছিল ২০০১ সালের 'কিশোর ভারতী' পুজো সংখ্যায়। তখন নাম দিয়েছিলাম 'পিশাচতিথি'। পরে 'আমি পিশাচ' নামে বই হয়ে বেরোয়।

এই হল এই চারটি লেখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মাননীয় রূপা মজুমদারের উদ্যোগে এই চারটি উপন্যাসকে একসঙ্গে করে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া গেল। এর প্রথম দুটো উপন্যাস থ্রিলারজাতীয়। আর শেষ দুটো লেখা 'পিশাচজাতীয়'—যা তাদের নাম থেকেই বোঝা যায়।

ব্যস, আমার কাজ শেষ। এবার হে পাঠক, আপনার কাজ শুরু। ইতি—

বিনীত

অনীশ দেব

৭ অক্টোবর, ২০২০
কলকাতা

সূচিপত্র

বজ্রগোলাপ





।।এক।।

ঘিয়া নদীর পাড়ে রাহুলের সঙ্গে কোকোর প্রথম দেখা হয়েছিল। ভিজে জামা-কাপড়ে একটা বটগাছের নীচে কোকো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

সেদিন আকাশে অনেক মেঘ ছিল। তাই বৃষ্টির আশায়-আশায় ছিল সবাই। কিন্তু সন্ধে পর্যন্ত বৃষ্টির দেখা মেলেনি। অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা থোকা-থোকা ঘন মেঘ মাথার ওপরে ঝুলছিল। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠছিল। আলোর পরই গুড়-গুড়াম। মেঘের ডম্বরু বাজছিল।

মোহনকুমার স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড-এর ফাইনাল ফুটবল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল রাহুল। সঙ্গে তিন বন্ধু—গোপাল, নিধু, আর দীপায়ন। খেলাটা ছিল ওদের পাশের গ্রামে—যে-গ্রামটার নাম ভারী অদ্ভুত : তিনমাইল। এই নামটার কারণ বাপির কাছে জানতে চেয়েছিল রাহুল। সে বেশ কয়েকবছর আগে—যখন ও ক্লাস ফাইভে পড়ত। তখন বাপি বলেছিল, ‘সাত বছর আগেও গ্রামটার কোনও নাম ছিল না। সবাই বলত মণিমেলার পাশের গ্রাম। তারপর ঘিয়া নদীতে নতুন ব্রিজ তৈরি হল। সেটা থেকে ওই গ্রামটার দূরত্ব মোটামুটি তিনমাইল। লোকের মুখে-মুখে ওই তিনমাইল দূরত্বের ব্যাপারটা ঘুরতে-ঘুরতে তা থেকে শেষ পর্যন্ত ওটা গ্রামের নাম হয়ে গেছে।’

তিনমাইলের ফুটবল খেলায় রাহুলরা কোনও দলের সাপোর্টার ছিল না। স্রেফ ফুটবল খেলার নেশাতেই ওরা চারজন ফাইনাল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল। ম্যাচ শেষ করে ফেরার সময় আকাশের অবস্থা ঠিক যেন বৃষ্টি হব-হব। তাই কখনও হেঁটে কখনও ছুটে ওরা মণিমেলার দিকে ফিরছিল।

একটু পরেই ওরা ঘিয়া নদীর পাড়ে পৌঁছে গেল। এবার নদী পেরোলেই মণিমেলা। উঁচু পাড় থেকে মাটির ঢাল জলের দিকে নেমে গেছে। নদীতে জল এখন বেশি নেই। গত দু-সপ্তাহে দু-তিনদিন বৃষ্টি হলেও বর্ষা সেরকমভাবে এখনও শুরু হয়নি। তাই ঘিয়া এখন শান্ত, নিরীহ। বর্ষার দাপটে এই শান্তশিষ্ট নদীটার রূপ বদলে যায়। তখন ঘিয়ার এত স্রোত থাকে যে, সাঁতরে এপার-ওপার করতেও ভয় হয়।

রাহুলরা নদীর পাড়ে যেখানটায় এসে দাঁড়াল সেখানে কোনও ব্রিজ নেই। তবে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা আছে। ছোট ডিঙিনৌকো—বড়জোর দশ-বারোজন দাঁড়াতে পারে। খেয়া পার হয়ে গেলে রাহুলদের বাড়িটা কাছাকাছি হয়। ব্রিজ দিয়ে ঘিয়া পেরোতে হলে অনেকটা ঘুরপথ হয়ে যায়।

রাহুল-গোপালরা সবাই সাঁতার জানে। তাই বেশ সহজভাবে ওরা নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল আর ফাইনাল খেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল।

কথা বলতে-বলতে রাহুল বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। যদি বৃষ্টি নামে তা হলে আর রক্ষে নেই। না, বৃষ্টিতে ভেজার ভয় ও করছে না। আসলে স্কুল-লাইব্রেরির দুটো গল্পের বই ও টেবিলের খোলা জানলার কাছে রেখে এসেছে। ওগুলো যদি ভিজে যায়!

ঘিয়া পার হয়ে ওরা চারজন নদীর পাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। ঠিক তখনই আচমকা ঝড় উঠল। ঠান্ডা বাতাস ওদের ঘিরে পাক খেতে লাগল আর কালো আকাশ থেকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টপাটপ করে পড়তে শুরু করল।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ ঝোড়ো বাতাসে হেলে পড়েছিল। ওদের ডালপালা-পাতা পতাকার মতো উড়ছিল।

চোখে হাত চাপা দিয়ে রাহুল ধুলো আটকাচ্ছিল। সেই অবস্থায় পা হড়কে গিয়ে ও বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। ততক্ষণে নিধু, গোপাল আর দীপায়ন নদীর ঢাল পেরিয়ে ওপরের কাঁচা রাস্তায় উঠে পড়েছে।

নিধু একবার চেঁচিয়ে রাহুলকে ডাকল, 'জলদি আয়। এখুনি জোরে বৃষ্টি আসবে...।'

সেই চেষ্টাই করছিল রাহুল। এছাড়া খোলা জানলার কাছাকাছি রাখা বইগুলো ভিজে যাবে, এই ব্যাপারটাও মাথায় ছিল। তাই আরও জোরে পা চালাল। আর ঠিক সেই সময়েই সীসের মতো আকাশে নীলচে সাদা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পলকের জন্য চারপাশটা আলোয় আলো হয়ে গেল। আর তখনই লোকটাকে দেখতে পেল ও। সঙ্গে-সঙ্গে বিকট শব্দে বাজ পড়ল।

নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ঝুরি-নামা একটা বটগাছের নীচে পড়ে আছে একটা মানুষ। রাহুলের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরে। এই মেঘলা কমজোরি আলোয় লোকটাকে হয়তো চোখেই পড়ত না যদি না ওর শরীর থেকে চকচকে কিছু একটা বিদ্যুতের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠত।

রাহুলের পথ বেঁকে গেল। ও পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

বৃষ্টি এখনও না পড়ার মতন, অথচ মানুষটার জামা-প্যান্ট সব জলে ভিজে সপসপে। পায়ে জুতো নেই। গায়ের রং ফরসা। তাই শরীরের কাটা দাগগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ছে। ছুরির ডগা দিয়ে কেউ যেন ওর হাত-পায়ে দাগ কেটেছে। সেই চেরা জায়গাগুলো থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

পাশ ফিরে মাটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে অসাড়ভাবে পড়ে আছে লোকটা। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝার উপায় নেই।

যে-জিনিসটা বিদ্যুতের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠেছিল এবার সেটার দিকে তাকাল রাহুল। গলায় আটকানো একটা মেটাল ব্যান্ড। অনেকটা কুকুরের বকলসের মতো। এক কি দেড় সেন্টিমিটার চওড়া।

রাহুলের একবার মনে হল, লোকটা কি নেশা করে পড়ে আছে? আবার মনে হল, লোকটা ঘিয়া নদীর জলে ভেসে আসেনি তো? ও ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ডাকল : 'এই যে, শুনছেন! এই যে—।'

কোনও সাড়া নেই।

লোকটা কি মরে গেছে? নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে?

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে মরিয়া হয়ে লোকটাকে ঠেলা মারল রাহুল : 'এই যে, শুনছেন!'

না, কোনও সাড়া নেই। শুধু বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ আর গাছের পাতার ছটফটানির আওয়াজ।

এদিকে রাহুলকে পিছনে দেখতে না পেয়ে নিধু-গোপালরা ফিরে আসছিল। রাহুলের নাম ধরে বারবার ডাকছিল।

দু-হাতে লোকটার ডানকাঁধ ধরে টান মারল রাহুল। লোকটার শরীরটা আধপাক ঘুরে চিত হয়ে গেল।

লোকটাকে ভালো করে দেখল রাহুল।

বয়েস কত হবে, বড়জোর সাতাশ-আটাশ। মাথায় কদমছাঁট চুল। ছোট-ছোট চোখ। নাকটা সামান্য থ্যাবড়া। ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে থাকায় দাঁত দেখা যাচ্ছিল।

রাহুল লক্ষ করল, লোকটার দু-গালে নতুন দশ পয়সার মাপের তিনটে কালচে গোল দাগ। কেউ যেন কড়ে আঙুল দিয়ে কাজলের টিপ পরিয়ে দিয়েছে।

লোকটার মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। একইসঙ্গে রাহুল ওকে ধাক্কা দিচ্ছিল, ডাকাডাকি করছিল।

এমন সময় গোপালরা রাহুলের কাছে পৌঁছে গেল। লোকটাকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিল, তর্ক জুড়ে দিল। আর লোকটার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। থুতনি ধরে এপাশ-ওপাশ নাড়তে লাগল। বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

ওরা এটুকু বুঝল, জামা-প্যান্ট ভিজে থাকলেও লোকটার শরীরে তাপ আছে। বুকে কান পেতে ধরলে ধুকপুকুনি দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকটা যে বেঁচে আছে তাদে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর শরীরের কাটা দাগগুলো এল কেমন করে? আর ওর গলার মেটাল ব্যান্ডটাই বা কী?

এর মধ্যেই ঝড় কিছুটা কমে গেছে। বৃষ্টি একটু জোরালো হয়েছে। গাছের পাতার খসখসানি শব্দও খানিকটা স্তিমিত। ওরা তখনও লোকটাকে জাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

হয়তো বৃষ্টির জল মুখে পড়ার জন্যই হঠাৎ লোকটা চোখ খুলে তাকাল। চারটে মুখ ওর ওপরে ঝুঁকে রয়েছে দেখে ভয়ের একটা চাপা চিৎকার করে উঠল।

নিধু ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। কোনও ভয় নেই।'

দীপায়ন জিগ্যেস করল, 'তুমি কে? নদীর পাড়ে এখানে কোত্থেকে এলে?'

লোকটা ভয়ের চোখে ওদের মুখগুলোর ওপরে একবার নজর বুলিয়ে নিল। তারপর ডানহাতটা শূন্যে তুলে নদীর দিকে দেখাল। যেদিক থেকে ঘিয়া নদী বয়ে আসছে সেদিকে। রাহুল লক্ষ করল, লোকটার হাত কাঁপছে।

রাহুল তাকাল নদীর উজানের দিকে। তা হলে কি লোকটা নদীর জলে ভেসে এসেছে?

রাহুল জিগ্যেস করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

লোকটা সরল চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল রাহুলের দিকে। তারপর দু-হাতের আঙুল এমনভাবে ঘোরাল যার মানে কোথায় যাবে ও জানে না।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' গোপাল জানতে চাইল।

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। শূন্য চোখে গোপালের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে?' রাহুল জিগ্যেস করল।

ভাঙা কর্কশ গলায় লোকটা টেনে-টেনে জবাব দিল, 'কেউ...নেই।' মনে হচ্ছিল ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

রাহুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই লোকটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল।

'কেউ...নেই। কেউ...নেই।' বলতে লাগল বারবার এবং হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। রাহুলের পায়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাগলের মতো পায়ে মাথা ঘষতে লাগল আর কাঁদতে লাগল।

রাহুল কোনওরকমে এক পা পিছিয়ে এল। সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে দাঁড় করাল। লোকটা তখনও মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। গুঙিয়ে-গুঙিয়ে কী বলছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

রাহুল অবাক হয়ে লোকটার সরল কান্না-ভেজা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দীপায়ন, নিধু আর গোপাল তখন নিজেদের মধ্যে কথাবলাবলি করতে লাগল।

কী করা যায় লোকটাকে নিয়ে?

কেউ বলল, 'ছাড় তো। ও এখানেই পড়ে থাক। পরে যেখানে যায় যাবে।'

একজন বলল, 'চল, আমরা গিয়ে থানায় খবর দিই...।'

আর-একজন বলল, 'দাদাদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে হত।'

'না, তার চেয়ে বরং পার্টি অফিসে নিয়ে চল। ওরা থানা-পুলিশ যা করার করবে।'

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এরকম এলোমেলো কথাবার্তা শোনার পর রাহুল ফস করে বলে উঠল, 'আমি ওকে বাড়িতে নিয়ে যাব।'

সঙ্গে-সঙ্গে নিধু, গোপাল আর দীপায়ন চুপ করে গেল। ওরা এমন চোখে রাহুলের দিকে তাকাল যেন রাহুলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

রাহুল ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া আহত লোকটার দিকে তাকাল। হাত বাড়াল ওর দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা এমনভাবে ওর হাতটা আঁকড়ে ধরল যেন এটা ছেড়ে দিলে ও আর বাঁচবে না। ভয়ের চোখে রাহুলের দিকে

তাকাল।

রাহুল চাপা গলায় ওকে বলল, ‘কোনও ভয় নেই।’

নিধু, গোপাল আর দীপায়নের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে রাহুল এগোল। ওর হাত আঁকড়ে ধরে মাথা নীচু করে লোকটাও এগোল।

বৃষ্টি আরও বেড়ে গেছে। ওদের জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে। গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ হচ্ছে। ভেজা মাটি থেকে বৃষ্টির অদ্ভুত গন্ধ উঠছে।

দীপায়নদের নানান উপদেশ আর খোঁচার জবাবে রাহুল বলল, ‘আজ রাতটা তো ও আমাদের বাড়িতে থাক। কাল সকালে বাপি যা করার করবে...।’

কাঁচা রাস্তায় বৃষ্টির জল পড়ে কাদা তৈরি হচ্ছিল। তার ওপরে ওরা ছপছপ শব্দে পা ফেলে এগোচ্ছিল। খালি পায়ে চলার জন্য লোকটার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ, পথের নানা জায়গায় ইট-পাথরের টুকরো, গাছের ভাঙা ডাল মাড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু লোকটা মুখে টুঁ শব্দটিও করছিল না। সরল মুখে মাথা নীচু করে হাঁটছিল।

একটা পুকুরের কাছে এসে রাহুলের পথ আলাদা হয়ে গেল। ও লোকটাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। গোপালদের বলল যে, কাল কী হয় না হয় সেটা কাল ওদের জানাবে।

রাহুল বৃষ্টিতে বেশ ভিজে গেছে। ও বাঁ-হাতের পাতা কপালের সামনে গাড়িবারান্দার মতো রেখে বৃষ্টির ছাট আটকাতে চেষ্টা করছিল। লক্ষ করল, এতটা পথ আসার সময় লোকটা একবারও বৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করেনি। বরং এমনভাবে ও পথ চলছে যেন বৃষ্টি পড়ছেই না।

রাহুল হঠাৎই ওকে জিগ্যেস করল, ‘তোমার নাম কী?’

লোকটা ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ভাবলেশহীন নিষ্পাপ মুখ। কোনও উত্তর দিল না।

রাহুল আবার একই কথা জিগ্যেস করল।

কোনও উত্তর নেই।

তবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রাহুলের মনে হল, ও যেন তীব্রভাবে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করছে। হয়তো ওর নামটাই মনে করার চেষ্টা করছে।

রাহুল হাল ছাড়ল না। তৃতীয়বার ওর নাম জানতে চাইল।

এবার লোকটা ভাঙা কর্কশ গলায় টেনে-টেনে জবাব দিল, ‘কোকো। আমার নাম কোকো। কো-কো...।’

কোকো! কী অদ্ভুত নাম! আপন-মনেই ভাবল রাহুল।

কালচে আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

বাড়ির সামনে এসে গিয়েছিল রাহুল। বাউন্ডারির গ্রিলের গেটের হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকল। ওর হাত আঁকড়ে থাকা কোকোও ঢুকে পড়ল ওর সঙ্গে।

বাউন্ডারির গেট থেকে ইট-পাতা পথ চলে গেছে একতলা বাড়িটা পর্যন্ত। বাড়ির বাঁ-দিকটায় বেশ কয়েকটা গাছপালা। অযত্নে বেড়ে ওঠা বাগান। তার একটা ছোট অংশে অনেক ফুলগাছ। আর তার পাশে একটা টিউবওয়েল।

ইট-পাতা পথ ধরে এগোতে-এগোতেই রাহুল চেঁচিয়ে মা-কে ডাকল, ‘মাম, শিগগির দরজা খোল। একেবারে ভিজে গেছি।’

বাড়ির দরজায় পৌঁছে মা-কে আরও একবার ডাকল রাহুল। একইসঙ্গে কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে গেল। মা দরজায় দাঁড়িয়ে। ওকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘ঠিক জানতাম আজ তুই বৃষ্টিতে ভিজবি। তোর বাপিকে বলছিলাম...’ মায়ের কথা মাঝপথেই থেমে গেল, কারণ কোকোকে তিনি এইমাত্র খেয়াল করেছেন।

রাহুলের মা গলা নামিয়ে ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, ‘এ কাকে সঙ্গে এনেছিস?’

রাহুল বলল, ‘মাম, ওর নাম কোকো। ওর খুব বিপদ। ঘিয়ার পাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল...।’

।।দুই।।

পরদিনটা ছিল রবিবার। রবিবারটা সবসময়েই রাহুলের কাছে কেমন যেন অন্যরকম দিন বলে মনে হয়। সেদিন সকালে যে-সূর্যটা ওঠে সেটা অন্যরকম। সকালে যে-পাখিগুলো ডাকে তাদের ডাকগুলো আলাদা। ওদের বাগানে যে-ফুলগুলো ফোটে রবিবার তাদের একটু বেশি হাসিখুশি বলে মনে হয়।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাহুল সেই ‘অন্যরকম’ সকালটাকে অনুভব করল। তারপরই ওর মনে পড়ে গেল কোকোর কথা।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখল রাহুল। ছেঁড়া-ছেঁড়া ছাই-রঙা মেঘ। তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ভোরের খবর পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে। গাছের চকচকে সবুজ পাতায় সেই আলো ঠিকরে যাচ্ছে। কাল সন্ধের বৃষ্টিতে পাতাগুলো স্নান-টান সেরে আজ একেবারে ঝক-ঝকে হয়ে সেজে উঠেছে। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ভেসে বেড়াচ্ছে পাখির ডাক।

আজ সকালটাকে দেখে মনেই হয় না কাল সন্ধেয় ওরকম ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল।

বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল রাহুল। আর তখনই কোকোকে দেখতে পেল।

বারান্দার ডানদিকে ফুলের বাগান। সেখানে অনেকগুলো সূর্যমুখী ফুলের গাছ। এখন দু-চারটে ফুল ফুটেছে—বাকি সব কুঁড়ি। তার পাশেই কয়েকটা বেলফুল আর গোলাপের গাছ। তাতে সাদা আর গোলাপি ফুল। নাকে না হলেও মনে-মনে ফুলের গন্ধ পেল রাহুল। নাক টেনে চোখ বুজল ও।

চোখ খুলতেই কোকোকে দেখতে পেল। একটা জামগাছের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে নেচে-নেচে ছুটে বেড়াতে লাগল আর একই সঙ্গে হাততালি দিতে লাগল।

ভালো করে খেয়াল করতেই রাহুল একটা হলদে-কালো প্রজাপতিকে দেখতে পেল। প্রজাপতিটা ফুলের বাগানে এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে আর কোকো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওটার পিছন-পিছন ছুটছে।

না, প্রজাপতিটা ধরার জন্য ও মোটেই ছুটছে না। বরং এক বিচিত্র উল্লাসে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ওটাকে অনুসরণ করছে।

সাতাশ-আটাশ বছরের ছেলেটাকে একটা বাচ্চা ছেলে বলে মনে হল রাহুলের। সরল ভোলাভালা চোখ, শরীরের কাটা-ছেঁড়া সম্পর্কে উদাসীন, কোথা থেকে ও এসেছে, কোথায় যাবে, সে-সম্পর্কে ওর চিত্ত ভাবনাহীন।

বারান্দার গ্রিলের দরজা ঠেলে সরিয়ে দু-ধাপ সিঁড়ি নামল রাহুল। পায়ে-পায়ে বাগানের দিকে এগোল।

বাগানের মাটি ভেজা। কোথাও-কোথাও কাদা প্যাচপেচে হয়ে আছে।

ফুলগাছগুলোর দিকে তাকাল রাহুল। হলদে-কালো প্রজাপতিটা ছাড়াও কয়েকটা ফড়িং ওড়াউড়ি করছে সেখানে। কিন্তু কোকোর যত আগ্রহ প্রজাপতিটাকে নিয়ে।

রাহুলকে দেখতে পেয়েই খুশিতে উজ্জ্বল হল কোকোর মুখ। ও চেঁচিয়ে বলল, ‘এই...দ্যাখো। প্রজা...পতি। হলুদ...আর...কালো। প্রজা...পতি।’

একইরকম কর্কশ স্বর আর টেনে-টেনে কথা বলা। যেন ঠান্ডা লেগে বরাবরের জন্য গলা ভেঙে গেছে।

কোকোর উৎসাহ, খুশি, আর কথা বলার ঢং রাহুলের সমবয়েসি কোনও বন্ধুর মতন। কাল সন্ধে থেকেই ব্যাপারটা রাহুল লক্ষ করেছে। তাতে ও বেশ মজাও পেয়েছে।

প্রথমটায় কোকোকে দেখে রাহুলের মাম আর বাপি খুব অবাক হয়েছিলেন। কোকোকে বাইরের ঘরে বসিয়ে ভেতরের ঘরে রাহুলকে ডেকে নিয়ে মাম ওকে অনেক প্রশ্নও করেছেন।

সেসব কথা শুনতে পেয়ে বাড়ির ভেতর থেকে বাপিও সেখানে এসে হাজির হয়েছেন। দুজনের প্রশ্নের ঠেলায় রাহুলের তো অবস্থা কাহিল!

বাপি বললেন, ‘বোঝোই তো...দিন-কাল ভীষণ খারাপ। ওকে তুমি চেনো না, জানো না...।’

সেইসঙ্গে মাম যোগ করলেন : 'তা ছাড়া ওর গায়ে অত জায়গায় কাটা...রক্ত পড়ছে। কে জানে খুন-টুন করে পালিয়ে এসেছে কি না। তারপর থানা-পুলিশ হয়ে একেবারে কেলেংকারি হবে।'

রাহুল অবাক হয়ে বলল, 'তা হলে কোকো এখন কোথায় যাবে, মাম? ওর তো কেউ নেই! ও মনে হয় ঘিয়ার জলে ভেসে এসেছে। বললাম তো, ভিজে জামাকাপড়ে একটা গাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল...।'

বাপি কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'কাল থেকে সবাই তো ওর কথা জিগ্যেস করবে। তখন কী জবাব দেব?'

'কেন বাপি, যা সত্যি তাই বলবে!' রাহুল সঙ্গে-সঙ্গে সমাধান জুগিয়ে দিল, 'কোকো আমাদের কাছে থাকলে তাতে কার কী!'

'এভাবে বলতে নেই, রাহুল।' মাম ওকে শাসনের গলায় বললেন, 'তা ছাড়া তুমি তো জানো, এখন চার-পাশে যা চলছে তাতে কোনও অচেনা লোককে এভাবে শেলটার দেওয়া ঠিক নয়। কে বলতে পারে যে, লোকটা চোর কিংবা ডাকাত নয়! কাল বরং থানায়...।'

'আমি...চোর...না। আমি...ভালো।'

এ-কথা শুনে তিনজনেই চমকে ঘুরে তাকিয়েছে।

কোকো বাইরের ঘর ছেড়ে কখন যেন ঢুকে পড়েছে ভেতরের ঘরে। তারপর ওর ভাঙা গলায় নিজের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট নিজেই প্রচার করে চলেছে।

'বিশ্বাস...করো। আমি...চোর...না। আমি...খুব...ভালো।'

ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সরল ছেলেটার মুখে এ-কথা শুনে বাপি হেসে ফেললেন।

রাহুল ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'কোকো, তুমি খুব ভালো। গুড বয়।'

কোকো হাসল : 'আমি...গুড...বয়। আমি...গুড...বয়।'

মাম কোকোর দিকে চেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

রাহুল মামের কাছে এল আবার। মামের হাত ধরে আবদারের গলায় বলল, 'মাম, ওকে শিগগির শুকনো জামাকাপড় দাও। ওর যে ঠান্ডা লেগে যাবে!'

মাম চমকে উঠে ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠলেন।

বাপিও বললেন, 'রাহুল ঠিক বলেছে। ওকে আগে শুকনো জামা-প্যান্ট দাও। রাহুলেরটা ওর গায়ে হবে না—আমার একটা পাজামা আর শার্ট দাও। তারপর ওর কাটা জায়গাগুলোয় লাল ওষুধ আর ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে দিচ্ছি।'

রাহুল কৃতজ্ঞতার চোখে বাপির দিকে তাকাল।

বাপি বললেন, 'শোন, ওকে আগে ড্রেস-ট্রেস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে কিছু খাওয়াই। বোধহয় বেচারা অনেকক্ষণ না খেয়ে আছে। তারপর...।'

রাহুল অবাক চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'তারপর কী?'

'তারপর ওকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। ওর হিস্ট্রিটা জানার চেষ্টা করতে হবে, বুঝলি?'

রাহুল কী বুঝল কে জানে! কিন্তু ও আলতো করে ঘাড় নাড়ল।

কোকো রাহুলের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি...গুড... গুড...বয়...। ভেরি...গুড...বয়।'

রাহুল হেসে বলল, 'ভেরি গুড বয়।'

সেই 'ভেরি গুড বয়' এখন বাপির একটা নীল হাফশার্ট আর পাজামা পরে বাগানে প্রজাপতির পিছনে ছুটছে।

বাপি কাল রাতেই কোকোর 'হিস্ট্রি' জানার চেষ্টা করেছেন। যেটা নিয়ে বাপির বিশেষ কৌতূহল ছিল সেটা নিয়েও ওকে প্রশ্ন করেছেন। সেই জিনিসটা নিয়ে মাম আর রাহুলেরও ভীষণ কৌতূহল ছিল। তাই রাতের

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ওরা তিনজনে কোকোকে নিয়ে বসেছে।

কোকো বসবার ঘরের একটা চেয়ারে হাঁটু মুড়ে বাবু হয়ে বসেছিল। ও আরামের শব্দ করে কয়েকবার ঢেঁকুর তুলল। রাহুল, বাপি আর মামের মুখের দিকে একবার করে তাকাল।

রাহুলরা তিনজন কোকোকে প্রায় ঘিরে বসেছিল। ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর বাপি জিগ্যেস করলেন, 'কোকো, তোমার গলায় ওটা কীসের ব্যান্ড?'

কোকো কোনও জবাব দিল না। ওর ডানহাতটা গলার কাছে চলে গেল। স্টিলের ব্যান্ডটার ওপরে ও আঙুল বোলাতে লাগল।

বাপি আবার জিগ্যেস করলেন, 'ওটা কীসের বেল্ট, কোকো? বলো—কোনও ভয় নেই। তুমি তো গুড বয়।'

অল্প হাসল কোকো। অস্পষ্টভাবে বলল, 'আমি তো...গুড বয়।'

এবার রাহুল ওকে জিগ্যেস করল, তোমার গলার এই ব্যান্ডটা কীসের, কোকো?'

কোকো তেরছা চোখে সিলিং-এর দিকে তাকাল। একমনে কী যেন ভাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ খুশির সুরে বলে উঠল, 'মনে...পড়েছে। এটা কন্ট্রোল...ব্যান্ড। আমি..গুড...বয়।'

কন্ট্রোল ব্যান্ড! কীসের কন্ট্রোল ব্যান্ড? রাহুল অবাক চোখে কোকোর গলার ব্যান্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল।

জিনিসটা চেহারায় অনেকটা ঘড়ির ব্যান্ডের মতো। তবে মসৃণ গোল নয়। চার জায়গায় কবজার জোড় রয়েছে। আর ব্যান্ডটার ডানদিকে—মানে, কোকোর বাঁ-কানের ঠিক নীচে—একটা চ্যাপটা চৌকোনা মেটাল বক্স লাগানো রয়েছে। বক্সটার মাপ অনেকটা দেশলাইয়ের বাক্সের মতো। তবে মাত্র পাঁচ কি ছ'মিলিমিটার পুরু। সেই বাক্সের ওপরে চারটে খুদে এল. ই. ডি. ল্যাম্প। এখন নিভে আছে।

'এই কন্ট্রোল ব্যান্ডটা তুমি কী জন্যে গলায় পরে আছ?' রাহুল জিগ্যেস করল, 'কে তোমার গলায় এটা পরিয়ে দিয়েছে?'

আবার চিন্তায় পড়ে গেল কোকো। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বলল, 'মনে পড়েছে। এটা মাস্টারজি...পরিয়ে...দিয়েছে। মাস্টারজি...দিয়েছে।'

'কে মাস্টারজি?' মাম জিগ্যেস করলেন।

কোকো একগাল হেসে বলল, 'মাস্টারজি। মাস্টারজি।'

বাপি আর রাহুলও বারকয়েক একই প্রশ্ন করল কিন্তু কোকোর সেই একই উত্তর।

তখন বাপি জিগ্যেস করলেন, 'এটা তুমি গলায় পরেছ কেন?'

কোকো দু-পাশে মাথা নাড়ল। ও জানে না।

'এটার নাম কন্ট্রোল ব্যান্ড কে বলল?'

'মাস্টারজি—'

'মাস্টারজির নাম কী?'

'মাস্টারজি।'

'মাস্টারজি কোথায় থাকেন?'

'অনেক...দূরে। অনেক...দূরে।'

বাপি কী মনে করে কোকোর গলার ব্যান্ডটার দিকে হাত বাড়ালেন : 'তোমার ব্যান্ডটা একটু দেখি তো...।'

সঙ্গে-সঙ্গে সাপের ছোবল খাওয়া মানুষের মতো পিছনে ছিটকে গেল কোকো। ভয় পাওয়া চোখে বাপির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না...না। এটায়...কেউ...হাত দেবে না। মাস্টারজির বারণ।'

'মাস্টারজির বারণ' শব্দ দুটো বারবার আওড়াতে লাগল কোকো। ঠিক যেন পুজোর মন্ত্র পড়ছে।

বাপি, মাম, আর রাহুল চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। মাম চাপা গলায় বাপিকে বললেন, 'ছেড়ে দাও। মনে হয় ব্যান্ডটা নিয়ে ওর কোনও মেন্টাল প্রবলেম আছে। পরে কখনও সুযোগ পেলে ওটা দেখো...।'

বাপি একটা লম্বা শ্বাস ফেলে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।

রাহুল কোকোর হাত-পায়ে লাগানো ব্যান্ড-এইডগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তোমার হাতে-পায়ে কেটে গেল কী করে?'

রাহুলের কথায় আবার সোজা হয়ে বসল কোকো। পায়ের ভাঁজ খুলে মেঝের দিকে পা ঝুলিয়ে দিল। তারপর অবাক হয়ে নিজের হাতে আর পায়ে লাগানো ব্যান্ড-এইডগুলোর দিকে দেখল, সেগুলোর ওপরে আঙুল বোলাল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাহুল আবার একই প্রশ্ন করল।

রাহুলের দিকে সরল চোখে তাকাল কোকো। ধীরে-ধীরে বলল, 'মাস্টারজি মেরেছে। খুব...মেরেছে।'

রাহুলের মনে কষ্ট হল। ও মাম আর বাপির দিকে তাকাল।

মাম বললেন, 'আহা রে, এভাবে কেউ মারে?'

বাপি বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার তো খুব মিস্টিরিয়াস লাগছে। যাকে ও ''মাস্টারজি'' বলছে সে কোথাকার মাস্টার? স্কুল- কলেজের, না অন্য কিছুর?'

রাহুল এবার কোকোর গালের চাকা-চাকা দাগগুলোর দিকে দেখাল। আঙুল বাড়িয়ে একটা দাগ সামান্য ছুঁতেই কোকো 'উঃ!' করে উঠল।

'কোকো, এই দাগগুলো কী করে হয়েছে? এখানে ব্যথা নাকি?'

কোকো নিষ্পাপ সরল চোখে কয়েক মুহূর্ত রাহুলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর কী বুঝল কে জানে! আলতো করে বলল, মাস্টারজি। সিগারেট খায়। সিগারেটের ডগায়...আগুন থাকে। সেই আগুন দিয়ে...ছ্যাঁকা দিয়েছে। ছ্যাঁকা। তিনবার। আরও দিত। আমি...আমি...।'

'''আমি'' কী?' রাহুল ওকে কথা ধরিয়ে দিতে চাইল।

'আমি কেউ না। আমার...কেউ...নেই। মা...নেই। বাবা...নেই।'

কোকো হঠাৎই কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল।

সেটা লক্ষ করে বাপি বললেন, 'রাহুল, ওকে এবার রেস্ট নিতে দাও। আমার মনে হচ্ছে, ও বেশ ট্রাবলড। মেন্টালি আপসেট হয়ে আছে। তা ছাড়া ওর বুদ্ধির ব্যাপারটাও বোধহয় স্বাভাবিক নয়।'

মাম বাপিকে বললেন, 'ও ক'টা-দিন আমাদের কাছে থাকুক। একটু সেরে-টেরে উঠুক—তারপর পুলিশে খবর দিয়ে ওর বাড়ির খোঁজখবর করা যাবে। এখন ওকে থানা-পুলিশে দিলে ওকে পাগলদের হোমে পাঠিয়ে দেবে।'

'না, না, ওখানে কিছুতেই ওকে পাঠিয়ো না, বাপি!' রাহুল প্রায় অনুনয়ের সুরে বলল।

খবরের কাগজ আর টিভি দেখে রাহুল জানে ওই সব সরকারি হোমে আবাসিকদের কী দুরবস্থার মধ্যে রাখা হয়। কেউ চরম হেনস্থা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে, আর কেউ-বা ওই হোম থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

বাপি রাহুলের পিঠে আশ্বাসের হাত রেখে বললেন, 'তুই কি খেপেছিস? ওকে ওই নরকে পাঠাব! ওর বাড়ি আর রিলেটিভদের ঠিকঠাক খবর না পাওয়া পর্যন্ত কোকোকে আমরা ছাড়ছি না।'

রাহুল বাপির হাতটা জড়িয়ে ধরল। ভাবল মনে-মনে, বাপি কী ভালো!

কোকো ধীরে-ধীরে শান্ত হয়ে আসছিল। রাহুল ওর দিকে লক্ষ রাখছিল। দেখল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মুখটা যেন চার-পাঁচ বছরের কোনও শিশুর মুখ। সেই ফরসা টুকটুকে মুখে সিগারেটের ছ্যাঁকা! মাস্টারজির কাছে কী অন্যায় করেছিল কোকো যে ওকে এমন করে নৃশংসভাবে শাস্তি

দিয়েছে? রাহুলের টিচাররা তো রাহুলকে কত ভালোবাসেন। ওঁদের সঙ্গে থাকতে রাহুলের কত ভালো লাগে!

কোকো হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি টিভি দেখব।'

এ-কথায় বাপি আর মাম হেসে উঠলেন। বাপি বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে এবার ছেড়ে দাও। একটু টিভি-ঠিভি দেখুক—রিল্যাক্স করুক। রাহুল—' রাহুলের কাঁধে হাত রাখলেন বাপি : 'ওকে নিয়ে টিভি দ্যাখো। ওর সঙ্গে থাকো। তবে বেশি রাত কোরো না...।'

কাল রাতে কোকোর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছে রাহুল। ওর সঙ্গে টিভি দেখেছে। তারপর কয়েকটা রঙিন কমিকস-এর বই ওকে দেখতে দিয়েছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে কোকো যখন হাই তুলছিল তখন ওরা শুয়ে পড়েছে।

রাহুলের ঘরেই মাম কোকোর জন্য বিছানা পেতে দিয়েছিল। সেখানে গা এলিয়ে দেওয়ামাত্রই কোকো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ কোকোর কথা ভেবে-ভেবে রাহুলের ঘুম এসেছে অনেক দেরিতে।

এখন সেই শিশু-যুবক একগাল খুশি নিয়ে হলদে-কালো প্রজাপতির পিছনে নেচে-নেচে ছুটে বেড়াচ্ছে।

রাহুলকে কাছে আসতে দেখে কোকো আবার বলে উঠল, 'রাহুল, এই দ্যাখো...প্রজাপতি। প্রজা...পতি।'

রাহুল হেসে ঘাড় নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, প্রজাপতি। প্রজাপতি...সুন্দর।'

'প্রজাপতি...সুন্দর।' রাহুলের কথার প্রতিধ্বনি তুলল কোকো।

।।তিন।।

বাজারের থলে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বাপি রাহুলকে ডাকলেন।

রাহুল ওর ঘরে কোকোকে নিয়ে বসেছিল। ওর বইপত্র, ক্রিকেটের ব্যাট-বল, এটা-সেটা কোকোকে দেখাচ্ছিল। সেই সময় বাপি দরজায় এসে হাজির হলেন।

'কী রে, রাহুল—আমার সঙ্গে বাজারে যাবি তো!'

প্রত্যেক রবিবারে রাহুল বাপির সঙ্গে বাজারে যায়। এমনিতে বাপির সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বাজার করতে রাহুলের ভালো লাগে। তা ছাড়া রবিবারে বাপি একটু বেশি করে বাজার করেন—যাতে পরের তিনদিন বাজারে না গেলেও চলে। সেইজন্য রবিবারে বাপি তিনটে থলে নিয়ে বেরোন। ফেরার সময় থলেগুলো বেশ ভারীও হয়। রাহুল সঙ্গে থাকলে সবচেয়ে কম ওজনের থলেটা বয়ে বাপিকে সাহায্য করে।

রাহুল কোকোকে ছেড়ে চটপট উঠে পড়ল। হাতে তালি দিয়ে হাত ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'চলো, বাপি—' দরজার দিকে এগোতে-এগোতে কোকোকে লক্ষ করে বলল, 'কোকো, তুমি এগুলো নিয়ে খেলা করো, আমি বাপির সঙ্গে বাজার করে এক্ষুনি ফিরে আসছি।'

কোকো কিন্তু ততক্ষণে মেঝে থেকে উঠে পড়েছে। রাহুলের দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলে উঠেছে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

কোকো ওদের সঙ্গে গেলে রাস্তায় পাঁচজন পাঁচকথা জিগ্যেস করবে। সে-কথা ভেবেই রাহুল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, কোকো—এরকম জেদ করতে নেই। তুমি না গুড বয়?'

'আমি...গুড...বয়। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে...বাজারে...যাব।' গোমড়া মুখ করে কোকো বলে উঠল।

বাপি এবার বললেন, 'না, কোকো। গুড বয়রা কথা শোনে। তুমি এখানে থাকো—খেলা করো—আমরা এক্ষুনি ফিরে আসব।'

কোকো পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো অভিমানী মুখ করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি...বাজারে...যাব। আমি...বাজারে...যাব...।'

রাহুলের মাথায় হঠাৎই একটা বুদ্ধি খেলে গেল। শেষ অস্ত্র হিসেবে সেটা প্রয়োগ করল ও।

'তোমার তো চটি-জুতো কিচ্ছু নেই—আমাদের সঙ্গে তুমি যাবে কেমন করে! বাজারে ভীষণ জল-কাদা...।'

এ-কথা শোনামাত্রই কোকোর মুখে হাসি ফুটে উঠল। ও রাহুল আর রাহুলের বাপিকে অবাক করে দিয়ে 'চটি...আছে! চটি...আছে!' বলে গ্রিল দেওয়া বারান্দার দিকে ছুট লাগাল।

রাহুল আর বাপিও ওর পিছন-পিছন এগোল।

গ্রিল ঘেরা বারান্দার একপাশে রাহুলদের সবার চটি-জুতো থাকে। সেটা গতকালই বোধহয় কোকোর নজরে পড়েছে। রাহুলরা যখন বারান্দায় এসে পৌঁছল ততক্ষণে রাহুলের মায়ের একজোড়া চটি পায়ে দিয়ে কোকো একেবারে বাউন্ডারির গেটে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে কোকো দু-হাতে হাতছানি দিয়ে রাহুলকে ডাকছে : 'এই তো চটি পরেছি! রাহুল, তাড়াতাড়ি এসো...তাড়াতাড়ি...। আমি... বাজারে...যাব। বাজারে...।'

ওর কাণ্ড দেখে রাহুল হেসে ফেলল। বাপিও আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। রাহুলের মা কখন যেন রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। কোকোর কাণ্ড দেখে হেসে বললেন, 'ওইটুকু বাচ্চা! ও কখনও বোঝে কোন চটিটা ছেলেদের আর কোনটা মেয়েদের!'

'ওইটুকু বাচ্চা!' বাপি অবাক হয়ে মামের দিকে তাকালেন : 'কী বলছ তুমি? ওর বয়েস কম করেও পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে।'

মাম কেমন একটা অদ্ভুত গলায় বললেন, 'সে হোক গে। ক্যালেন্ডার দিয়ে কি সবসময় বয়েস মাপা যায় নাকি! ও আসলে একটা বাচ্চা ছেলে...।'

তো সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের 'বাচ্চা' ছেলেটা রাহুল আর বাপির সঙ্গে বাজারের পথ ধরল। রাহুল লক্ষ করল, চলার পথে কোকো অবাক হয়ে সব কিছু দেখছে। যেন ও সদ্য পৃথিবীতে এসে একের পর এক নতুন আবিষ্কার করে চলেছে। চকচকে উদগ্রীব চোখে ও দেখছে আকাশ, সূর্য, গাছপালা, ফুল, পাখি, সাইকেল রিকশা, গোরুর গাড়ি, সাইকেল, মোটরবাইক, ভ্যান-রিকশা, টালির দোচালা-চারচালা ঘর, জল-কাদা, ঘাস, মানুষজন—আরও কত কী!

কোকোর চোখের দিকে তাকিয়ে রাহুলের মনে অনেক প্রশ্ন জাগছিল। মাস্টারজি, সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ, হাত-পায়ের ক্ষতচিহ্ন, কন্ট্রোল ব্যান্ড, ঘিয়া নদীর জলে ভেসে আসা একটা মানুষ...আরও কত বিষয় ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আবার একইসঙ্গে মনে পড়ছিল গতকালের সেই হাহাকার : 'আমার...কেউ...নেই। মা...নেই। বাবা...নেই।' শিশু-যুবকটির তখনকার সর্বহারা অসহায় মুখের কথা মনে করে রাহুলের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। ও তাকাল কোকোর দিকে। ওর মুখে এখন নতুন পৃথিবীর নতুন-নতুন জিনিস আবিষ্কারের আনন্দ।

বাজারে পৌঁছে অন্যান্য রবিবারের মতো বাপি প্রথমে আনাজপাতি কিনতে শুরু করলেন। সরু-সরু বাঁশের ডগায় পলিথিনের ছাউনি খাটিয়ে দোকানিরা বসেছে। কেউ রাস্তার ধারে, কেউ-বা রাস্তার লাগোয়া মাঠে। চারদিকের নানারকম শব্দ বলে দিচ্ছিল এটা একটা ব্যস্ত জায়গা। লোকজনের কথাবার্তা, সাইকেলের ঘণ্টি, ভ্যান-রিকশার প্যাঁক-প্যাঁক, মোটরবাইকের আওয়াজ—কতরকমের শব্দ! তিন-চাররকম সবজি কেনা হতেই কোকো জেদ করে, বায়না করে, সেই থলেটা বাপির হাত থেকে নিয়ে নিল। বলল, বাজারের একটা থলে ও বইবে, কারণ, ওর গায়ে জোর আছে।

এ-কথায় রাহুল যখন হেসে বলেছে, 'তোমার গায়ে জোর আছে মানে?'

তখন কোকো জবাব দিয়েছে, 'মাস্টারজি বলে। আমার...গায়ে খুব...জোর।'

রাহুল তখন অবাক হয়ে কোকোর দিকে তাকিয়েছে শুধু—কোনও কথা বলেনি।

ঘুরে-ঘুরে বাজার করার কাজ শেষ হল একসময়। বাপি, রাহুল আর কোকো বাড়ির পথ ধরল। অন্যান্য রবিবার রাহুল আর বাপি সাইকেল-রিকশায় ফেরেন। কিন্তু আজ কোকো সঙ্গে আছে—রিকশায় তিনজন আঁটবে না। তার ওপর তিন-তিনটে থলে।

ফেরার পথে রাহুল আর কোকো গল্প করছিল। রাহুল বলছিল, কোকো অবাক হয়ে শুনছিল। আর মাঝে-মাঝে চারপাশটা দেখছিল।

হঠাৎই দূরে একটা গোরুর গাড়ি দেখতে পেল রাহুল। অনেকগুলো বস্তা বোঝাই করে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসছে। রাস্তার খানাখন্দে পড়ে চাকাগুলো একবার ডানদিকে একবার বাঁ-দিকে হেলে যাচ্ছে।

রাহুল আঙুল তুলে গোরুর গাড়িটা কোকোকে দেখাল, বলল, 'ওই দ্যাখো, গোরুর গাড়ি...।'

'আমি...আগে...গোরুর গাড়ি...দেখেছি।' স্মৃতি খুঁজে পাওয়ার আনন্দে কোকোর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাপি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। নীল আকাশে ছোট-ছোট মেঘ ভেসে আসছে সূর্যের কাছাকাছি। কয়েকটা লম্বা-লম্বা গাছ মাথা তুলে রয়েছে আকাশের দিকে। বাতাসে অল্প-অল্প নড়ছে।

বাপি মুগ্ধ চোখে আকাশটাকে দেখছিলেন। রাহুল বুঝতে পারছিল বাপির এখনই রং-তুলি নিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। ছবি আঁকা বাপির একমাত্র শখ। সময় পেলেই জল রং আর তুলি নিয়ে বসে পড়েন। মাঠ, ঘাট, নদী, গাছপালা আঁকেন। বাপির কাছে রাহুল শুনেছে, এ ধরনের ছবিকে ল্যান্ডস্কেপ বলে।

রাহুল একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই লোকজনের হইচই চিৎকারে ও চমকে উঠল। আকাশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল সামনের দিকে।

গোরুর গাড়িটার একটা চাকা আচমকা ভেঙে কাত হয়ে গেছে। ফলে বস্তা-বোঝাই গাড়িটা হেলে পড়েছে রাস্তার ধারের নালার দিকে। কয়েকটা বস্তা ধীরে-ধীরে গড়িয়ে পড়ছে নালার গর্তে। মাথায় গামছা জড়ানো গাড়োয়ান হাতের ছিপটি ছুড়ে ফেলে লাফ দিয়েছে রাস্তায়। বলদ দুটো ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

লোকজন ছুটে যাচ্ছিল বিপজ্জনক-ভাবে হেলে পড়া গাড়িটার দিকে। মনে হচ্ছিল, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোরুর গাড়িটা বস্তাসমেত নালায় গড়িয়ে পড়বে। গতকালের বৃষ্টির জল নালায় জমে আছে। এর মধ্যেই গড়িয়ে পড়া তিনটে বস্তা জলে ভিজে একসা। ভেজা বস্তা দেখে রাহুল বুঝল, বস্তায় আলু আছে।

হাতের থলেটা রাস্তায় নামিয়ে রেখে কোকো কখন যেন ছুট লাগিয়েছিল।

রাহুল পিছন থেকে 'কোকো! কোকো!' বলে চিৎকার করে ওকে ডাকতে লাগল। কিন্তু ছেলেটা শুনলে তো!

রাহুল দেখল, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কোকো হেলে পড়া গোরুর গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ঝুঁকে পড়ে গাড়িটার লম্বা বাঁশের কাঠামোর নীচে কাঁধ লাগিয়ে প্রাণপণে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল, চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। মরিয়া হয়ে ও হেলে পড়া গাড়িটাকে চাগিয়ে তুলতে লাগল।

রাস্তার একপাশে বাজারের থলে নামিয়ে রেখে বাপির দিকে একবার তাকিয়েই রাহুল ছুটতে শুরু করেছিল। ও যখন গোরুর গাড়িটার কাছে এসে পৌঁছল তখন গাড়ির হেলে পড়া দিকটা অনেকটা সোজা হয়ে গেছে। কোকোর হাতের শিরা ফুলে উঠেছে, গলার শিরা ফুলে উঠেছে। ও দম বন্ধ করে অবাক করা শক্তিতে গাড়িটাকে ঠেলে তুলে একটু-একটু করে সোজা করছে।

ততক্ষণে রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। লোকজন হইহই চিৎকার করে কোকোর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখছে। বলদ দুটোর ঘাড়ের যন্ত্রণা কমে যাওয়ায় ওরা চিৎকার বন্ধ করেছে।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই কাঁধ লাগাও, ভাই—এসো!'

সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল উঠল। পাঁচ-ছ'জন মানুষ ছুটে গিয়ে কোকোর পাশাপাশি কাঁধ লাগাল। আওয়াজ তুলল, 'মারো জোয়ান হেঁইয়ো...।'

গাড়ির বিশাল চাকাটা নালার ঢালে কাত হয়ে পড়েছিল। কয়েকজন সেটা তুলে এনে গাড়ির পাশ থেকে বেরিয়ে থাকা রডে লাগিয়ে দিল। গোরুর গাড়িটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওটার চাকার হুড়কোটা ভেঙে গিয়েছিল। তাই নতুন একটা লোহার হুড়কো জোগাড় করতে দুজন সাইকেল চেপে রওনা হয়ে গেল।

কোকো গাড়িটা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল আর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে দু-হাত জামায় ঘষে-ঘষে মুছছিল।

রাহুল চেঁচিয়ে ওকে ডাকল, 'কোকো...এদিকে এসো...।'

কোকো ফিরে তাকাল। রাহুলকে দেখতে পেল। হেসে হাত নাড়ল। তারপর রাহুলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু ও আসবে কী! লোকজন ওকে ঘিরে ধরে সাবাশ দিতে লাগল।

'বাব্বাঃ, তোমার গায়ে তো হেভি জোর!'

'তুমি কে হে? তোমার নাম কী? তোমাকে তো এ এলাকায় আগে দেখিনি! তবে হ্যাঁ, তোমার হিম্মত আছে বটে!'

'সাবাশ, ভাই! একটা দারুণ জিনিস দেখালে।'

'ওকে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত।'

'তোমার গলায় ওটা কী বলো তো? এরকম পিকিউলিয়ার হার তো আগে দেখিনি...।'

রাহুল তাড়াতাড়ি জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ে কোকোর হাত ধরল। ওকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। জনতার মধ্যে থেকে উৎসাহী কয়েকজন হাত বাড়িয়ে কোকোর পিঠ চাপড়ে দিল।

বাপি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। রাহুলকে বললেন, 'শিগগির বাজারের থলে দুটো তুলে নিয়ে চল। এক্ষুনি নানানজন এসে কোকোকে নিয়ে হাজারটা প্রশ্ন করবে...তখন মুশকিল হবে...।'

রাহুল আর কোকো চটপট ওদের থলে দুটো তুলে নিয়ে এল। তারপর ওরা তিনজনে জলদি পায়ে হাঁটা লাগাল বাড়ির দিকে।

কিন্তু নিরাপদে বাড়ি পৌঁছনো হল না।

গোরুর গাড়ির ঘটনার জায়গা ছেড়ে বিশ-পঁচিশ পা যেতে না যেতেই রথপতি গুপ্তর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক একসময়ে পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। এখন আর নেই। রেডিমেড জামা-কাপড়ের ব্যবসা করেন। কলকাতার কয়েকটা নামী দোকানে ছেলেমেয়েদের শৌখিন পোশাক সাপ্লাই করেন।

রাহুলের বাপির সঙ্গে রথপতির বেশ ভালোই আলাপ। ভদ্রলোক সবসময় পাড়াপড়শির হাঁড়ির খবরের খোঁজ করে বেড়ান। সেটা বিরক্তিকর হলেও লোকজনের সুখ-দুঃখে পাশে দাঁড়ান। বিপদে আন্তরিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

রাহুলের বাপির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন রথপতি। হেসে জিগ্যেস করলেন, 'কেমন আছেন, কল্যাণবাবু?'

'ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

'চলে যাচ্ছে আর কী!' কোকোর দিকে তাকালেন রথপতি। আঙুল নেড়ে বললেন, 'এই ছেলেটির জন্যে আজ গর্বে বুক ফুলে উঠছে। আমি ওই রিকশা স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ওর সাহস আর শক্তির প্রশংসা করতে হয়। পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা বিশাল গুণ। কী নাম তোমার?'

কোকো কর্কশ গলায় বলল, 'কোকো...।'

'সাবাশ, কোকো!' কোকোর পিঠ চাপড়ে দিলেন রথপতি। তারপর চোখ সরু করে কল্যাণবাবুর দিকে তাকালেন : 'কোকো আপনার কে হয়? ওকে তো আগে কখনও মণিমেলায়...মানে, আমাদের এ-গাঁয়ে দেখিনি—।'

কল্যাণবাবু উত্তর দিতে একটুও দেরি করলেন না। গতকাল রাতে ভেবে-ভেবে তিনি গল্পটা তৈরি করে নিয়েছেন।

'ও আমার পিসতুতো দাদার ছেলে—শ্রীরামপুরে থাকে। ওর একটু সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম আছে। ওখানে ডক্টরের ট্রিটমেন্টে আছে। তিনিই বলেছেন, কিছুদিন গ্রামের হাওয়া খেয়ে আসতে। মানে, গাছপালা মাঠঘাটের কাছাকাছি থাকলে ওর প্রবলেমটা তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে...।'

'কী প্রবলেম ওর?'

এতটা খোঁচানো কোশ্চেন রাহুলের বাপি আশা করেননি। তাই একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'এই...মানে...ওর মধ্যে একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব আছে। যদিও ওর বয়েস প্রায় সাতাশ। তা ছাড়া গলাটা কেমন হোর্স... ধীরে-ধীরে কথা বলে...।'

রথপতি গুপ্ত ভুরু কোঁচকালেন। আজব প্রাণী দেখার দৃষ্টিতে কোকোর দিকে তাকালেন : 'ওর গলার ওই লোহার বালাটা কীসের?'

কল্যাণবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'ওটা একটা মেডিক্যাল ইলেকট্রনিক ব্যান্ড। ট্রিটমেন্টের জন্যে ওর ডক্টর দিয়েছেন।'

'বাব্বা! এসব তো বাপের জন্মে কখনও দেখিনি। এ আবার কী ধরনের রোগ?'

'অ্যাকিউট মালটিপল সাইকো-প্যাথলজিক্যাল চাইল্ড সিনড্রোম। মানে, ওর সাইকিয়াট্রিস্ট তাই বলেছেন...।'

এত লম্বা-চওড়া নামে রথপতি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

কল্যাণ জানতেন যে, রথপতি বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি। তাই ওঁর অন্তর-খোঁচানো প্রশ্নমালা ঠেকানোর জন্য যা পেরেছেন বানিয়ে একটা খটমট রোগের নাম বলে দিয়েছেন। এ-নামে সত্যিই কোনও রোগ হয় কি না তিনি জানেন না।

'ও, আচ্ছা। তা ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক।' আবার কোকোর পিঠ চাপড়ে দিলেন রথপতি : 'তুমি বড় ভালো ছেলে, বাবা। তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।'

সামান্য হেসে রথপতি গুপ্ত চলে গেলেন।

রাহুল বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, বাপি। নইলে কোকোকে নিয়ে আরও সবাই প্রশ্ন করবে।'

বাপি 'হ্যাঁ—চল।' বলে তাড়াতাড়ি পা চালালেন বটে, কিন্তু ওঁর মনে উদ্বেগ থেকেই গেল।

বাজারে কয়েকজন কোকোর কথা জিগ্যেস করেছে। তখন মোটামুটি এরকম সাফাই দিয়েই ম্যানেজ করেছেন কল্যাণ। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, এই উত্তরে বেশিদিন চলবে না, কারণ, কোকোকে যে ঘিয়া নদীর পাড়ে পাওয়া গেছে এ-কথা আজ নয় কাল জানাজানি হবেই। তখন কী হবে?

বাপি আর ভাবতে পারছিলেন না। আনমনা ভাবে পা ফেলতে লাগলেন।

রাহুল আর কোকো পাশাপাশি হাঁটছিল। কোকো হঠাৎই রাহুলকে লক্ষ করে বলল, 'রাহুল আমার অ্যাকিউট...চাইল্ড হয়েছে। আমার সাইকিয়া...বলেছে।'

ওর দিকে তাকিয়ে রাহুল আর বাপি দুজনেই হেসে ফেললেন।

কোকো বাঁ-হাতটা পেটে দিয়ে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে...।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলো, বাড়ি গিয়ে খাবে।' রাহুল বলল।

কোকো খুশিতে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল : 'কী মজা! আমি...বাড়ি...গিয়ে খাব...খাব।'

।।চার।।

কোকোকে নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেল রাহুল। ও কিছুতেই রাহুলকে কাছ-ছাড়া করতে চায় না। সোমবার রাহুল স্কুলে যাওয়া শুরু করতেই কোকোরও বায়না শুরু হয়ে গেল : 'আমি রাহুলের সঙ্গে যাব। আমি...যাব।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে, কোকো বাচ্চা ছেলের মতো কান্নাকাটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

বাপি আগেই অফিসে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেগতিক দেখে রাহুলের মা কল্যাণবাবুকে ফোন করলেন।

সব শুনে বাপি বললেন, 'ঠিক আছে, বায়না করছে যখন তুমি আর ও রাহুলের সঙ্গে যাও। রাহুলকে স্কুলে দিয়ে তোমরা আবার ফিরে এসো। কোকো তো আসলে বাচ্চা ছেলে। শুধু দেখতেই যা বড়সড়। ও কি অত

বোঝে?'

অগত্যা তাই হল। মাম, কোকো আর রাহুল স্কুলের পথ ধরল।

স্কুল বেশি দূরে নয়। হাঁটা পথে স্কুলে যেতে-যেতে রাহুল কোকোকে অনেক গল্প বলছিল। স্কুলের গল্প, ফুটবল খেলার গল্প, গাঁয়ের মেলার গল্প, দুর্গাপুজোর সময় যে বিশাল উৎসব হয় তার গল্প।

কোকোর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ও অন্য কোনও গ্রহের প্রাণী। এসব ব্যাপার যেন ও প্রথম জানছে রাহুলের কাছে।

রাহুলকে স্কুলে দিয়ে মাম কোকোকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কোকো বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, রাহুল কখন ফিরবে। মাম ওকে কোনওরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন।

কোকো কিন্তু বাড়িতে বসে-বসে সময় কাটাল না। রাহুলের মা-কে সাহায্য করার জন্য পাগল হয়ে উঠল। মামের কোনও বারণ শুনল না।

টিউবওয়েল পাম্প করে-করে ও বালতি-বালতি জলের জোগান দিতে লাগল। কাচা জামাকাপড় দড়িতে ছড়াতে লাগল। ঘরোয়া ফাইফরমাশ খাটতে লাগল। এ ছাড়া বাকি সময়টা কোকো বাগানে ঘুরে কাটাল। কখনও ফুল দেখতে লাগল, আবার কখনও পাখির খোঁজে হাঁ করে গাছের ঘন পাতার দিকে চেয়ে রইল। বিকেলের দিকে ও বাগানের একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম সেরে নিল।

রাহুলের মা কোকোর 'কীর্তি' দেখছিলেন।

দেখছিলেন কত সহজে আর কত তাড়াতাড়ি ও টিউবওয়েল পাম্প করে জল তুলছে। ওর সহজ ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন ও একটা খেলনা টিউবওয়েল পাম্প করছে। এ ছাড়া ঘরের ভেতর থেকে কোকোর ব্যায়ামও দেখছিলেন। জামা খুলে খালি গায়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। তারিফ করার মতো ঝকঝকে স্বাস্থ্য—সিনেমায় যেমন দেখা যায়। শুধু ফরসা বুকে কয়েকটা সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ। মাম বুঝলেন, মাস্টারজি মানুষটি এই ভোলাভালা শিশু-যুবকের ওপরে কম অত্যাচার করেননি!

কোকো প্রথমে খালি হাতে ব্যায়াম শুরু করল। ডন-বৈঠক ইত্যাদি শেষ করার পর ও বাগানের পাঁচিলের পাশ থেকে শ্যাওলা পড়া দুটো থান ইট তুলে নিল। সেগুলোকে ডাম্বেলের মতো ব্যবহার করে ও আবার শরীরচর্চা শুরু করল। ওর সারা গা ঘেমে উঠল, শরীরটা চকচক করতে লাগল।

রাহুল স্কুল থেকে ফেরার পর কোকো আবার ওর ল্যাংবোট হয়ে ঘুরতে শুরু করল। ওর সঙ্গে খেলার মাঠে গেল। তারপর ওর সঙ্গে পড়তে বসে গেল। রাহুল একটা খাতা দিয়ে ওকে 'অ-আ-ক-খ' লিখতে বলল। কোকো অনভ্যস্ত হাতে আঁকাবাঁকা রেখায় বর্ণগুলো লিখে চলল।

কয়েকদিনের মধ্যেই কোকো রাহুলের স্কুল ভালোমতন চিনে নিল। এখন আর মামকে ওর সঙ্গে যেতে হয় না। কোকো যদি সুস্থ স্বাভাবিক হত তা হলে বলা যেত ও-ই রাহুলকে স্কুলে দিয়ে আসে, আবার ছুটির সময় নিয়ে আসে। রাহুলের সঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতে যায়, তারপর সন্ধেবেলা পড়তে বসে। 'অ-আ-ক-খ', 'এ-বি-সি-ডি' কিংবা '১ থেকে ১০০' লিখতে শেখে। ওর লেখাপড়ার ধরন দেখে বোঝা যায়, কোকো কয়েক বছর স্কুলে গিয়েছিল। তারপর কোনও কারণে ওর পড়াশোনা থেমে যায়।

কখনও-কখনও কোকো রাহুলের বাপি কিংবা মামের কাছেও পড়তে বসে। আবার বাপি যখন জল রং সাজিয়ে নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন তখন কোকো বাপির পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। মুগ্ধ হয়ে ছবি আঁকা দ্যাখে।

একদিন ছবি আঁকতে-আঁকতে বাপি ওকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি ছোটবেলায় ছবি আঁকতে?'

'না...আমি...আঁকতাম না।'

তুলি হাতে নিয়ে হ্যান্ডমেড পেপারে হালকা নীলের ওয়াশ টেনে বাপি বললেন, 'তুমি ছবি ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে কোকো বলল।

'তুমি ছবি আঁকা শিখবে?'

আবার ঘাড় কাত করল কোকো। হ্যাঁ, ও ছবি আঁকা শিখবে।

‘গুড বয়। কাল থেকে তোমাকে আমি আঁকা শেখাব।’

‘আমার...মা...আমাকে ছবি আঁকা...শেখাত। মা খুব সুন্দর ছবি...আঁকত। মা...আর...নেই।’

বাপি অবাক হয়ে দেখলেন কোকোর চোখে জল।

ওকে কাছে টেনে নিলেন কল্যাণবাবু। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘তোমার মা-কে মনে আছে?’

কোকো বিহ্বলভাবে মাথা নাড়ল। বলল, ‘না...মনে নেই। শুধু ছবি আঁকা...মনে আছে।’

তারপরই কোকো চুপ করে গেল। গুম হয়ে বসে রইল। অনেক প্রশ্ন করেও কল্যাণবাবু ওর কাছ থেকে আর কোনও কথা বের করতে পারলেন না।

এর আগেও কোকোকে ওর বাড়ির কথা, বাবা-মায়ের কথা অনেকবার জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু কোনও স্পষ্ট উত্তর পাননি। রাহুল আর ওর মা-ও বহুবার সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কোকোকে ওর বাড়ির কথা জিগ্যেস করেছেন, বাবা-মায়ের কথা জিগ্যেস করেছেন, কিন্তু কোনও জবাব পাননি।

আজ প্রথম বাপি জানতে পারলেন, কোকোর মা ছবি আঁকতেন।

হয় সবকিছু কোকোর ধীরে-ধীরে মনে পড়ছে, অথবা, ও ধীরে-ধীরে নিজেকে মেলে ধরছে। ঠিক যেভাবে একটা গোলাপ কুঁড়ি থেকে ধীরে-ধীরে পাপড়ি মেলে ধরে।

রাহুলের বাপি আর মাম কোকোকে ওঁদের স্বাভাবিক জীবনে মিশিয়ে নিলেন। কেন জানি না, ওঁদের মনে হয়েছিল, এতে কোকো তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। যদি কোনও পুরোনো স্মৃতি ওর হারিয়েও গিয়ে থাকে, তা হলে সেটা ফিরে আসবে।

কোকো ওঁদের কথা শুনে চলত বটে তবে দুটি ব্যাপার ছাড়া। প্রথমটা হল, রাহুলের পাশে-পাশে ছায়ার মতো ঘোরা। আর দ্বিতীয়টা ঘরের নানান কাজে মাম এবং বাপিকে সাহায্য করা।

একদিন রাহুলের সঙ্গে মাঠে খেলতে গিয়ে এক কাণ্ড হল।

এমনিতে রোজ যে কোকো যায় ও কিন্তু খেলতে নামে না। মাঠের ধারে চুপচাপ বসে রাহুলদের ফুটবল খেলা দ্যাখে। আর গোল-টোল হলে হাততালি দেয়। হাত ছুড়ে চেঁচামেচি করে।

কিন্তু সেদিন ওর কী খেয়াল চাপল, ও রাহুলের কাছে বায়না করে বসল।

‘রাহুল, আমি...তোমার মতো...বল খেলব।’

ওর বায়নার ধরন রাহুল জানে। একটা কিছু মাথায় ঢুকলে ও সেটাই ঘ্যানঘ্যান করে যাবে। তাই ও বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোকোকে নিজের দলে নিল। ও ভেবেছিল, মিনিট পাঁচ-দশ খেলানোর পর কোকোকে ঠান্ডা করে বসিয়ে দেবে। কিন্তু কাজে সেটা করা গেল না। কারণ, কোকোর খেলা রাহুলকে অবাক করে দিল।

না, কোকো ফুটবল খেলতে জানে না। তবে কচ্চিৎ কখনও পায়ে বল পেয়ে গেলে ও যে-অসম্ভব জোরে শট মারছে তা দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া।

কোকোর একটা জোরালো শট কোমরে লেগে নিধু ছিটকে পড়ে গেল। পড়ে ছটফট করতে লাগল।

রাহুলরা সবাই ছুটে গেল ওর তদারকি করতে।

গোপাল, রাহুল বেশ অবাক হয়ে গেল। নিধু ফুটবল খেলে ভালো। চেহারাও গাঁট্টাগোঁট্টা, পেটানো, সহজে ওকে কেউ কাবু হতে দেখেনি। কিন্তু আজ ওর অবস্থা ভেজা তুলোর মতো।

নিধুকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। কোকো একাই ওকে চাগিয়ে কাঁধে তুলে নিল। মাঠের ধারে ওকে শুইয়ে দিয়ে সবাই মিলে পরিচর্যা করতে লাগল।

একটু পরে খেলা আবার শুরু হল।

কোকো হঠাৎ পায়ে বল পেয়ে তিরবেগে ছুটতে শুরু করল। সেরকম অভ্যাস স্বাভাবিকভাবেই না থাকায় বল ওর পা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও একছুটে বলের কাছে পৌঁছে গেল। এবং শট মারল।

বলটা গোলে ঢুকল। শুধু ঢুকল নয়, একেবারে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

গোলপোস্টের দশ-বারো হাত পিছনেই ছিল স্বদেশ মণ্ডলদের বাঁখারির বেড়া। জাল ছিঁড়ে বেরোনো বলের ধাক্কায় সেই বেড়াটাও কাত হয়ে গেল।

গোলের আনন্দে রাহুলদের দলের সবাই হইহই করে উঠেছিল। কিন্তু দেখা গেল গোল খাওয়া দলের বন্ধুরাও স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে কোকোকে ঘিরে উৎসব শুরু করে দিল। কারণ, এরকম ভয়ংকর তীব্র শট মণিমেলায় আগে কেউ কখনও দেখেনি। মণিমেলায় শট মারার একটা প্লেয়ার পাওয়া গেল বটে! কোকো ফুটবল খেলতে না জানুক, শট তো মারতে পারে! ওকে রাহুলরা প্র্যাকটিস করিয়ে-করিয়ে খেলাটা একটু-আধটু রপ্ত করিয়ে দেবে। তারপর ও দু-চারটে শট মেরে বাজিমাত করবে। মণিমেলার ফুটবল টিমে ওকে খেলাতে হবেই।

খেলার শেষে রাহুল, দীপায়ন আর কোকো বাড়ির দিকে ফিরছিল।

মাঠ ছেড়ে ওরা পিচের রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎই একটা বিশাল মোটর-বাইক গাঁক-গাঁক শব্দ তুলে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল। বাইকে তিনটে ছেলে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল। তিনজনেরই গায়ে স্লিভলেস ভেস্ট, আর বারমুডা। কী এক উল্লাসে চিৎকার করছে।

বাইকটা যেভাবে কাত করে-করে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ওরা চালিয়ে গেল তাতে রাহুল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর মানে হল, এক্ষুনি বুঝি বাইকটা উলটে যাবে।

দীপায়ন বলে উঠল, 'কী রাফ চালাচ্ছে! আর-একটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট করত।'

রাহুল বলল, 'মাকুর বাইক। বাইকে মাকু, ওর ভাই নেনে, আর বর্মনবাড়ির ছোটছেলেটা—কী নাম যেন—ওটা বসে আছে। মাকু তো এভাবেই বাইক চালায়—।'

'মাকু' নামটা শোনামাত্রই দীপায়ন চুপ করে গেল। কোনও এলাকায় যে-নাম শোনামাত্র সবাই মুখে কুলুপ আঁটে 'মাকু' সেরকমই একটা নাম। ওর চ্যাংড়া ছোটলোক সাঙ্গোপাঙ্গদের সবাই এড়িয়ে চলে। বর্মনবাড়ির ছোটছেলেটা এ-দলে নতুন জুটেছে। ছেলেটা এখনও স্কুলে যায়, তবে চালচলন বড়লোকের বখাটে ছেলের মতন।

রাহুল আর দীপায়ন নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় মাকুর সমালোচনা করছিল। তার সঙ্গে বলছিল নেনের কীর্তিকথা। ওরা খেয়াল করেনি, কোকো হাঁ করে ওদের কথাগুলো গিলছিল।

বিকেল ফুরিয়ে এলেও আলো ফুরোয়নি। খেলা শেষ করে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির দিকে ফিরছে। নিজেদের মধ্যে ওরা যেরকম কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সন্ধেবেলা বটগাছের আশ্রয়ে ফেরার পর পাখির ঝাঁক কিচিরমিচির করে ঝগড়া করছে।

হঠাৎই মোটরবাইকটা আবার ফিরে এল। মনে হল, বাইকটা একই রাস্তা ধরে চক্কর কাটছে। সেই সাপের মতো আঁকাবাঁকা গতি। সঙ্গে হইহই চিৎকার।

বাইকটার বিকট হর্ন বাজছিল।

ওটা আচমকা এসে পড়ায় বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারল ছিটকে গেল। বাইকটার সর্পিল গতি ওদের ভয় পাইয়ে দিল। ওরা মিহি গলায় চিৎকার করতে লাগল।

বাইকটা একটা বাচ্চা মেয়েকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে মাকু ব্রেক কষে বাইকটাকে থামাল।

বাচ্চা মেয়েটা ভয় পেয়ে টাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। চিত হয়ে বাইকটার চাকার দিকে তাকিয়ে মেয়েটা 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে ফেলল।

বাচ্চাদের ভয় পেয়ে দৌড়োদৌড়ির কাণ্ড দেখে আর কান্না শুনে মাকুরা বোধহয় মজা পেল। ওরা তিনজনে বাইকে বসে-বসেই হাসতে শুরু করল। তারই মাঝে মাকু রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চা মেয়েটাকে লক্ষ করে

হাত নেড়ে বলে উঠল, 'কাঁদে না, খুকু। তোমার কিচ্ছু হয়নি। তুমি মিছিমিছি কাঁদছ। এসো...হাত ধরো। উঠে পড়ো...।'

বাচ্চা মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা মুখে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। নিজের হাত-পা জামা ঝাড়তে লাগল।

মাকুদের হাসি রাহুলের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। ও তেমন করে কিছু না ভেবেই বাইকটার কাছে এগিয়ে গেল। মাকুকে লক্ষ করে জেহাদি প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

'এসব কী হচ্ছে?'

'তোর বাপের বিয়ে হচ্ছে।' বলেই বাইকে বসা অবস্থাতেই রাহুলের বুকে পা তুলে দিল মাকু। সজোরে এক ঠেলা মারল।

লাথি খেয়ে রাহুল ছিটকে পড়ল রাস্তায়। মাথা ঠুকে গেল। যন্ত্রণার একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

রাহুল উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। দীপায়ন তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে তুলতে লাগল।

মাকুরা বাইকে বসে মজা দেখছিল। ওদের বাইকের ইঞ্জিন ভটভট শব্দ করছিল। রাহুল উঠে দাঁড়াতেই মাকু আর নেনে ওকে নোংরা ভাষায় গালাগাল দিল। তারপর মাকু বলল, 'এই আজব ভেড়াটাকে মেপে রাখ। পরে একে কড়া পালিশ দেব। সালার এত হিম্মত যে, আমার সঙ্গে মুখ লাগাতে আসে!'

রাহুল হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়ছিল আর ঘেন্না-মেশানো প্রতিবাদের চোখে মাকুর দিকে দেখছিল।

সেটা লক্ষ করে ভাইয়ের দিকে ঘাড় ঘোরাল মাকু : 'অ্যাই নেনে, নাম তো বাইক থেকে। দ্যাখ, ব্যাটা ড্যাবড্যাব করে কেমন তাকাচ্ছে! মালটাকে একটু পাঁচালি পড়ে দে...।'

নেনে হাসল। হাসতে-হাসতেই বাইক থেকে নামল। তারপর রাহুলের দিকে পা বাড়াল।

কোকো এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। খানিকটা বিভ্রান্তভাবে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। যেন কী করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

কিন্তু নেনে রাহুলের দিকে আক্রমণের ভঙ্গিতে এগোতেই কোকো নড়েচড়ে উঠল। একছুটে নেনের সামনে গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল। কর্কশ গলায় টেনে-টেনে বলল, 'রাহুলকে...মারবে না।'

'তাই?' বলে নেনে ডানহাতে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল কোকোর মুখে।

কোকো ঘুসির অভিঘাতটা নিল, কিন্তু জায়গা থেকে নড়ল না—দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতো। ওর ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল।

ও আবার বলল, 'রাহুলকে...মারবে না।'

রাহুল 'কোকো! কোকো, চলে এসো—' বলে অস্থিরভাবে ওকে ডাকছিল। কিন্তু কোকো তাতে এতটুকু কান দিল বলে মনে হল না।

'রাহুলকে...মারবে না।' একঘেয়েভাবে আবার বলল কোকো।

ওর অদ্ভুত কথা বলার ঢঙে নেনে হেসে উঠল : 'কে রে আমার তোতলা কাত্তিক?' তারপর ভেংচিয়ে বলল, 'রাহুলকে মাবব না, ছোনা?'

কথা বলতে-বলতেই নেনে হাত তুলেছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

রাহুলরা অবাক হয়ে কোকোর কাণ্ড দেখতে লাগল।

এক ঝটকায় নেনের কোমর জাপটে ধরল কোকো। তারপর অবলীলায় ওকে শূন্যে তুলে ফেলল।

নেনে দাপাদাপি করছিল। কোকোকে কিল-চড়-ঘুসি মারছিল। কিন্তু কোকো সেসব গ্রাহ্য করছিল না। ও অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে গেল রাস্তার কিনারায়। তারপর নেনেকে স্রেফ ছুড়ে দিল নালার ওপারে। নেনে গিয়ে আছড়ে পড়ল একটা পরিত্যক্ত জমিতে।

বাইকে বসে মাকু গর্জন করে উঠল। সেইসঙ্গে গালাগালের ফোয়ারা ছোটাল। কিন্তু ও বাইক থেকে নামেনি। বোধহয় শত্রুর এইরকম ভয়ংকর শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না সে-

কথাই ভাবছিল। আর বাইকের পিছনে বসে থাকা বড়লোকের বখাটে ছেলেটা ভয়ের চোখে কোকোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

কোকো অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মাকুর বাইকের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাকু গিয়ার বদল করে বাইক ছুটিয়ে দিল। ওর বোধহয় কোকোকে চাপা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেটা হল না।

কারণ, কোকো শক্ত দু-হাতে বাইকের হাতল চেপে ধরেছে। মাকুর হাতের পাশেই কোকোর নীল শিরা ওঠা দুটো হাত।

বাইকটা গোঁ-গোঁ গর্জন করছিল, কিন্তু নড়তে পারছিল না। কোকো সামনে ঝুঁকে পড়ে চোয়ালে চোয়াল চেপে বাইকের অশ্বশক্তির টক্কর নিচ্ছিল। রাহুল আর দীপায়ন স্তম্ভিত হয়ে কোকোর কাণ্ড দেখছিল।

রাস্তায় ভিড় জমছিল। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো তো ছিলই, তার সঙ্গে জুটে গেল পথচারীরা। কেউ হেঁটে যাচ্ছিল, কেউ-বা সাইকেলে।

বাইকটাকে ক্ষমতার শেষ সীমায় নিয়ে গেল মাকু। আকাশফাটানো গোঁ-গোঁ গর্জন। ধোঁয়া। পেট্রলের গন্ধ।

কিন্তু কোকো অবিচল। সবার চোখের সামনে ও যেন এক রূপকথার সার্কাস দেখাচ্ছে।

ও দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বাইকের...স্টার্ট বন্ধ...করো। নইলে বাইক...উলটে...দেব...।'

ওর কথায় বোধহয় ম্যাজিক ছিল, কারণ, মাকু কী একটা সুইচ ঘোরাতেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাইকের ইঞ্জিন থেমে গেল। কোকো বাইকের হ্যান্ডেল ধরে হাঁপাতে লাগল।

নেনে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু নালা পেরিয়ে কোকোর আক্রমণের আওতায় আসতে ভয় পাচ্ছিল। আর বর্মনবাড়ির ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল এখুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাবে।

রাহুলই প্রথম সংবিৎ ফিরে পেল। ও 'কোকো! কোকো!' বলে চিৎকার করে ছুটে এল ওর 'অলৌকিক' বন্ধুর কাছে। ওকে পিছন থেকে একেবারে জাপটে ধরল।

'কোকো! কোকো!' আবেগে রাহুলের চোখে জল এসে গেল।

কোকো বাইক ছেড়ে দিয়ে রাহুলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে যে মারবে...তাকে ছাড়ব না। ছাড়ব না।'

কোকোকে অন্যমনস্ক দেখে নেনে সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে নালা পেরোল। তারপর চট করে বাইকে উঠে বসল। সুযোগ বুঝে মাকুও বাইকে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। তবে যাওয়ার আগে কোকো আর রাহুলকে লক্ষ করে গালাগাল দিয়ে গেল। চিৎকার করে বলে গেল, 'ওয়েট কর—তোদের হিসেব হবে।'

রাহুল আর কোকো মাকুদের চলে যাওয়া দেখল।

রাস্তার লোকজন এতক্ষণ যেন রুদ্ধশ্বাসে কোনও সিনেমা দেখছিল। বাইকটা চলে যেতেই সবাই কোকোর কাছে ছুটে এল। আলোচনা করতে লাগল, হইচই করতে লাগল, কোকোর সাহস আর শক্তির তারিফ করতে লাগল।

কোকোকে নিয়ে প্রশ্নও করতে লাগল কেউ-কেউ।

'একে তো এ-গাঁয়ে আগে দেখিনি!'

'ছেলেটার গলায় ওটা কী?'

'ও কাদের বাড়িতে এসেছে?'

'ওর নাম কী?'

কোকো কোনও কথায় কর্ণপাত করছিল না। ও এমনভাবে রাহুলের একটা হাত জড়িয়ে ধরে ছিল যেন হাতটা ছেড়ে দিলেই ও হারিয়ে যাবে। দীপায়নও রাহুলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। ও রাহুলকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য তাড়া লাগাচ্ছিল।

রাহুল কোকোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, ‘তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, কোকো। ওই বাজে ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়ালে কেন? জানো, ওরা গুন্ডা-মাস্তান?’

‘গুন্ডা কাকে বলে? মাস্তান...কী?’ সরল মুখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল কোকো।

রাহুল ওকে হাত ধরে টানল। হাঁটতে শুরু করল। পিছনে দীপায়ন।

হাঁটতে-হাঁটতেই রাহুল বলল, ‘গুন্ডা। মাস্তান। ওদের সঙ্গে ছোরা থাকে, রিভলভার থাকে। ওরা খারাপ।’

কোকো রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মাস্টারজির কাছে...রিভলভার আছে। মাস্টারজি...খারাপ।’

রাহুল অবাক হলেও কোনও কথা বলল না। ওকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

দীপায়ন রাহুলকে জিগ্যেস করল, ‘মাস্টারজি আবার কে?’

ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য রাহুল ঠোঁট উলটে বলল, ‘কী জানি! ও মাঝে-মাঝে ওরকম উলটোপালটা কথা বলে।’

দীপায়ন বলল, ‘আমার তো চিন্তা হচ্ছে রে। মাকুরা সহজে ছাড়বে না।’

চিন্তা রাহুলেরও হচ্ছিল। মাকু, নেনে ওরা মোটেই সুবিধের নয়। ওরা দোকানদারদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করে। সুযোগ পেলে ছিনতাই করে, ওয়াগন ভাঙে। রেল-লাইনের ধারে ওদের আসল ঠেক। সেখানে রাতে ওরা নেশা-ভাং-এ চুর হয়ে হইহুল্লোড় করে।

রাহুল আপনমনেই বলল, ‘আমিই ভুল করলাম। কেন যে প্রোটেস্ট করতে গেলাম!’

দীপায়ন বলল, ‘তুই লাথিটা খাওয়ার পর চেপে গেলেও হত।’

‘আমি তো চেপেই গেছিলাম। এই যে কোকোটা!’ কোকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে রাহুল কপট রাগের গলায় বলল, ‘কোকোটাই তো নেনের সঙ্গে ঝামেলা করল!’

কোকো নির্বিকার সুরে বলল, ‘ছেলেটা তোমাকে...মারতে যাচ্ছিল...।’

দীপায়ন বলল, ‘হ্যাঁ—তা যাচ্ছিল। কিন্তু...।’

দীপায়নের কথা শেষ হওয়ার আগেই কোকো বলে উঠল, ‘রাহুলকে যে...মারবে তাকে আমি...ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না।’

বিকেলের শেষ আলো এসে পড়েছিল কোকোর মুখে। ও এক অদ্ভুত মমতা মাখা সরল চোখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা আন্তরিক টান টের পেল রাহুল। এই বোকা-হাবা ভোলাভালা ছেলেটা মাত্র দু-সপ্তাহে বিচিত্র এক আত্মীয়তার অদৃশ্য সুতোয় রাহুলদের কখন যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে।

রাহুলের মনে হচ্ছিল, ঢলে পড়া সূর্যের আলো পড়ে নয়—কোকোর মুখটা এমনিই উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

।।পাঁচ।।

দু-সপ্তাহে কোকোর কথা গ্রামের যে-ক’জন জেনেছিল, মাকুদের সঙ্গে মোকাবিলার পর সেই সংখ্যাটা প্রায় পঞ্চাশ গুণ হয়ে গেল।

যে-বাচ্চা মেয়েটা মাকুর বাইকের তলায় আর-একটু হলেই চাপা পড়ছিল, তার বাবা-মা ঘটনার পরদিন সন্ধেবেলা রাহুলদের বাড়িতে এলেন—সঙ্গে মেয়েটি। ওঁদের খুব সাধ জেগেছে রাহুল আর কোকোকে স্বচক্ষে একবার দেখেন। ঘোর কলিযুগে এখনও এমন লোক আছে যারা অচেনা-অজানা কাউকে বাঁচানোর তাগিদে প্রতিবাদ করে, ঝুঁকি নেয়!

ওঁদের সঙ্গে গল্প করে কোকো দারুণ খুশি। ওর কথাবার্তা শুনে রাহুল অবাক হল। ওর মনে হল, কোকো যেন প্রথমদিককার তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন বিকেলে ফুটবল খেলতে-খেলতে কোকো রাহুলদের ক্লাবে নিয়মিত ফুটবল প্লেয়ার হয়ে উঠল। শুধু রাহুলরা ওকে অনেক করে অনুরোধ করেছে ও যেন জোরে শট না মারে। কারণ, রোজ-রোজ ফুটবল ফেটে গেলে ফুটবল কেনার পয়সা জোগাবে কে!

মাকুদের সঙ্গে এনকাউন্টারের ব্যাপারটা রাহুল ইচ্ছে করেই মাম কিংবা বাপিকে প্রথমে বলেনি। ভুল একটা যখন হয়ে গেছে তখন শুধু-শুধু ওঁদের টেনশান বাড়িয়ে লাভ কী! কিন্তু বাপি পরদিন সকালে খবরটা পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে সেদিন রাতে রাহুলকে মাম আর বাপির জেরার মুখে পড়তে হল।

রাহুল লুকোচুরি না করে সব কথা খুলে বলল।

শুনে বাপি ওকে বললেন, খুব সাবধানে চলাফেরা করতে। সবসময় কেউ না কেউ যেন সঙ্গে থাকে—একা-একা রাহুল যেন কোথাও না যায়—বিশেষ করে রেললাইনের দিকে।

কোকো একবার বলে উঠল, 'আমি তো রাহুলের সঙ্গে সবসময় থাকি...।'

বাপি আর মাম স্নেহভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মাম বললেন, 'তোমারও তো বিপদের ভয়, কোকো। রাহুল স্কুলে যাওয়ার সময় আর ফেরার সময় আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। আর খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময়—' রাহুলের দিকে তাকালেন মাম : 'দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিবি। বলবি একটু বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।'

কোকো কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাহুল হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিল।

এই নিয়মেই কয়েকদিন চলল। মাকু বা ওর দলের ছেলেদের সঙ্গে রাহুলদের দেখা হয়, কিন্তু ওরা কিছু বলে না। সাইকেল, বাইক নিয়ে রাহুলদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবে আড়চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে।

রাহুলের মনে হয়, কোকোর সুখ্যাতির জন্যই মাকুর দলবল 'বদলা' নেওয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ছে।

কোকোর কথা এখন মণিমেলার প্রায় সবাই জানে। তা ছাড়া মাকুদের কাজকর্ম কেউই পছন্দ করে না। ওদের ওপর সবাই বিরক্ত। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে যদি কোকো বা রাহুলের গায়ে হাত পড়ে তা হলে মাকুদের বিপদ হতে পারে।

এসব কথা ভেবেই মাকু অপেক্ষা করছিল। আর একইসঙ্গে সুযোগ খুঁজছিল।

রাহুল কোকোর জন্য দুশ্চিন্তা করলেও কোকো একেবারে চিন্তাভাবনাহীন। ও ওর মতোই দিন কাটাতে লাগল। টিউবওয়েল পাম্প করে জল তোলা, বাগানে পাখি কিংবা প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি, ব্যায়াম করা, রাহুলের স্কুলে যাওয়া-আসা, কখনও-কখনও বাপির সঙ্গে বাজারে যাওয়া, বিকেলে মাঠে গিয়ে খেলা, আর বাপির সময় হলেই বাপির কাছে বসে ছবি আঁকা শেখা।

কোকোর দিকে তাকিয়ে মাম আর বাপি অবাক হয়ে ভাবেন। ছেলেটা কেমন শিশুর মতো নিশ্চিন্ত আরামে রয়েছে! ওকে দেখে মাঝে-মাঝে মনে হয়, ও যেন প্রকৃতিরই একটা অংশ।

রাহুলরা বহুদিন ধরেই ভাবছিল ওদের ক্লাব থেকে একটা লাইব্রেরি তৈরি করবে। এবার ওরা একটা ঘরের সন্ধান পেয়েছে। মণিমেলার সবচেয়ে পুরোনো ডাক্তার ডক্টর পরমেশ হালদার ওঁর দোতলা বাড়ির একতলার একটা ঘর রাহুলদের ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে ওদের লাইব্রেরি হবে—'মণিমেলা সাধারণ পাঠাগার'।

ঘর হাতে পাওয়ার পর রাহুলরা চাঁদা তুলতে শুরু করেছে। তারপর সেই টাকায় ঘর সারানোর কাজেও হাত দিয়েছে। একইসঙ্গে রাহুলরা রবিবার বা ছুটির দিনে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গল্পের বইয়ের খোঁজ করছে। বলছে, 'আমাদের লাইব্রেরিতে গল্পের বই ডোনেট করুন।'

ওদের উদ্যোগে বহু মানুষ সাড়া দিয়েছে। চাঁদার পাশাপাশি বইও পাওয়া যাচ্ছে অনেক।

এসব কাজে রাহুলদের সঙ্গে কোকোও টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডোনেশানে পাওয়া বইয়ে থলে ভরতি করে দু-হাতে দুটো থলে ঝুলিয়ে ও রাহুলদের সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি অক্লান্তভাবে হেঁটে চলেছে।

এরকমই এক রবিবার। বেলা প্রায় একটা বাজে। মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। চারপাশে গরম বাতাস বইছে। রাহুলরা দল বেঁধে বাড়ি-বাড়ি ঘুরছে। ওদের দলে রাহুল, নিধু, গোপাল আর কোকো ছাড়া ছিল

ওদের ক্লাবের সেক্রেটারি ঝন্টুদা। ঝন্টুদা ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। চাকরি করে।

একসময় ক্লান্ত হয়ে ওরা ক্ষান্ত হল। একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে দাঁড়াল। কোকো হাতের ভারী থলে দুটো নামিয়ে রাখল মাটিতে। বটগাছের লাগোয়া একটা বড়-সড় পানের দোকান। দোকানের বাইরে থরে-থরে সাজানো কোল্ড ড্রিঙ্কের পেটি।

ঝন্টুদা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে বলল, 'অ্যাই, তোরা সবাই একটা করে পেপসি খা। আমি খাওয়াচ্ছি।'

রাহুলরা সবাই মিলে 'ঝন্টুদা, জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দোকানদারের কাছ থেকে পাঁচটা ঠান্ডা পেপসি নিল। একটা বোতলে স্ট্র ঢুকিয়ে কোকোর হাতে দিল রাহুল : 'নাও, পেপসি খাও—।'

কোকো বোতলটা নিয়ে অনভ্যস্ত ঢঙে সিপ করতে শুরু করল।

সবার আগে কোকোর পেপসি খাওয়া শেষ হল। পরপর দুটো ঢেঁকুর তুলল ও।

রাহুলের কোল্ড ড্রিঙ্ক খাওয়া শেষ হলে কোকো বলল, 'রাহুল... পেপসি...খেতে খুব ভালো। মিষ্টি। ভালো।'

ঝন্টুদা ওকে জিগ্যেস করল, 'তুমি আর-একটা খাবে?'

কোকো মাথা হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ...খাব।'

আর-একটা পেপসির বোতল নিয়ে কোকোর হাতে দিল রাহুল। কোকো পরম উৎসাহে স্ট্র মুখে চেপে ধরে পেপসি খাওয়ায় মন দিল। আর রাহুলরা লাইব্রেরির নানান পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

এমন সময় মাকুর বাইক দেখা গেল। ভটভট আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে আসছে।

রাহুলদের কাছে এসে বাইকটা থামাল মাকু। ওর পিছনে বসে আছে নেনে। মাকুর গায়ে টি-শার্ট আর জিনসের প্যান্ট। আর নেনে একটা হলুদ শার্ট আর কালচে প্যান্ট পরে আছে।

মাকু বাইকের স্টার্ট বন্ধ করেনি। বরং মাঝে-মাঝে হাতল ঘুরিয়ে ইঞ্জিন রেস করছে।

নেনের আঙুলে সিগারেট ধরা ছিল। ঝন্টুদাকে দেখে ও উদ্ধত রুক্ষ ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিতে লাগল। ঝন্টুদা অস্বস্তিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

নেনে বাইক থেকে নেমে পড়ল। চোখ সরু করে সিগারেটে টান মারতে-মারতে এগিয়ে এল রাহুলদের দিকে—অথবা পানের দোকানের দিকে।

রাহুল চট করে তাকাল কোকোর দিকে। ওর বুক কেঁপে উঠল। যদি আগের দিনের মতো কিছু একটা হয়! রাহুলের ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি নেনে ওর বুকের ভেতরে হওয়া ধড়াস-ধড়াস শব্দ শুনতে পাবে।

ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল পানের দোকানের সামনে থেকে পায়ে-পায়ে সরে যেতে লাগল। রাহুলও সেই চেষ্টাই করল। নেনের নজর এড়িয়ে কোকোর জামা ধরে চোরা টান মারল। কিন্তু কোকো সেটা টের পেলে তো! ও তখন পেপসি খেতে মশগুল। স্ট্র-এর টানে বোতলের তরলে চড়বড়-চড়বড় শব্দ হচ্ছে।

নেনে ঝন্টুদার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর বাঁ-হাতে সিগারেট, ডানহাতটা পকেটে গোঁজা।

ঝন্টুদার মুখে পরপর দুবার ধোঁয়া ছুড়ে দিল নেনে। ঝন্টুদা মুখে কিছু বলল না—শুধু নাক টিপে এক ঝটকায় মুখটা পাশে ফেরাল।

'কী, সেক্রেটারিবাবু! শুনলাম, ডাক্তার হালদারের একতলার ঘরটা তোমরা লপকে নিয়েছ—লাইব্রেরি না কীসব করবে।'

মুখটা ঘুরিয়ে রেখেই চাপা গলায় ঝন্টুদা জবাব দিল, 'আমাদের গ্রামে একটা লাইব্রেরি হওয়া খুব দরকার। অনেকদিন ধরে সবাই বলছে...তাই ডক্টর হালদারের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম। লাইব্রেরিটার নাম হবে ''মণিমেলা সাধারণ পাঠাগার''। ডক্টর হালদার বলেছেন...।'

'ওসব ঢপের কেত্তন ছাড়ো!' নেনে খিঁচিয়ে উঠল, 'পাঠাগার হবে না কাঁচকলা হবে। ও-ঘরটা আমরা টার্গেট করেছিলাম...ক্লাবঘর করব। তো বুড়োটাকে তোমরা টুপি দিয়ে ঘরটা হড়কে নিলে?'

নিধু ভয় পেলেও মিনমিন করে পাশ থেকে বলল, 'সত্যি বলছি—লাইব্রেরি হবে। এই তো—' গাছতলায় রাখা বইভরতি থলে দুটো দেখাল : 'আমরা সবার কাছ থেকে চেয়ে-চেয়ে গল্পের বই জোগাড় করছি...।'

নেনে সিগারেট ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতে খপ করে নিধুর কলার চেপে ধরল : 'তুই কি সালা ঝন্টুর উকিল না কি?'

মাকু বাইকে গরগর আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল নেনের কাছে। বাইক থামাল।

নেনের কথায় রাহুলের গা জ্বালা করছিল। কিন্তু মাকুদের সঙ্গে ওদের লড়ার ক্ষমতা কতটুকু! তা ছাড়া মাম আর বাপি বলেছেন, এসব ঝামেলা এড়িয়ে থাকতে।

রাহুল মারপিটকে ভয় পায়। তাই ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। নেনেরা বোধহয় এক্ষুনি গায়ে পড়ে একটা গন্ডগোল তৈরি করবে।

ও কোকোর দিকে তাকাল। নির্বিকারভাবে পেপসি খেয়ে চলেছে।

নিধুকে কলার ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল নেনে। আর মাকু দাঁত বের করে হাসছিল।

রাহুল ভয় পেলেও প্রতিবাদ না করে থাকতে পারল না।

'নিধুকে ছেড়ে দাও!' ও চেঁচিয়ে বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে নিধুকে ছেড়ে দিল নেনে। এবং রাহুলের দিকে ঘুরল। কিন্তু রাহুলের দিকে এক পা এগিয়েই থেমে গেল ও। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কোকোর দিকে। ও তখন পেপসি খাওয়া শেষ করে খালি বোতলটা দোকানির হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

'এই তোতলা কাত্তিক!' বাজেভাবে হাত নেড়ে কোকোকে কাছে ডাকল নেনে। তারপর রাহুলকে লক্ষ করে বলল, 'তোর গায়ে হাত তুললেই তো আবার ওই ক্যালানে কাত্তিক রুখতে আসবে। এলে আজ ওকে মজা দেখাব। সেদিন কিছু বলিনি...।'

কোকো নেনের কাছে এগিয়ে আসছিল। তাই দেখে রাহুল আর থাকতে পারল না। ও নেনের হাত চেপে ধরে অনুনয় করে বলল, 'ওকে কিছু বোলো না। ওর অসুখ আছে...।'

'সব অসুখ আজ ঝেড়ে সারিয়ে দেব।' ঠোঁট বেঁকিয়ে কথাটা বলে এক ঝটকায় রাহুলের হাত ছাড়িয়ে নিল। শব্দ করে হেসে উঠল : 'সেদিন মওকা পেয়ে আমাকে হেভি বেইজ্জত করেছিস...।'

মাকু বাইকে বসা অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বলল, 'মালকে একটু বাইক দিয়ে চেটে দেব নাকি?'

ঝন্টুদা নেনের কাছে এগিয়ে এল : 'এসব কী হচ্ছে? কেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করছ, ভাই? তোমাদের ক্লাবঘরের জন্যে অন্য আর-একটা ঘর...।'

ঝন্টুদার মুখে থুতু ছুড়ে দিল নেনে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ধমকে উঠল, 'ফোট সালা! কাঁঠালের আঠা মারতে এসেছে! এখুনি বডি নামিয়ে দেব। ফোট!'

ঝন্টুদার মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। ঘৃণার চোখে নেনেকে দেখল। তারপর এক-পা পিছিয়ে এল।

কোকোকে আদুরে গলায় কাছে ডাকল নেনে। ডানহাতটা পকেট থেকে বের করে নিল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাহুল ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

নেনের হাতে প্রায় ছ'ইঞ্চি ফলার একটা চকচকে ছুরি। বাতাসে ফলাটা ধরে সাপের ফণার মতো নাচাচ্ছে।

ছুরিটা দেখামাত্রই কোকো কেমন যেন হয়ে গেল। কাতর চোখে নেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার...সঙ্গে...আমি মারপিট করব না...।'

'কেন রে, তোতলা কাত্তিক? লড়বি না কেন?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল কোকো : 'আমি...আর কাউকে...মারব না। কাউকে...কষ্ট দেব না। আমি...আর মারপিট...করব না। কাউকে... কষ্ট...দেব না।'

এ-কথায় মাকু আর নেনে হো-হো করে হেসে উঠল।

রাহুল বিপন্ন মরিয়া চোখে চারপাশে তাকাচ্ছিল। যদি কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুপুরে পথে তেমন লোকজন নেই। আর যে-দু-একজন পথচারী চোখে পড়ছে তারা মাকুর মার্কামারা মোটরবাইক দেখেই সটকে পড়ছে। সেইসঙ্গে রাহুল এটাও লক্ষ করল যে, পানের দোকানের দোকানদার তার বসার জায়গা ছেড়ে মেঝেতে নেমে পড়েছে। ধীরে-ধীরে পা বাড়াচ্ছে দোকানের খিড়কি-দরজার দিকে। এই জায়গাটাকে সে আর নিরাপদ মনে করছে না।

নেনে কোকোর দিকে আরও এক-পা এগিয়ে যেতেই কোকো দু-পা পিছিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠল : 'আমি আর কাউকে...মারব না। কাউকে কষ্ট দেব না। মাস্টারজিকে আমি বলেছি। মারপিট করতে আমার ভালো লাগে না। আমি...বাড়ি...যাব।'

অন্য সবার কাছে কোকোর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ মনে হচ্ছিল। কিন্তু রাহুল যেন কিছু-কিছু বুঝতে পারছিল।

কোকো পিছোতে-পিছোতে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল। তারপর চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

মাকু আর নেনে এই পাগলামি দেখে আবার হেসে উঠল। আর রাহুলরা কোকোর কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেল।

যে-ছেলেটার গায়ে এত শক্তি সে কি না এরকম ভয় পেয়ে গেছে!

রাহুল আন্দাজ করল, কোকোর ভয়টা আসলে নেনের হাতের ছুরিটার জন্য। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কোকো তখন গাছের একটা ডালে বসে আপনমনে বলে চলেছে, 'আমি আর লড়ব না। কাউকে মারব না। কষ্ট দেব...না। মারব...না।'

নেনে হাতের ছুরিটা শূন্যে নাচিয়ে কোকোকে দু-চারবার নকল ভয় দেখাল। যেন এই ও কোকোর গায়ে ছুরি বসাল বলে। কোকো সেই ভয় দেখানোর তালে-তালে সিঁটিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সেটা দেখে নেনে আর ওর দাদা বেশ মজা পাচ্ছিল।

রাহুল কোকোর হেনস্থা আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল, 'ওকে শুধু-শুধু ভয় দেখাচ্ছ কেন? ছেড়ে দাও—।'

সঙ্গে-সঙ্গে নেনের হাসিটা বদলে গেল হিংস্র কুটিল মান-চিত্রে। ও চট করে চলে এল রাহুলের কাছে। ছুরির ডগাটা ছুঁইয়ে দিল ওর গলায়। নোংরা গালাগাল দিয়ে বলল, 'একদম চুপ। নইলে...।'

নইলে কী হবে সেটা আর নেনের বলা হল না।

কারণ, চোখের পলকে গাছ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়েছে কোকো। একটা ডিগবাজি খেয়ে শরীরটা গড়িয়ে নিয়ে এসেছে নেনের কাছে। দু-হাতে ওর দুটো পা ধরে প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টান মেরেছে।

নেনে উপুড় হয়ে উলটে পড়ল মাটিতে। কোকো একলাফে চড়ে বসল ওর শরীরের ওপরে। ছুরি-ধরা হাতটাকে মোচড় দিয়ে চেপে ধরল পিঠের দিকে। তারপর জোরে একটা ঝটকা দিল। ছুরি খসে পড়ল নেনের মুঠো থেকে। ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

কোকো চিৎকার করে বলল, 'রাহুলকে...মারবে না। যে মারবে তাকে আমি...মেরে ফেলব।'

কথা শেষ করেই নেনের চুলের মুঠি খামচে ধরল ও। মাথাটা টেনে শূন্যে তুলল। তারপর ভয়ংকর জোরে ঠুকে দিল মাটিতে।

নেনে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। মাকু বাইকে বসে হতবুদ্ধি হয়ে ভাইয়ের করুণ অবস্থা দেখতে লাগল।

'রাহুলকে মারবে না। রাহুলকে...' নেনের দিকে আগুন-ঝরা চোখে তাকিয়ে ছিল কোকো। নেনের চুলের মুঠিটা ওর হাতে ধরা ছিল। সেই অবস্থাতেই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলছিল।

রাহুল ছুটে গিয়ে কোকোর হাত চেপে ধরল : 'কোকো! কোকো! কী করছ! ছাড়ো—ও যে মরে যাবে!'

রাহুলের দেখাদেখি ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল ওরাও কোকোর কাছে ছুটে এসেছিল। কোকোকে থামাতে চেষ্টা করছিল, ওকে হাত ধরে টেনে সরানোর চেষ্টা করছিল।

অনেক কষ্টে কোকোকে শান্ত করা গেল। নেনেকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর রাহুলের একটা হাত চেপে ধরল। ভাবটা এমন যেন এই হাতটা ও আর ছাড়বে না।

রাহুল ওকে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল।

কোকো হাঁপাচ্ছিল। নেনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝন্টুদারা তখন নেনেকে ধরে তুলে দাঁড় করাচ্ছে।

নেনে বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল। ওর কপালে রক্ত। কোকোর দিকে ও এমনভাবে চেয়ে আছে যেন অন্য গ্রহের প্রাণী দেখছে।

ঝন্টুদা পকেট থেকে রুমাল বের করে নেনের কপালের রক্ত মুছে দিল। বলল, 'ফেরার পথে একটু ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ো—।'

নেনে কোনও জবাব দিল না।

ঝন্টুদারা নেনের জামাকাপড় হাত দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে ওকে মাকুর বাইকের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

মাকু বাইক থেকে নামেনি। আগের দিনের মতো ও আর তর্জন-গর্জন করছিল না। নেনেও একেবারে চুপ। ভালো করে কারও দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

ঝন্টুদা মাকুকে বলল, 'মাকু, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। কোকো তো অত বোঝে না। আসলে রাহুলকে ও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। রাহুলকে কেউ কিছু করলে ও কেমন পাগলের মতো হয়ে যায়। যাকগে, তুমি ব্যাপারটা ভুলে যাও। আর একটা কথা : এটা নিয়ে থানা-পুলিশ কোরো না। আমরাও ব্যাপারটা আর মনে রাখব না।'

মাকু ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল।

ঝন্টুদা আর নিধু নেনেকে ধরে বাইকে বসাল। ঝন্টুদা মাকুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, 'তোমরা তো ক্লাব-ঘর করবে। আমি দেখছি—সুটেবল কোনও ঘর পাওয়া যায় কি না। আর শোনো...' মাকু তাকাল ঝন্টুদার দিকে। ঝন্টুদা বলল, 'আমরা তোমার শত্রু নই। প্লিজ, আজকের ব্যাপারটা ভুলে যেয়ো।'

মাকু আর নেনে চলে গেল। ওদের ছুটন্ত বাইকের পিছনে ধুলোর মেঘ তৈরি হল।

ঝন্টুদা, নিধু, গোপাল নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। আর রাহুল কোকোর হাত ধরা অবস্থায় ভাবছিল ওর অদ্ভুত আচরণের কথা। এই বলছে, 'আমি আর লড়ব না। কাউকে মারব না। কষ্ট দেব...না। মারব...না।' আবার পরক্ষণেই রাহুলকে 'রক্ষা' করতে সে পেশাদার যোদ্ধার তৎপরতায় শত্রুকে ঘায়েল করছে!

কোকোর লড়াই দেখে রাহুলের মনে হচ্ছিল শুধু সিনেমায় এরকম লড়াই দেখা যায়। তা ছাড়া বহুদিন প্র্যাকটিস না করলে কারও পক্ষে এরকম দক্ষতায় পৌঁছনো সম্ভব নয়।

বাড়ি ফেরার পথে রাহুল কোকোকে জিগ্যেস করল, 'কোকো, এরকম ফাইটিং তুমি কোথায় শিখলে?'

'শিখেছি ভগবতীপ্রসাদের কাছে।'

'কে ভগবতীপ্রসাদ?'

'আমার ট্রেনার। আট বছর...আমি ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর...।' হঠাৎ চুপ করে গেল কোকো। ওকে দেখে রাহুলের মনে হল, ও কী যেন ভাবছে। বোধহয় কোনও কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।

'আট বছর ট্রেনিং নেওয়ার পর কী করেছ? তারপর কী?'

কোকো রাহুলের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তারপর অনেক ফাইট করেছি। অনেক লড়াই...করেছি। অনেক জিতেছি। অনেক ফাইট করেছি...।'

রাহুল অবাক হয়ে কোকোর দিকে তাকিয়ে রইল।

।।ছয়।।

কয়েকদিন পর এক অদ্ভুত ঘটনায় মাঝরাতে রাহুলের ঘুম ভেঙে গেল।

ও অদ্ভুত সব শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। যন্ত্রণার শব্দ—তার সঙ্গে কথা।

'ওঃ! ওঃ! মাস্টারজি! ছেড়ে দাও! আমি...আর...করব না। আমাকে...ছেড়ে দাও। ওঃ...।'

দু-হাতে চোখ ডলে অন্ধকার মেঝের দিকে তাকাল রাহুল। চাপা কর্কশ গলায় টুকরো কথাগুলো কে বলছে ও ভালোই বুঝতে পারল। কিন্তু ও অন্ধকারে কোকোর শরীরটা ভালো করে ঠাহর করতে পারছিল না।

লাল আর সবুজ রঙের আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল রাহুলের। ছোট-ছোট রঙিন আলোর বিন্দু জোনাকির মতো জ্বলছে-নিভছে।

রাহুলের ঘুম ছুটে গেল। ভালো করে চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসল ও। চাপা গলায় ডাকল, 'কোকো! কোকো! কী হয়েছে?'

কোকোর কাছ থেকে কোনও উত্তর এল না। ওর যন্ত্রণার আর্তনাদ আর টুকরো কথা চলতেই লাগল।

রাহুল এবার বিছানা থেকে নেমে পড়ল। বহুদিনের অভ্যাসে ওর ডানহাত সহজেই পৌঁছে গেল আলোর সুইচের কাছে। আলো জ্বালতেই কোকোকে দেখতে পেল ও।

কোকোর দু-চোখ বোজা। শরীরটা মেঝের বিছানা থেকে গড়িয়ে চলে এসেছে বাইরে। গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে ও ছটফট করছে, গড়াগড়ি খাচ্ছে। কন্ট্রোল ব্যান্ডের গায়ে লাল আর সবুজ আলো দপদপ করে জ্বলছে। ইলেকট্রনিক খেলনায় যেমন ছোট-ছোট রঙিন বাতি থাকে সেইরকম।

রাহুল ছুটে গেল কোকোর কাছে। ঝুঁকে পড়ে ওকে জোরে ধাক্কা দিল : 'কোকো! কোকো!'

কয়েকবার ধাক্কা দিতেই কোকো চোখ খুলল। ওর ছটফটানি থেমে গেল। রাহুল দেখল, ও কুলকুল করে ঘামছে।

কোকো উঠে বসল। বড়-বড় শ্বাস ফেলছে। চোখে-মুখে ভয়। কন্ট্রোল ব্যান্ডটা এখনও দু-হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। ওটার লাল-সবুজ বাতি এখন নিভে গেছে।

রাহুল বসে পড়ল ওর পাশে।

'কী হয়েছে, কোকো? কী হয়েছে?' ওর ঘামে ভেজা গালে হাত বোলাতে-বোলাতে রাহুল বলল, 'কোনও বাজে স্বপ্ন দেখেছ?'

কোকো ভয়ার্ত চোখে রাহুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারজি... আসছে। কাছে...এসে গেছে।'

'তোমার গলার ওই ব্যান্ডটাতে আলো জ্বলছিল। লাল...সবুজ...।'

কোকো ব্যান্ডটা ছেড়ে দিল। হাত দিয়ে মুখ মুছল। চাপা গলায় বলল, 'মাস্টারজি...কাছে এসে গেলে ওরকম...আলো জ্বলে। আর...মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়...।'

কোকোর অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রাহুল। এই শিশু-যুবকের আতঙ্ক আর কষ্ট দেখে ওর মায়া হচ্ছিল। 'মাস্টারজি...আসছে। কাছে...এসে গেছে।' এর মানে কী? মাস্টারজি কাছে এসে গেলে ওই লাল-সবুজ আলোগুলো জ্বলে, কোকোর মাথায় যন্ত্রণা হয়?

ভেবে-ভেবে কোনও থই পাচ্ছিল না রাহুল। ও উঠে গিয়ে জলের বোতল নিয়ে এল। ছিপি খুলে বোতলটা এগিয়ে দিল কোকোর হাতে : 'নাও—জল খাও।'

ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল কোকো। তখনও ও অল্প-অল্প হাঁপাচ্ছে। বোধহয় মাস্টারজির আতঙ্কের রেশ এখনও কাটেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর কোকো শান্ত-স্বাভাবিক হল। তখন রাহুল আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

কোকো আপনমনে ছবি আঁকছিল। রাহুল ওর পাশে বসে ছবি আঁকা দেখছিল।

যে-ছবিটা কোকো আঁকতে চেষ্টা করছিল সেটা রাহুলদের স্কুল। যদিও ছবিটা দেখে সেটা বোঝা খুব শক্ত। তবে রাহুল যে স্কুলটাকে একটু-একটু চিনতে পারছিল তার কারণ, ওদের স্কুল বিল্ডিং-এর পাশে চারটে বড়-বড় গাছ আছে। আর তার পাশ ঘেঁষেই একটা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। কোকোর ছবিতে—বিমূর্ত এবং বিকৃত চেহারায় হলেও—সেগুলো আঁকা আছে। যদি তারপরেও কারও বুঝতে অসুবিধে হয় সেইজন্য ছবির মাথায় আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে : 'রাহুলের ইশকুল।'

রাহুলের আজ স্কুল ছুটি। স্কুলের ফাউন্ডেশান ডে। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ও কোকোর সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। ওর ইচ্ছে, কোকোর মাস্টারজি সম্পর্কে আরও কিছু খবর জেনে নেয়।

কিছুক্ষণ এটা-সেটা নিয়ে কথা বলার পর কোকো ছবি আঁকার বায়না ধরল। তখন রাহুল ওকে জল রং আর কাগজ দিয়ে ছবি আঁকতে বসিয়েছে। আর ছবি আঁকা নিয়ে টুকটাক কথা বলার ফাঁকে মাস্টারজি সম্পর্কে দু-চারটে প্রশ্ন করেছে। কোকো ওর খেয়াল মতো কখনও প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, কখনও দিচ্ছে না। ও মেঝেতে 'বাবু' হয়ে বসে ঘাড় গুঁজে একমনে কাগজের ওপরে রং বুলিয়ে চলেছে।

রাহুল ওর আঁকা ছবিটা দেখছিল। কোকোর আঁকা দেখে বোঝা অসম্ভব যে, ওর মা ভালো ছবি আঁকত।

রাহুল বলল, 'কোকো, লাল রংটায় আর-একটু জল মেশাও—হালকা করে নাও। মাস্টারজি কোথায় থাকে?'

'অনেক দূরে। এখন...কাছে...এসে গেছে। এইখানটায় সবুজ রং দিই?'

রাহুল ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। ওর মনে পড়ল, শুরু থেকে কোকো সবসময় বলে এসেছে মাস্টারজি দূরে থাকে। কিন্তু ইদানীং ও বলছে, মাস্টারজি কাছে এসে গেছে। সেই কাছে এসে যাওয়াটা কি কোকোর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডে ধরা পড়েছে?

'না, না—নীল রং দিয়ো না। তুমি তো জানো গাছের পাতা সবুজ হয়।'

কোকো ছবি থেকে মুখ তুলে তাকাল রাহুলের দিকে। হেসে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ। গাছের...পাতা...সবুজ হয়। সবুজ...।'

'মাস্টারজির কাছে আর কে-কে আছে, কোকো?'

'আকাশ তো নীল। তাই...না, রাহুল?'

'হ্যাঁ, নীল। আর কে-কে আছে মাস্টারজির কাছে?' রাহুল আবার জানতে চাইল।

'আকাশ নীল। আকাশ...নীল। রাহুল বলেছে।' আপনমনেই খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'সুলতানদা আছে। রামুদা...আছে। ময়না...আছে।'

অবাক হল রাহুল। সুলতানদা, রামুদা, ময়না—এরা কারা?

বারবার প্রশ্ন করেও কোকোর কাছ থেকে আর কোনও সূত্র পাওয়া গেল না।

'এটা তো গাছের গুঁড়ি। এটা ব্রাউন রং দাও। বাদামি।'

কোকো গাছের গুঁড়িতে সবুজ রং দিতে যাচ্ছিল। রাহুলের কথায় ও নতুন উৎসাহে বাদামি রং গুলতে শুরু করল।

'এই গাছের গুঁড়িটাও বাদামি রং হবে।' ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল রাহুল, 'আচ্ছা কোকো, মাস্টারজি তো বলছ কাছে এসে গেছে। যদি তোমার একেবারে সামনে এসে পড়ে তা হলে কী হবে?'

ছবি আঁকা থামিয়ে দিল কোকো। চোখ বড়-বড় করে তাকাল রাহুলের দিকে : 'আমার...তখন...খুব ভয় করবে।' বাঁ-হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল ও। রাহুলের দুটো আঙুল চেপে ধরে আস্তে-আস্তে বলল, 'কিন্তু...রাহুলকে ছেড়ে...আমি যাব না। মাস্টারজি ভয় দেখালেও... না। যাব না।'

রাহুল কোকোর মুঠোর মধ্যে অদ্ভুত এক উষ্ণতা খুঁজে পেল। ও আঙুল দুটো ছাড়িয়ে নিল না। কোকোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর রাহুলের হাত ছেড়ে দিল ও। আবার ছবি আঁকায় মন দিল।

গত একসপ্তাহে চারবার কোকোর কন্ট্রোল ব্যান্ডের লাল-সবুজ এল. ই. ডি. বাতি জ্বলে উঠেছে। আর একইসঙ্গে কোন এক রহস্যময় যন্ত্রণায় কোকো ছটফটিয়ে উঠেছে। রাহুল ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। কেনই বা আলো জ্বলছে, আর কেনই বা কোকো ছটফট করে উঠছে? মাস্টারজির সঙ্গে এই ঘটনার সম্পর্কই বা কী?

কোকো যে ধীরে-ধীরে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সেটা রাহুল বেশ বুঝতে পারছিল। ঘিয়া নদীর পাড়ে কোকোকে প্রথম যখন রাহুল দেখেছিল তখন ওকে দিগভ্রান্ত, জড়বুদ্ধি, মানসিক রোগী বলে মনে হয়েছিল। এখন ও কত পালটে গেছে! সবসময় হাসিখুশি। হাসিমুখে কত না পরিশ্রমের কাজ করে ও! ওর গায়ের জোর গ্রামে একরকম কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের সবাই কোকোকে ভালোবাসে। ঝন্টুদা দেখা হলেই কোকোকে আইসক্রিম কিংবা পেপসি খাওয়ায়। ঝন্টুদা লাইব্রেরির কোনও কাজের কথা বললেই কোকো একপায়ে খাড়া। তবে ওকে বুদ্ধির কাজ কেউ দেয় না—দেয় শক্তির কাজ।

কোকো সবসময় রাহুলের পিছন-পিছন ঘোরে। রাহুলকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। রাহুল কখনও বারণ করলেও ও শোনে না। রাহুলকে মাকু আর নেনের কথা বলে। বলে, 'আমি সঙ্গে থাকলে... তোমাকে কেউ কিছু করবে না। আমার গায়ে...জোর আছে।'

ওর কথায় রাহুল হাসে।

এর মধ্যে বেশ কয়েকদিন নেনে আর মাকুর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে। কিন্তু মাকুরা গায়ে পড়ে কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ এড়িয়ে গেছে।

কোকোকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে রাহুল একদিন চলে এসেছিল ঘিয়া নদীর পাড়ে।

বর্ষা কবেই এসে গেছে। সেই বর্ষার জলে নদী ফুলে উঠেছে। দুপাশের গাছপালার দল সবুজে-সবুজে মাতোয়ারা।

রাহুল কোকোকে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে শুরু করল। নদীর ঘোলাটে জল ওদের পাশে-পাশে ছুটছে।

রাহুল বলল, 'কোকো, মনে পড়ে, এই নদীতে তুমি ভেসে এসেছিলে? ওই গাছটার নীচে—' আঙুল তুলে গাছটা দেখাল রাহুল : '—তুমি পড়ে ছিলে।'

কোকো নদী বরাবর তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'মনে...আছে। আমি...সাঁতার...জানি...।'

'আমিও সাঁতার জানি।' বলল রাহুল, 'তুমি কি মাস্টারজির কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলে?'

রাহুলের দিকে তাকাল কোকো। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

'কেন, পালিয়ে এসেছ কেন?'

কোকো চুপ করে রইল। ওর শূন্য চোখ নদীর জলের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু রাহুল বুঝতে পারল ও নদীর জল দেখছে না—অন্য কিছু ভাবছে।

আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি নেই। কিন্তু শেষ বৃষ্টির জল এখনও মাটি ভিজিয়ে রেখেছে। গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে কোথায় যেন বুলবুলি আর দোয়েল ডাকছে। নদীর সঙ্গে বয়ে আসা এক অদ্ভুত হাওয়া রাহুলের মনখারাপ করে দিচ্ছিল।

কোকো হঠাৎ নদীর পাড়ে বসে পড়ল। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

রাহুলও বসে পড়ল ওর পাশে। ওর পিঠে হাত রাখল : 'কোকো, তুমি পালিয়ে এসেছিলে কেন?'

কোকো আলতো ফিসফিসে গলায় বলল, 'মাস্টারজি...আমাকে...মারত। সিগারেটের...ছ্যাঁকা দিত। তাই নদীতে...ঝাঁপ দিয়ে...পালিয়ে এসেছি।'

'তোমাকে মারত কেন মাস্টারজি?'

'আমি আর লড়তে চাইনি...তাই।' কথাটা বলে কোকো বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগল।

'কার সঙ্গে লড়তে চাওনি?' রাহুলের ভেতরে কৌতূহলের ঘূর্ণিপাক শুরু হয়ে গিয়েছিল।

'কারও সঙ্গে না। আমি বলেছি...আমি আর...লড়ব না। কাউকে...মারব না। কষ্ট...দেব না।'

রাহুল আবার ওকে জিগ্যেস করল, 'তুমি কার সঙ্গে লড়তে চাওনি?'

কোকো কোনও জবাব দিল না। শুধু রাহুলের হাতটা পিঠ থেকে নামিয়ে জোরে আঁকড়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'আমার মা নেই। বাবা নেই। কেউ...নেই।'

একই কথা বারবার বলতে লাগল কোকো। বলতে-বলতে ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাহুলের দিকে আর্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না, রাহুল।'

রাহুল ছোট বাচ্চাটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল।

কোকোকে নিয়ে রথের মেলায় গিয়েছিল রাহুল। রেললাইন পেরিয়ে আরও বেশ খানিকটা গেলে একটা বিশাল মাঠ। মাঠটার নাম 'শকুন্তলার মাঠ'। কেন যে এরকম নাম কেউ জানে না। সেই মাঠে প্রতি বছরেই রথের মেলা বসে।

মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দৈত্যের মতো নাগরদোলা। এ ছাড়া রয়েছে অনেক মণিহারী দোকান, খাবারের স্টল, খেলনাপাতির দোকান, পাঁপড়ভাজা আর তেলেভাজার দোকান। এসবের সঙ্গে এই মেলা উপলক্ষ্যেই থাকে পাখির হাট। নানান ধরনের রঙিন পাখির পসরা সাজিয়ে বসে দোকানিরা। টিয়া, চন্দনা, বদ্রিকা থেকে শুরু করে আরও কতরকম পাখি!

চারপাশে লোকজনের হইচই, হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার কান্না, মাইকের হিন্দি গান, সবমিলিয়ে এক অদ্ভুত শব্দব্রহ্ম তৈরি হয়েছিল। তারই মধ্যে কোকো আর রাহুল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বাপি আর মামের কাছে বায়না করে রাহুল কোকোকে নিয়ে মেলায় এসেছে। বাপিকে ও বোঝানোর চেষ্টা করেছে কোকো যত স্বাভাবিক জীবনে মিশবে তত তাড়াতাড়ি ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। মেলায় আসার সময় বাপি রাহুলের হাতে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।

এখন সেই পঞ্চাশ টাকা ভাঙিয়েই ওরা মেলার আনন্দ কুড়োচ্ছিল। নাগরদোলায় চড়া, তেলেভাজা আর পাঁপড়ভাজা খাওয়া, তার সঙ্গে কোকোর প্রিয় পেপসি—একের পর এক চলছিল।

একটা খেলার দোকানে বল ছুড়ে ন'টা কাঠের পুতুলকে কাত করে দেওয়ার কমপিটিশান হচ্ছিল। তিনবারের চেষ্টায় ন'টা পুতুলকে শুইয়ে দিতে পারলেই পাওয়া যাবে পুরস্কার—মাঝারি মাপের স্টেইনলেস স্টিলের একটা বাটি।

রাহুল পাঁচ টাকা দিয়ে কমপিটিশানে নাম দিল। তিনবার বল ছুড়ে ও সাতটা পুতুলকে কাত করে দিল বটে কিন্তু পুরস্কার জিততে পারল না।

রাহুল বল ছোড়ায় নাম দেওয়ার জন্য কোকোকে বলল। কিন্তু কোকো বারবার মাথা নেড়ে জানাল যে, ওর হাতে একদম টিপ নেই।

এরপর ওরা এয়ারগান শুটিং-এর স্টলে গেল। দেওয়ালে লাগানো নানা রঙের বেলুন। তারই একপাশে বেলুন লাগানো চক্র ঘুরছে, সুতোয় বাঁধা প্লাস্টিকের বাঘ-সিংহ, এমনকি জ্বলন্ত মোমবাতি আর পেরেকও ঝুলছে।

রাহুল পাঁচবার ফায়ার করে দুটো বেলুন ফাটাতে পারল। কিন্তু কোকো এবারেও রাজি হল না। মাথা নেড়ে বলল, 'আমার...হাতে টিপ নেই।'

মেলায় ঘুরতে-ঘুরতে কখন যেন সন্ধে নেমে এসেছে। চারপাশের খুঁটিতে লাগানো হ্যালোজেন আলো জ্বলে উঠেছে। স্টলে জ্বলে উঠেছে বালব আর টিউবলাইট। লোকের ভিড় আরও বাড়ছে। মাইকে মেলার কর্তৃপক্ষ কীসব যেন ঘোষণা করছে।

একটা স্টলের সামনে বহু মানুষের ভিড় দেখে রাহুল দাঁড়িয়ে পড়ল। কোকোকেও হাত ধরে টেনে থামাল।

ভিড় ঠেলে রাহুল আর কোকো কয়েকটা স্তর এগিয়ে গেল। দেখল, স্টলে একটা বিচিত্র কমপিটিশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্টলের ঠিক মধ্যিখানে একটা পুরোনো টিউবওয়েল পোঁতা আছে। টিউবওয়েলের কলের মুখে একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের বালতি বসানো। আর টিউবওয়েলের গায়ে, হাতলে, ফুলের মালা জড়ানো। স্টলের কাপড়ের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা পোস্টার আঁটা। পোস্টারে যা লেখা আছে তার সারমর্ম হল : এই টিউবওয়েলটা পাম্প করে সহজে জল তোলা যায় না; যদি কেউ দশবার পাম্প করে তার মধ্যে এই কল থেকে জল বের করতে পারে তা হলে পুরস্কার একশো টাকা।

প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার এন্ট্রি ফি দশ টাকা।

স্টলের মালিক চিৎকার করে চ্যালেঞ্জারকে আহ্বান জানাচ্ছিল : 'আসুন, দেখিয়ে দিন আপনার গায়ে কত জোর! এই বেয়াদব টিপকলটাকে শায়েস্তা করুন—!'

রাহুল দেখল, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার অনেকেই বেশ আশা নিয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে নামছে, কিন্তু হার মেনে ফিরে আসছে। কলের মুখ দিয়ে এক ফোঁটাও জল বেরোচ্ছে না।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, 'তোমার এই টিপকল থেকে জল আদৌ বেরোয় তো?'

অমনি স্টলের মালিক তার পাশে দাঁড়ানো লোকজনের মধ্যে কাকে যেন ইশারা করল। স্যান্ডো গেঞ্জি পরা স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে কলের সামনে এগিয়ে গেল। মালিকের নির্দেশে জোরালো হ্যাঁচকা দিয়ে টিউবওয়েলটা পাম্প করতে লাগল। আর মালিক চিৎকার করে এক থেকে দশ গুনতে লাগল। তার সঙ্গে-সঙ্গে পাবলিকও হইহই করে গলা মেলাল।

আটবারের বার কলের মুখ থেকে সরু সুতোর মতো জল বেরোল। তারপরের দুবারে জলের ধারাটা লাঠির মতো মোটা হল।

তারপর ছেলেটা থামল। জনতা চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রাহুল কোকোকে ঠেলা মারল : 'কোকো নাও—এবার নাম দাও...।'

কোকো কিন্তু মাথা নাড়ল। বলল, 'না, রাহুল—না।'

রাহুল ওকে ছাড়ল না। বলল, 'কেন, ''না'' কেন? এবারে তো আর টিপের ব্যাপার না—গায়ের জোরের ব্যাপার। তুমি যে বল তোমার গায়ে অনেক জোর! তা হলে ''না'' বলছ কেন?'

'না, সেজন্যে না—।' আলতো করে বলল কোকো।

'তা হলে কী জন্যে?'

'দোকানদারের একশো টাকা...মার যাবে। তাই—।'

রাহুল হেসে ফেলল। কোকোকে বোঝাল যে, দোকানদার ইতিমধ্যেই অনেক টাকা লাভ করেছে। এখন একশো টাকা গেলে তার কোনও ক্ষতি হবে না।

রাহুল কোকোর হয়ে এন্ট্রি ফি জমা দিল। তারপর কোকোকে ঠেলে টিউবওয়েলটার দিকে এগিয়ে দিল।

কোকো টিউবওয়েলের হাতলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পাবলিক হইহই করে উঠল। কোকো হাতলটা ধরে সামান্য ঝুঁকে পজিশন নিল।

দোকানদার চিৎকার করে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে নানান ঘোষণা করছিল। কোকো হাতলটা ধরে দাঁড়াতেই সে বলল, 'আপনি রেডি? এ—ক।'

কোকো টিউবওয়েল পাম্প করা শুরু করল, আর দোকানদারও গোনা শুরু করল।

কোকো যেটা করছিল সেটা হাই স্পিড সিনেমার মতো। ওর তিন নম্বর পাম্পের সঙ্গে-সঙ্গে জল বেরোতে শুরু করল। কিন্তু কোকো না থেমে পাম্প করে চলল। ছ'নম্বর পাম্পে জলের ধারাটা ময়াল সাপের মতো মোটা হয়ে গেল।

রাহুল চিৎকার করছিল, 'কোকো। থামো! থামো!' কিন্তু পাবলিকের হল্লায় ওর কথা চাপা পড়ে গেল।

দোকানদার ব্যস্তভাবে কোকোর কাছে গিয়ে ওকে থামাল। ওকে শাবাশ দিয়ে একশো টাকা পুরস্কার তুলে দিল ওর হাতে। তারপর চেঁচিয়ে বলতে লাগল কোকোর কৃতিত্বের কথা : 'এইমাত্র একজন পালোয়ান জিতে নিয়েছেন এ-ক-শো টাকা। ভাইসব, আমার এই কমপিটিশানে কোনও কারচুপি নেই, কোনও চিটিংবাজি নেই। আপনারা এগিয়ে আসুন...।'

কোকো আর রাহুল ভিড় ঠেলে বাইরে এল। রাহুল কোকোর পিঠ চাপড়ে বলল, 'কনগ্র্যাচুলেশান, কোকো—শাবাশ!'

কোকো একশো টাকার নোটটা রাহুলের দিকে এগিয়ে দিল : 'এটা রেখে দাও।'

রাহুল টাকাটা পকেটে রেখে বলল, 'এই টাকাটা মাম আর বাপিকে দেব। বলব, কী সহজে তুমি প্রাইজ জিতেছ—।'

ওরা দুজনে গল্প করতে-করতে 'শকুন্তলার মাঠ' ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ফেরার পথে রেললাইনটা পেরোতেই ওরা মাকুদের দেখতে পেল। আগাছার ঝোপের পাশে একটা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। তার ভেতরে বসে মাকুরা তাস খেলছে। ঘরের ভেতর থেকে টিভির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও' বলে রাহুল কোকোর হাত ধরে টানল। মাকুদের বিশ্বাস নেই। যখন-তখন ঝামেলা বাধাতে পারে।

ওরা যখন বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন কোকো হঠাৎই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল।

রাস্তার ওপরেই সদানন্দদার চায়ের দোকান। বেড়া আর খুঁটির মাথায় টিনের চাল। দোকানের সামনে দুপাশে দুটো বেঞ্চি। তাতে জনা-চারেক খদ্দের—খবরের কাগজ পড়ছে, চা খাচ্ছে।

সদানন্দদার দোকানের পাশেই নীলুকাকুর লন্ড্রি। নীলুকাকুর চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। রোগা দুর্বল চেহারা। গায়ে ফুলশার্ট আর পাজামা। ওর দোকানটার চেহারা ওর মতোই পুরোনো। শোকেসের কাঠ কালচে হয়ে গেছে। কাচের ওপরে বাদামি ছোপ পড়েছে। দোকানের শাটার রং চটা, জং ধরা।

দোকান বন্ধ করার জন্য সেই শাটারটাই টেনে নামাতে চেষ্টা করছিল নীলুকাকু। কিন্তু পারছিল না। সেইজন্য চেঁচিয়ে সদানন্দদাকে ডাকছিল—যদি সে একটু হাত লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সদানন্দদা চা তৈরিতে ব্যস্ত—নীলুকাকুর ডাকে সাড়া দিয়ে সে বারবার বলছিল, 'একটু সবুর করো, কাকা—যাচ্ছি।'

পথ চলতে-চলতে কোকো এসব দেখছিল, শুনছিল। হঠাৎই ও রাহুলের পাশ থেকে ছুট লাগল নীলুকাকুর লন্ড্রির দিকে। কর্কশ গলায় বলল, 'সরে দাঁড়াও, কাকা। আমি...আমি শাটার নামিয়ে...দিচ্ছি।'

কথাগুলো বলতে যতক্ষণ লাগল তার অনেক কম সময়ে শাটারের কাছে পৌঁছে গেল কোকো। বাঁ-হাতে শাটার ধরে অনায়াসে টান মারল। প্রতিবাদের ধাতব জিগির তুলে জং ধরা শাটার অটোমেটিক এলিভেটরের মতো নেমে এল। শাটারের ঘর্ঘর শব্দে চায়ের দোকানের খদ্দেররা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

নীলুকাকু তখন কোকোর থুতনিতে আঙুল দিয়ে ওকে আহ্লাদ করছে। বলছে, 'ও, তুই! তোকে আগে দেখতে পাইনি রে। পেলে তোকেই বলতাম। লক্ষ্মী ছেলে! তোর ভালো হোক।'

কোকো হেসে 'আসি' বলল। তারপর ছুট্টে চলে এল রাহুলের কাছে।

রাহুল বলল, 'কোকো, তোমাকে নিয়ে আর পারি না! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ছুট লাগালে?'

'নীলুকাকুর শাটারটা...খুব শক্ত। আগেও দু-দিন আমি...ওটা টেনে নামিয়ে দিয়েছি...।'

রাহুল অবাক হয়ে কোকোর মুখের দিকে তাকাল।

বেশ কিছুদিন ধরেই কোকো একা-একা রাস্তায় বেরোয়, মামের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মুদিখানার জিনিস কিনতে যায়। বলতে গেলে মণিমেলার সব রাস্তাই ও এখন চিনে গেছে। তা ছাড়া ওকে এলাকার সবাই ভালো করে চেনে, ভালোও বাসে।

আবার রাহুলের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল কোকো। ওদের পাশ দিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা চলে গেল। একটা সাইকেল ভ্যান নানারকম শাকসবজি নিয়ে রাস্তার ধারের লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই একটা টাইমকল। তার সামনে ভিড়। জল নেওয়ার জন্য চার-পাঁচজন লোক কলসি, বালতি, জলের বোতল নিয়ে লাইন দিয়ে আছে। আকাশে মেঘের পাতলা ঝালর। তার আড়ালে অসম্পূর্ণ চাঁদ।

আজ বিকেল থেকে গুমোট ভাব ছিল। এখন হঠাৎ যেন হাওয়ার সুড়সুড়ি টের পেল রাহুল। ওর মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। ও ভাবছিল, বাড়িতে ঢুকে বাপি আর মামকে ঠিক কীভাবে কোকোর টিউবওয়েল কমপিটিশান জেতার খবরটা জানাবে।

ঠিক তখনই একটা অশ্বত্থগাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়া। কোকোর নাম ধরে ডাকল।

'অ্যাই, কোকো!'

রাহুল আর কোকো দুজনেই চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে।

জায়গাটা অন্ধকার। রাস্তার আলো ভালো করে পৌঁছয়নি সেখানে। গাছের কালো গুঁড়ির পাশে অস্পষ্ট একটা কালো ছায়া।

'কোকো—' আবার ডাকল সেই ছায়া।

কোকো এগিয়ে গেল অশ্বত্থগাছটার কাছে। পিছনে রাহুল।

ছায়াকে চিনতে পারল কোকো : 'সুলতানদা! তুমি!'

'হ্যাঁ—আমি।' বলে সুলতান ওকে জড়িয়ে ধরল : 'তুই কেমন আছিস?' ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর মুখটা ভালো করে দেখতে লাগল সুলতান।

'ভালো...আছি।' কোকো বলল।

'শোন—তোর খুব বিপদ। মাস্টারজি তোকে খুঁজছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে কোকোর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডের লাল আর সবুজ আলো জ্বলে উঠল। এবং কোকো যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। ব্যান্ডটা দু-হাতে আঁকড়ে ধরে ও অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। ছটফট করতে-করতে ওর শরীরটা মাটিতে পড়ে গেল। যন্ত্রণার টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল ওর মুখ থেকে।

।।সাত।।

সে-রাতটা রাহুলদের বলতে গেলে না ঘুমিয়েই কাটল। কারণ সুলতান যে-কাহিনি শোনাল তারপর রাহুল, ওর বাপি আর মামের দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কোকোকে সামলে নিয়ে ধরে-ধরে বাড়ির দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল রাহুল—সঙ্গে সুলতান। যেতে-যেতে সুলতান রাহুলের সঙ্গে অল্প-অল্প কথা বলছিল।

'কোকো হারিয়ে যাওয়ার পর মাস্টারজি খেপে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের পাঁচজনকে পাঁচদিকে খুঁজতে পাঠায়। সে তার রাগ কী! রেগে একেবারে আগুন। আমাকে বলে কি ''জাহান্নম থেকে হলেও ওই মেড়াটাকে খুঁজে নিয়ে আয়।'' রাগে একদম গরগর করছিল।'

'এখন কী হবে?' ভয় পেয়ে জিগ্যেস করল রাহুল।

'দেখি কী হয়।' চিন্তার সুরে বলল সুলতান। কোকোর কাঁধে আলতো চাপড় মেরে হাসল : 'আসলে এই খোকাটাকে আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি। ও খুব ভালো ছেলে। কিন্তু ওই কন্ট্রোল ব্যান্ড...।'

'কন্ট্রোল ব্যান্ড কী?'

'ওই...মাস্টারজির কন্ট্রোল।'

ওরা ততক্ষণে রাহুলদের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল।

একটু পরে ওরা সবাই বসবার ঘরে গুছিয়ে বসল। কল্যাণবাবু বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন। রাস্তার দিকের জানালাগুলোও ভেজিয়ে দিলেন। তারপর সুলতানের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। রাহুলের মাম স্বামীকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'আমার তো বুক কাঁপছে। রাহুল এই লোকটাকে কোথা থেকে জুটিয়ে নিয়ে এল? কী হবে এখন? তুমি বরং পুলিশে খবর দাও—।'

কল্যাণবাবু স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'এখন না। আগে এর সঙ্গে কথা বলে দেখি। লোকটা এমনিতে খারাপ না। কোকোকে খুব ভালোবাসে—' স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে কল্যাণবাবু অনুরোধ করলেন, 'আমাদের একটু চা-টা খাওয়াবে না?'

রাহুলের মাম 'নিয়ে আসছি' বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

কল্যাণবাবু সুলতানের মুখোমুখি বসলেন। ভাবলেন, লোকটাকে দেখে তো শয়তান বলে মনে হচ্ছে না। একটু কথা বলে দেখা যাক না। কোকোকে সহজে আমরা ছাড়ব না।

সুলতানের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। চেহারা মাঝারি। রং ময়লা। গাল বসা। থুতনিতে কাঁচাপাকা দাড়ি। কথা বলার সময় মাঝে-মাঝেই ভুরুজোড়া ওপরদিকে তোলে। গায়ে হালকা সবুজ হাফশার্ট আর ময়লা হয়ে যাওয়া জিনসের প্যান্ট।

একটু পরেই মাম চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাপিকে চা দিলেন। সুলতানকে দিলেন। নিজেও নিলেন। তারপর কোকোর পাশে গিয়ে বসলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুলতান মাস্টারজির কাহিনি বলতে শুরু করল।

'স্যার, কলকাতার কাছাকাছি খড়দায় মাস্টারজির একটা অনাথ আশ্রম আছে। ''করুণাময়ী'' নাম। সেখানে বাপ-মা মরা হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেরা থাকে। মাস্টারজি ওদের দু-বেলা খেতে দেয়, থাকতে দেয়—আর কাজ শেখায়। কাজ তো সব নানারকমের : রাজমিস্ত্রির কাজ, ছুতোরমিস্ত্রির কাজ, লেদ কারখানার কাজ, গেঞ্জির কল চালানোর কাজ, আরও কতরকম।

'মাস্টারজির অনেক কলকারখানা আছে, ব্যবসা আছে, কলকাতার সল্টলেকে তিনতলা জমকালো একটা বাড়ি আছে। লোক বলে, মাস্টারজি বহুরকম দু-নম্বরি ব্যবসার সঙ্গে মিলেজুলে আছে। একবার জাল নোট মার্কেটে ছাড়তে গিয়ে গোয়েন্দা-পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তিনমাস জেলও খেটেছিল। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে কীভাবে যেন পুলিশের সঙ্গে লাইন করে নিয়েছিল।'

বাপি জিগ্যেস করলেন, 'কোকো ওই ''করুণাময়ী''-তে গেল কীভাবে?'

'কীভাবে আবার! ওর নসিব।' চায়ে চুমুক দিয়ে বলল সুলতান। একটু উসখুস করল। তারপর : 'মাস্টারজির দলে অনেক আড়কাঠি আছে—দালাল। ওরা সব হ্যান্ডিক্যাপ ছেলের খবর আনে। তারপর ওই আশ্রমে ওদের ভরতি করে মাস্টারজি কমসেকম একটা বছর ঠিকঠাক চালায়। দ্যাখে যে, কেউ ওই ছেলেগুলোর খোঁজখবর করতে আসছে কি না। মানে, বাবা, মা, রিলেটিভ কেউ আসছে কি না। তারপর কেউ না এলে তখন মাস্টারজি নিশ্চিন্ত হয়। নিজের মতো করে ওদের ট্রেনিং চালু করে।'

'কীসের ট্রেনিং?' রাহুল জিগ্যেস করল।

উত্তরে মলিন হাসল সুলতান। বলল, 'ওই হরেকরকম কাজ শেখানোর ট্রেনিং। কলকারখানার কাজের ট্রেনিং। এ ছাড়া আছে ফাইটিং-এর ট্রেনিং...।'

'ফাইটিং-এর ট্রেনিং!' মাম অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ। অনাথ আশ্রমে মাস্টারজির একটা ইল্লিগাল ক্লাব আছে। নাম ''ফাইট ক্লাব''। এই ক্লাবের কথা অনেকে জানে। পুলিশও জানে। তবে ওই টাকাপয়সা দিয়ে সেখানে মাস্টারজি লাইন করে রেখেছে আর কী! তো ওই ক্লাবে সপ্তাহে দু-দিন কি তিনদিন ফাইট কমপিটিশান হয়। দুজন ফাইটার বাজি ধরে লড়াই করে। সে-লড়াই নিয়ে দর্শকরাও বাজি ধরে। লড়াইয়ের পর ফাইটারদের টাকা দেওয়া হয়। যে জেতে সে পায়

বেশি। যে হারে সে পায় কম। তবে কম পেলেও সে-টাকা অনেক। এর লোভে অনেকেই লড়াইয়ে নাম দেয়।

'আশ্রমের ছেলেদের বাচ্চা বয়েস থেকেই মাস্টারজি ট্রেনিং করায়। রেগুলার ব্যায়াম শেখায়, মারপিটের হরেক টেকনিক শেখায়। একজন ট্রেনার তাই-কোন্ডো শেখায়। নাম ভগবতীপ্রসাদ। ব্ল্যাক বেল্ট। একবার শুনেছি এশিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কোকো ওর খুব ফেবারিট ছাত্র। আট বছর ধরে কোকোকে লড়াই শেখাচ্ছে।'

সুলতান একবার কোকোর দিকে তাকাল। কোকো শূন্য দৃষ্টি নিয়ে সরল মুখে বসে আছে। ওর চোখ সুলতানের দিকে।

সুলতান আপনমনে মাথা ঝাঁকাল। সকলের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিল। একটা বড় শ্বাস ফেলে আবার বলতে শুরু করল।

'ট্রেনিং দেওয়া ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে মাস্টারজি ''ফাইটার বয়''-দের বেছে নেয়। তারপর ওদের খালি হাতে লড়াইয়ের স্পেশাল ট্রেনিং করায়। তারপর...তারপর ওরা ওই ''ফাইট ক্লাব''-এর জুয়ায় নাম দেয়। সেখান থেকে মেলা টাকা ইনকাম করে। ওদের সামান্য হাতখরচা দিয়ে বাকি টাকা মাস্টারজি চোট করে দেয়। তাই ''ফাইটার বয়''-দের মাস্টারজি সহজে হাতছাড়া করে না।

'আর কোকো?' কোকোর দিকে ইশারা করে আক্ষেপের হাসি হাসল সুলতান : 'ও এ পর্যন্ত একটাও লড়াই হারেনি। ও হচ্ছে ''ফাইটার বয়''-দের মধ্যে গোল্ডেন বয়। জুয়েল। সুপার হিরো। ওকে লড়াইয়ে নামিয়ে মাস্টারজি লক্ষ-লক্ষ টাকা ইনকাম করেছে। তাই কোনও অবস্থাতেই ওকে হারাতে চায় না মাস্টারজি। ওর খোঁজে মাস্টারজি আমাদের পাঁচজনকে লড়িয়ে দিয়েছে। আমিই সবার আগে কোকোকে খুঁজে পেলাম...কিন্তু মাস্টারজিকে সে-কথা কেমন করে জানাব! এই ছেলেটাকে আমি যে বড় ভালোবাসি...।' কথা বলতে-বলতে কোকোর দিকে তাকাল সুলতান। ওর চোখে স্নেহ আর আদর ঝরে পড়ছিল।

হঠাৎই মোবাইল ফোন বেজে উঠল। আচমকা এই সুরেলা আওয়াজে সবাই চমকে উঠল।

সুলতান তড়িঘড়ি পকেটে হাত ঢোকাল, ফোন বের করল। ইনকামিং কলের নম্বরটা দেখার পর ও এমনভাবে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল যেন হাতের মুঠোয় একটা ঝুমঝুমি সাপ ধরে আছে।

ওর হাবভাব দেখে কারও আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ফোনটা কে করেছে।

বাপির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুলতান। চোখে জিজ্ঞাসা : এখন কী করবে?

বাপি ইশারায় ওকে ফোনটা ধরতে বললেন।

'হ্যালো—।' ফোনটা ধরেই সুলতান লাউডস্পিকার অন করে দিল—যাতে সবাই ও-প্রান্তের কথা শুনতে পায়।

'কে, সুলতান? মেড়াটাকে খুঁজে পেলি?' মাস্টারজির ক্ষিপ্ত গলা।

'না, মানে...এখনও পাইনি। খুঁজছি।' ইতস্তত করে বলল সুলতান।

'তুই এখন কোথায়?'

'মণিমেলায়...।'

ও-প্রান্ত কিছুক্ষণ চুপ। তারপর : 'আমরা মণিমেলা থেকে বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার মতো দূরে আছি। আমার গাড়িতে একজন লোকাল লোককে তুলে নিয়েছি—লোকটা ঘিয়া নদীর আশপাশের গ্রামগুলো সব চেনে। তুই ভালো করে বিচ্ছুটাকে খোঁজ। ওটাকে পেলে আর লড়াব না। ''করুণাময়ী''-তে এনে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেব—যাতে আর কোনও ''ফাইটার বয়'' এরকম বেয়াদপি না করে।'

মাস্টারজির শাস্তির কথাটা শুনে মামের মুখ থেকে ভয়ে একটা হেঁচকির শব্দ বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাম মুখে হাত চাপা দিলেন—পাছে আবার কোনও শব্দ হয় এবং সেটা ফোনে শোনা যায়।

সুলতানের মোবাইল সেটটা নিশ্চয়ই বেশ দামি, কারণ মাস্টারজি যে মামের চাপা আর্তনাদটা ফোনে শুনতে পেয়েছে সেটা পরের কথাতেই বোঝা গেল।

'সুলতান, তুই এখন কোথায়? কার বাড়িতে, উঁ?' প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটু ব্যঙ্গের খোঁচা।

'না, না—কারও বাড়িতে নয়। একটা...চায়ের দোকানে...।'

'হুঁ—বুঝেছি।'

ফোন ছেড়ে দিল মাস্টারজি।

সুলতান ভয় পেয়ে গেল : 'এখন কী হবে? মাস্টারজি যদি এখানে চলে আসে?'

মাম বললেন, 'শিগগির পুলিশে খবর দাও।'

'দাঁড়াও।' হাতের ইশারা করলেন বাপি : 'আমাকে একটু ভাবতে দাও—।'

কোকো এবার কথা বলল : 'না, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে...কোথাও যাব না...।'

বাপি ওর দিকে একবার তাকালেন শুধু—কোনও কথা বললেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করলেন।

মাম বললেন, 'মণিমেলায় মাস্টারজি যদি আসেও আমাদের বাড়ি কেমন করে খুঁজে পাবে? কোকো এখানেই থাক। যদি কোনও বিপদ-আপদ হয় তখন বরং থানায় খবর দেওয়া যাবে।'

সুলতান মাথা চুলকোচ্ছিল। কী যেন ভাবছিল।

রাহুল এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কোকোকে দেখছিল। ও বাপিকে লক্ষ করে বলে উঠল, 'কোকোকে আমরা ছাড়ব না, বাপি। ও আমাদের কাছে থাকবে।'

বাপি পায়চারি করতে-করতে থুতনিতে কয়েকবার আঙুল বোলালেন। থানা-পুলিশ করলে ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করবে কে জানে! হয়তো জেলখানাতে রেখে দেবে। নয়তো ফাইল চালাচালি করে কোনও পাগলা-গারদেই পাঠিয়ে দেবে।

বাপি আর ভাবতে পারছিলেন না।

সুলতান বলল, 'স্যার, আমি পাপী-তাপী মানুষ। মাস্টারজির পয়সা খেয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু এই ছেলেটা বড় ভালো। মানে, ওকে আমার খুব ভালো লাগে। ছোট মুখে একটা বড় কথা বলি। আপনারা ওকে কাছছাড়া করবেন না। মাস্টারজি এখানে আসে আসুক। তখন দেখা যাবে। যা হয় হবে...।'

সুলতানের কথাটা সবার মনে ধরল। মামের মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাহুলও ওর খুশির ভাবটা চেপে রাখতে পারছিল না।

বাপি চেয়ারে বসে পড়লেন আবার। সুলতানকে বললেন, 'আচ্ছা, ওই মাস্টারজি তো আমাদের বাড়িটা খুঁজে নাও পেতে পারে...।'

মাথা নেড়ে হাসল সুলতান : 'উঁহু—সেটা হওয়ার জো নেই। ওই যে, ওর গলার ওই কন্ট্রোল ব্যান্ড। মাস্টারজির কাছে একটা রিমোট আছে। ওটার রেঞ্জ প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। ওই রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল ব্যান্ডটাকে কন্ট্রোল করা যায়। ওই ব্যান্ডটা যদি কারও গলায় পরানো থাকে তা হলে ওই রিমোটের বোতাম টিপে বোঝা যায় লোকটা কত দূরে আছে। আর যার গলায় ওটা পরানো থাকে তাকে ওই রিমোটের বোতাম টিপে শায়েস্তা করা যায়...।'

'শায়েস্তা মানে?' বাপি জিগ্যেস করলেন।

'মানে, রিমোটের বোতাম টিপলে কোকোর বডির ভেতর দিয়ে কীসব ওয়েভ যাবে। তাতে কোকোর যন্ত্রণা হবে, ও কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করবে। আর-একটা লাল রঙের বোতাম আছে—সেটা টিপলে মাথা ধরবে, মাথার যন্ত্রণা হবে, মাথা ঘুরবে। মাস্টারজি ফরেন থেকে এরকম মেশিন বেশি কয়েকটা আনিয়েছে। ''ফাইটার বয়''-দের মধ্যে যারা একটু বেয়াড়া, এই মেশিনগুলো তাদের জন্যে। গলার ওই ব্যান্ডগুলো এমন

যে, রিমোটের ঠিকঠাক বোতাম না টিপে ওগুলো গলা থেকে খুলতে গেলে অসহ্য পেইন হবে। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যাবে...।'

রাহুলের মনে পড়ল, কোকো ওর গলার ওই ব্যান্ডটায় কাউকে কখনও হাত দিতে দেয় না। মরিয়া হয়ে বাধা দেয়।

'কোকোকে নিয়ে মাস্টারজির কি প্রবলেম হচ্ছিল যে, ওর গলায় কন্ট্রোল ব্যান্ড পরিয়ে দিয়েছে?' মাম সুলতানকে জিগ্যেস করলেন।

সায় দিয়ে মাথা নাড়ল সুলতান : 'হ্যাঁ—প্রবলেম হচ্ছিল।' কোকোর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল ও। নরম গলায় বলল, 'কোকো ''ফাইট ক্লাব''-এ আর লড়তে চাইছিল না। ও আমাকে আড়ালে বলত ওর মনের কথা। বলত, ''আমি আর লড়ব না। কাউকে আর মারব না। কষ্ট দেব না।'' এইসব কথা বলত সবসময়...।

'একদিন ও বেঁকে বসল। বলল, কিছুতেই ও আর লড়বে না। মারপিট করতে ওর আর ভালো লাগে না। মাস্টারজির সামনে রুখে দাঁড়াল। সেদিন থেকেই মাস্টারজি ছেলেটার ওপরে টরচার শুরু করল। মারধোর...সিগারেটের ছ্যাঁকা...কী না সয়েছে এই ভোলাভালা ছেলেটা...।' কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল সুলতান। কোকোর কাছে এগিয়ে গেল। ওর মাথায় হাত রাখল : 'মাস্টারজির চামচেগিরি করে আমিও ওকে কম টরচার করেছি! কিন্তু আশ্রমে একদিন দেখি ছেলেটা আমার ঘরে ঢুকে আমার মায়ের ফটো বুকে জড়িয়ে কাঁদছে। আমার আম্মি বহুদিন আগেই মারা গেছে। কোকো সেটা জানত।

তো আমি তাজ্জব হয়ে ওকে জিগ্যেস করলাম, ''কী রে, কী ব্যাপার? আমার মায়ের ফটো নিয়ে কাঁদছিস কেন?''

'ছেলেটা...এই হ্যান্ডিক্যাপ পাগলটা...আমাকে কী বলল জানেন, স্যার? বলল, ''সুলতানদা, আমার মা নেই। মায়ের কোনও ফটোও নেই। তাই তোমার মায়ের ফটোটা নিয়েছি...।''

'সেইদিন থেকে...সেইদিন থেকে, স্যার...আমি ওকে আমার ''ভাই'' ডেকেছি।' সুলতান চোখে কিছু একটা পড়েছে এমন ভান করে চোখ মুছল। একটু বসা গলায় বলল, 'জানেন স্যার, অনেকবার ভেবেছি মাস্টারজির দল ছেড়ে দেব। কোকোকে নিয়ে কোথাও চলে যাব—কিন্তু পারিনি। পাপী পেট কা সওয়াল। ক'টা টাকার লোভে মাস্টারজির দলে পড়ে থেকেছি। মাস্টারজির আর-পাঁচটা পোষা গুন্ডার মধ্যে আমিও একটা হয়ে গেছি। কোকোকে সেভ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ওর ব্যাপারে মাস্টারজি আমাকে সন্দেহ করত। তাই কোকো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর পর মাস্টারজি আমার সঙ্গে-সঙ্গে আরও চারজনকে কোকোর খোঁজে লড়িয়ে দিয়েছে।'

মাম জিগ্যেস করলেন, 'কোকো নদীতে ঝাঁপ দিল কেমন করে?'

সুলতান ফিরে এসে ওর চেয়ারে বসল। একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, 'কয়েকজনের টিম নিয়ে মাস্টারজি বর্ধমানের একটা ফাইট কমপিটিশানে যাচ্ছিল। যারা গান-টান গায় তারা যেমন ফাংশান-টাংশান করতে যায় সেরকম মাস্টারজিও ''ফাইট বয়''-দের নিয়ে মাঝে-মাঝে গ্রামে-গঞ্জে যেত। বড়-বড় টাকার বাজি হত সেখানে। কোকো যেতে চায়নি, কিন্তু ওকে জোর করে গাড়িতে তুলেছিল মাস্টারজি। গাড়িতে আমিও ছিলাম। শিবাইচণ্ডীর কাছে—একটা নদীর ব্রিজ সবে পেরিয়েছি—আমাদের গাড়ির টায়ার পাংচার হল। তো আমরা কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে পায়চারি করছিলাম। আগের দিন রাতে মাস্টারজি আর ওর পোষা গুন্ডাগুলো কোকোকে কয়েকঘণ্টা ধরে টরচার করেছিল। কারণ সেই একই—ও আর লড়তে চাইছিল না। এমনি-এমনি কাউকে ও আর মারতে চাইছিল না।

'তো আমরা কয়েকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। মাস্টারজি গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে টায়ার পালটানো দেখছিল। তখন কোকো হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দেয়। সেটা খেয়াল করতেই আমরা চেঁচিয়ে উঠি। মাস্টারজি ছুটে

আসে নদীর পাড়ে। তারপর দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে রিমোটটা নিয়ে আসে। পাগলের মতো এ-বোতাম সে-বোতাম টিপতে থাকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কোকো ততক্ষণে নজরের বাইরে চলে গেছে।

‘ওকে হারিয়ে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিকই। দুশ্চিন্তাও হয়েছিল। কোথায় না কোথায় গিয়ে পড়বে হ্যান্ডিক্যাপ ছেলেটা! দু-বেলা কীভাবে ওর খাবার জুটবে! আবার খুশিও হয়েছিলাম, স্যার। যে মাস্টারজির হাত থেকে খোকাটা আজাদ হতে পেরেছে...।’

সুলতান উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলল, ‘এখানে দেখছি কোকো খুব ভালো আছে। আপনারা ওকে ঘরের একজন করে নিয়েছেন...।’ কোকোর কাছে এগিয়ে গেল সুলতান। ওর গালে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, ‘কোকো, তুই এখানে থেকে যা। এখান থেকে আর কোথাও যাস না। এটা জন্নত।’

কোকো হেসে বলল, ‘রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।’

মাম উঠে দাঁড়ালেন। কোকোর মাথাটা মাতৃস্নেহে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ‘তোকে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারব না। তুই এত ভালো। এ-গ্রামের সবাই তোকে ভালোবাসে...।’

কথায়-কথায় রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সুলতান হাতঘড়ি দেখে বলল, ‘স্যার, সব তো আপনাদের খুলে বললাম—এবারে বলুন আপনারা কী করবেন...। আমি কি চলে যাব—না আপনারা আমাকে পুলিশে দেবেন?’

মাম আর বাপি মুখচাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

সুলতান আক্ষেপের গলায় বলল, ‘লাইফে অনেক পাপ করেছি। কিন্তু এই অনাথ ছেলেটার হেনস্থা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। মাস্টারজি আমাকে পেলে হয়তো মার্ডারই করে ফেলবে। সে করুক। কিন্তু কোকোর...।’

রাহুল আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘না, সুলতানদা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। মাস্টারজি এলে আমরা মাস্টারজিকে বোঝাব...বলো না, বাপি—।’ বলে বাপির দিকে তাকাল রাহুল।

বাপি বললেন, ‘হ্যাঁ—রাহুল ঠিকই বলেছে। মাস্টারজিকে আমরা বোঝাব...বলব যে...’, স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন : ‘বলব যে, কোকো আমাদের সঙ্গে থাকুক। দরকার হয় মাস্টারজিকে আমি টাকা অফার করব...।’

মাম মাথা নেড়ে বাপির কথায় সায় দিলেন। বললেন, ‘মাস্টারজি আসা অবধি সুলতানভাইয়ের থাকা দরকার।’ সুলতানের দিকে তাকিয়ে মাম বললেন, ‘আপনি আজকের রাতটা আমাদের কাছে থেকে যান—।’

সুলতান হেসে বলল, ‘থ্যাংকস—।’

রাহুল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কোকো যন্ত্রণায় ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ওর গলার ব্যান্ডের লাল আর সবুজ বাতি দপদপ করে জ্বলতে শুরু করেছে।

বাপি আর মাম ওকে জাপটে ধরলেন। সামলাতে চেষ্টা করলেন। রাহুল অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

সুলতান চাপা গলায় বলল, ‘মাস্টারজি মনে হয় আরও কাছে এসে গেছে।’

সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানের মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

।।আট।।

গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন রাহুলকে জাগিয়ে দিল। তখন সবে রাতের আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। আকাশে চাপ-চাপ মেঘ থাকায় জায়গায়-জায়গায় গাঢ় ছাই রং জমাট বেঁধে ছিল। তা ছাড়া বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছিল রাহুল। পাশের বাড়ির টিনের চালে আর গাছের পাতায় একই বৃষ্টি দুরকমের আওয়াজ তুলছিল। ব্যাপারটা অনেকটা যুগল-বন্দির মতো শোনাচ্ছিল।

কাল রাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে রাহুলরা যখন বিছানায় শুয়েছে তখন রাত অনেক গড়িয়ে গেছে। তারপর অন্ধকার ঘরে টেনশানে জেগে ছিল তিনটি মানুষ : রাহুল, সুলতান, আর কোকো। কিছুতেই ওরা দু-চোখের পাতা এক করতে পারছিল না।

পাশের ঘরে বাপি আর মামেরও একই অবস্থা। কোকোকে নিয়ে টানাপোড়েনের যন্ত্রণা ওঁদের দু-জনকেই কষ্ট দিচ্ছিল। কোকোকে হারানোর আতঙ্কে মাম ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

রাহুল এখন শুধু ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনেনি, হেডলাইটের আলোও দেখতে পেয়েছিল। কারণ, খোলা জানলার পরদা ভেদ করে আলোর ছটা ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতরে। তারপর গাড়ির চলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলোর জ্যামিতিটা দেওয়ালে ধীরে-ধীরে সরে গিয়ে রাহুলের বুককেসের ওপরে থেমেছে। এবং পরক্ষণেই নিভে গেছে।

রাহুলের বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করে উঠল। আবছা আলোয় ও তাকাল মেঝেতে শুয়ে থাকা সুলতান আর কোকোর দিকে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থেকে-থেকে ওরা এখন ঘুমোচ্ছে। বোধহয় ক্লান্তিতে আর জেগে থাকতে পারেনি। শেষরাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ইঞ্জিনের শব্দটা বাড়ির কাছ ঘেঁষে এসে থামল।

রাহুল বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। বেশ টের পেল ওর হাত-পা কাঁপছে।

ও সুলতানের কাছে গেল। ঝুঁকে পড়ে জোরে ঠেলা মরাল ওকে : ‘সুলতানদা! সুলতানদা! ওঠো—ওঠো!’

সুলতান ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল। অন্ধকারে রাহুলকে ঠাহর করতে চেষ্টা করল।

‘শ-শ-শ-শ’ শব্দ করে সুলতানকে চুপ করে থাকতে ইশারা করল রাহুল। তারপর ফিসফিস করে বলল, ‘জানলা দিয়ে দ্যাখো তো। একটা গাড়ির আওয়াজ পেলাম—।’

ঘুম কেটে গেল সুলতানের। ও চট করে উঠে দাঁড়াল। খুব সাবধানে জানলার কাছে গেল। দু-চোখে হাত ঘষে পরদা সরিয়ে উঁকি মারল।

রাহুলদের বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কোয়ালিস গাড়ি। হালকা আলোয় গাড়ির রংটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সাদা, কি ছাই, অথবা রুপোলি রঙের হতে পারে।

বুকটা ধক করে উঠল সুলতানের। মাস্টারজির রুপোলি রঙের একটা কোয়ালিস গাড়ি আছে!

রাহুল সুলতানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখল, গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল চারজন লোক। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই ওরা ব্যস্ত-ভাবে রাহুলদের গ্রিলের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চার-জনের মধ্যে একজনের হাঁটার ভঙ্গিটা কেমন যেন চেনা মনে হল রাহুলের।

আর দেরি করল না রাহুল। ছুটে চলে গেল ঘরের দরজার কাছে। এক্ষুনি বাপি আর মামের ঘরে গিয়ে ডাকা দরকার।

দরজা খুলতেই বাপি আর মামকে দেখতে পেল ও। লোহার গেটের শব্দে ওঁরা জেগে উঠেছেন। জানলা দিয়ে লোকগুলোকে দেখেওছেন।

চাপা গলায় দ্রুত পরামর্শ করল সবাই। মাম বাপিকে বললেন, ‘কী হবে এখন? থানায় ফোন করবে?’

বাপি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল।

দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে বাপি চোয়াল শক্ত করে বললেন, ‘আর কিছু করার নেই। মোকাবিলা করতে হবে।’

কথাগুলো বলেই বাপি সুইচবোর্ডের কাছে গেলেন। আলোর সব ক’টা সুইচ জ্বেলে দিলেন। রাহুলকে বললেন, ‘বাড়ির সব আলো এক্ষুনি জ্বেলে দে। আর কোকো কোথায়?’

‘ঘুমোচ্ছে।’

‘ওকে শিগগির ডেকে তোল—।’

রাহুল ব্যস্তভাবে ছুট লাগাল। ওর সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানও ছুটল।

এর মধ্যেই কলিংবেল আরও তিনবার বেজে উঠেছে। বেল বাজানোর ঢঙেই বোঝা গেল যারা এসেছে তারা বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

এবার বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়ল—পরপর তিনবার।

তার একটু পরেই রাহুলের নাম ধরে কে ডেকে উঠল : ‘রাহুল! রাহুল!’

রাহুল চমকে উঠল। চেনা গলা। কিন্তু কে যেন?

এর মধ্যেই ও কোকোকে ধাক্কা দিয়ে ডেকে ঘুম থেকে তুলেছে।

সব আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়িটা আলোয় আলোময়। বন্ধ দরজা থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। যেন কোনও একটা মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আবার ধাক্কা। আবার ‘রাহুল। রাহুল।’

কোকো ভয় পেয়ে রাহুলের হাত জড়িয়ে ধরল।

বাপি কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। বললেন, ‘খুলে দিই। নইলে ওরা দরজা ভেঙে ফেলবে।’

দরজা খুলতেই ওপিঠ থেকে জোরালো ধাক্কা মারল কেউ। একটা পাল্লা দেওয়ালে বাড়ি খেল। আর বাপি ছিটকে গেল একপাশে। একঝলক জোলো বাতাস ছুটে এল ভেতরে।

বাপিকে তাচ্ছিল্যের ধাক্কায় সরিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল চারজন।

চারজনের শরীরই জলে ভেজা। তার মধ্যে শুধু প্রথমজনকে চিনতে পারল রাহুল। মাকু। ভিজে চুল কপালে নেমে এসেছে। মুখে-চোখে বৃষ্টির জল পড়লেও ঘুমের ছাপ এখনও মুছে যায়নি। ওর চোয়াল নড়ছে। কী যেন চিবোচ্ছে।

দ্বিতীয় লোকটা টাকমাথা। বেঁটে। দাড়ি-গোঁফ কামানো। ময়লা রোগাটে চেহারা। কুতকুতে চোখ। কালো প্যান্টের ওপরে একটা ঢোলা খয়েরি শার্ট। শার্টটা জলে ভিজে গাঢ় রঙের দেখাচ্ছে। হাতে সোনালি ব্যান্ডের একটা ঘড়ি।

লোকটার সামনের ওপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু। ফলে একটা খরগোশ-খরগোশ ভাব এসেছে। হঠাৎ করে দেখলে মজার কমেডিয়ান বলে মনে হয়।

কিন্তু আসলে যে তা নয় সেটা ওর হাতের গাঢ় নীল পিস্তলটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

মাকু দ্বিতীয় লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মাস্টারজি—ওই যে রাহুল।’ একইসঙ্গে রাহুলের দিকে চোখের ইশারা করল ও।

মাস্টারজি কাশল দুবার। বাঁ-হাত দিয়ে বৃষ্টি-ভেজা মুখ মুছল। তারপর রাহুলদের দিকে চোখ রেখেই খেঁকিয়ে উঠে হুকুম দিল, ‘শিকলি, দরজাটা ভালো করে এঁটে দে। যেন পাবলিক ডিসটারবেন্স না হয়...।’

হুকুমটা শোনামাত্রই সবচেয়ে পিছনে যে ছিল—শিকলি—সে দরজাটা বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি ভালো করে এঁটে দিল।

মাস্টারজি ভেতরে ঢুকে এল। সুলতানের কাছে এসে দাঁতে দাঁত চেপে নীচু গলায় একটা গালাগাল দিল। তারপর ওর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে চওড়া হেসে বলল, ‘সালা, এটা তোর চায়ের দোকান?’ পরক্ষণেই গলা মিহি করে সুলতানকে নাটুকে ঢঙে ভেংচাল : ‘কোকোকে এখনও পাইনি, মাস্টারজি—খুঁজছি।’

একটু থেমে শাসানির গলায় মাস্টারজি বলল, ‘‘করুণাময়ী’’-তে চল—তোর হিসেব নিচ্ছি।’

সুলতান কাঁচুমাচু মুখে হাতজোড় করে বলল, ‘মাস্টারজি, মাপ করে দিন। গলতি হয়ে গেছে। প্লিজ, মাস্টারজি...।’

মাস্টারজি দাঁত বের করে হাসল, বলল, ‘মাপ করে দেব—অ্যাঁ? এতবড় গুস্তাকি মাপ করে দেব?’

চোখের পলকে হাতের পিস্তলটা সাঁ করে ঘুরিয়ে সুলতানের গালে বসিয়ে দিল মাস্টারজি।

কালীপটকা ফাটার মতো শব্দ হল। সুলতানের গালে রক্তের রেখা দেখা দিল। সুলতান ‘ইয়া আল্লা’ বলে দু-হাতে মুখ চেপে মেঝেতে বসে পড়ল।

মাম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন। মাকুর চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া। আর বাপি তো পাথর!

রাহুল স্পষ্ট টের পেল কোকোর হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ও মনে-মনে চাইছিল, মামের চিৎকারটা যেন প্রতিবেশীদের কেউ শুনতে পায়, যেন তারা সাহায্যের জন্য ছুটে আসে।

কিন্তু কাকভোরে এই বৃষ্টির মধ্যে কে আসবে!

মাস্টারজি পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিল। অস্ত্রটা ঢোলা শার্টের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল।

পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই বের করল হিংস্র লোকটা। ঘাড় কাত করে সিগারেট ধরাল। 'উঁ-উঁ' করে শব্দ করল মুখে। তারপর ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইয়ের বাক্স পকেটে ভরে কয়েকবার হেঁচকি তুলে হাসল।

হঠাৎই যেন মাকুর কথা মনে পড়ে গেছে এমন ভাব করে পিছনে তাকাল মাস্টারজি। তারপর ওর কাছে এগিয়ে গেল। যেতে-যেতে পিস্তলটা আবার বের করে নিল।

সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে মাকুর পিঠ চাপড়ে দিল মাস্টারজি : 'ভাগ্যিস রেললাইনের ধারে এই ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওরা বসে-বসে তাস পিটছিল...' পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করল মাস্টারজি। ওটা মাকুর হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও, ভাই—তোমার প্রাইজ মানি। তাস খেলায় তুমি জিতছিলে—আমার সঙ্গে এসে তোমার তো লস হয়ে গেছে। তো এই নোটটা দিয়ে পুষিয়ে নিয়ো—কেমন?'

মাকু টাকাটা পকেটে ভরে কাঠ-কাঠভাবে হেসে ঘাড় কাত করল : 'থ্যাংকস—।'

শুরুতে মাস্টারজির পিস্তলটা দেখামাত্রই বাপি আর মাম ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি মাস্টারজি রাহুল কিংবা কোকোকে লক্ষ্য করে গুলি করে বসবে।

কিন্তু এতক্ষণে বোধহয় বাপি একটু সাহস জুগিয়ে উঠেছিলেন। কোনও-রকমে আমতা-আমতা করে বললেন, 'মাস্টারজি, আসুন—ঘরে এসে বসুন...।'

'হ্যাঁ, যাব...যাব।' সিগারেটে টান দিল। তারপর কোকোর দিকে তাকিয়ে : 'কী, কোকো, কেমন আছিস?'

'ভালো।' রাহুলের হাতটা পেঁচিয়ে ধরে থাকা অবস্থাতেই কর্কশ গলায় বলল কোকো। অনুভবে রাহুলের মনে হল, কোকোর কাঁপুনিটা এখনও রয়েছে।

কোকোর দিকে এগোতে শুরু করল মাস্টারজি। সুলতান তখনও মেঝেতে বসে গোঙাচ্ছিল। মাকু, শিকলি, আর নাম-না-জানা একজন শাগরেদ বন্ধ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

কোকোর গালে দুবার আদরের আলতো চাপড় মেরে মাস্টারজি বলল, 'কোকো, মাই ডার্লিং। অ্যাদ্দিন পালিয়ে থেকে তোর কত লস হয়ে গেল বল তো! আমারও তো বহুত টাকা লোকসান হয়ে গেল। এখন চল, ওই লস পুষিয়ে দিবি...।'

বাপি মাস্টারজির কাছে এসে অনুনয় করে বললেন, 'আপনি প্লিজ ঘরে এসে বসুন। কোকোর ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলছি...।'

কৌতুকের চোখে বাপির দিকে তাকাল : 'কোকোর ব্যাপার খুলে বলবেন? আমাকে?' শব্দ করে হাসিতে ফেটে পড়ল মাস্টারজি। সিগারেটে ঘন-ঘন টান মারল। সিগারেটের আগুনটা সেই টানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

'না, না, আমাকে কিছু খুলে বলতে হবে না। আমি শুধু কোকোকে নিয়ে যেতে এসেছি। ও আমার।'

মাস্টারজির কথার শেষে 'ও আমার' শব্দ দুটো মাম আর বাপিকে ভীষণ ধাক্কা দিল। রাহুলকেও। একইসঙ্গে ওর হাতের ওপরে কোকোর হাতের চাপ যে বেড়ে উঠল সেটাও রাহুল টের পেল।

মাম প্রায় কান্না-কান্না গলায় মাস্টারজিকে বললেন, 'ঘরে একটু বসুন। কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। কোকোর...।'

হাতের ইশারায় মামকে থামিয়ে দিল মাস্টারজি। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নিয়ে বলল, 'বুঝেছি কী বলবেন। চলুন, ঘরে বসছি। কিন্তু আমার তাড়া আছে। বেশিক্ষণ টাইম দিতে পারব না।'

বসবার ঘরে এসে বসল মাস্টারজি। বাপি সিলিং পাখাটা অন করে মাস্টারজির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন। মাম বাপির পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাহুল আর কোকো হাত-ধরাধরি করে ঘরে ঢুকল। দরজার কাছটিতে দাঁড়িয়ে রইল।

খোলা দরজার দিকে একবার তাকাল মাস্টারজি। শিকলি, মাকু, সুলতান—ওদের দেখা যাচ্ছে। সুলতান এখনও বসে আছে, তবে গালে একটা রুমাল চেপে ধরেছে।

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা ঘরের এককোণে ছুড়ে দিল মাস্টারজি। কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'জলদি বলুন—কী বলবেন।'

'কোকো আমাদের কাছে এই তিনমাস হল...' বাপি শুরু করলেন, 'ওকে আমরা...মানে...।'

'থাক, আর বলতে হবে না। বুঝেছি।' জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মাস্টারজি। একগোছা পাঁচশো টাকার নোট মুঠো করে বের করে নিয়ে এল।

টাকাগুলো দেখেই বাপির মুখ লাল হয়ে উঠল। মাম ঘেন্নায় বলে উঠলেন, 'ছিঃ! ছিঃ!' তারপর আর সামলাতে পারলেন না—কেঁদে ফেললেন।

বাপি এবার চোয়াল শক্ত করলেন। সুলতানের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো এবার বোধহয় মাস্টারজিকে বলা দরকার। মাস্টারজির কাছে যতই পিস্তল থাকে, 'করুণাময়ী'র ওই নরকে কোকো কিছুতেই ফিরে যাবে না।

'আপনি কোকোকে নিয়ে গিয়ে কী করবেন আমরা জানি...' এইটুকু বলার পরই সুলতানের দিকে চোখ পড়ল বাপির। সুলতান তখন বাপিকে কিছু না বলার জন্য কাতরভাবে ইশারা করছে।

মাস্টারজি মামের দিকে দেখছিল, তাই সুলতানের সূক্ষ্ম ইশারা খেয়াল করেনি। বিরক্তভাবে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে : 'এখন এসব সেন্টিমেন্টাল নাটক দেখার টাইম নেই।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর কোকোর দিকে : 'অ্যাই! চল। ফালতু দেরি হচ্ছে—।'

'না, কোকো যাবে না।' রাহুলের মুখ দিয়ে কথাগুলো ফস করে বেরিয়ে এল।

মাস্টারজি অবাক হয়ে রাহুলের দিকে তাকাল। সাপের মতো ঠান্ডা চোখে ওকে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'কোকো তোমার কে হয়, খোকা? বন্ধু? ওর সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছে? লাভ স্টোরি?' বলেই হো হো করে হেসে উঠল মাস্টারজি।

সেই হাসি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই কোকো কর্কশ গলায় বলে উঠেছে, 'আমি যাব না। রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না—।'

কোকোর কথায় মাস্টারজি হতবাক হয়ে গেল। চোখ গোল-গোল করে কোকোর দিকে তাকিয়ে রইল—যেন ভূত দেখছে।

'জানোয়ারটা দেখি কথা বলতে শিখে গেছে!' চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলো বলল মাস্টারজি। নোটের গোছা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর পায়ে-পায়ে কোকো আর রাহুলের দিকে এগোল।

খোলা জানলা দিয়ে সকালের আলো দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক জোরে পড়ছে। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে হাওয়ার ঝাপটা। কোথাও একটা খোলা জানলার পাল্লা দেওয়ালে মাথা কুটছিল। বৃষ্টির জলের রেণু বাতাসের তোড়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছিল।

রাহুলের কাছে এসে ওর মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে এল। রাহুল সিগারেটের কড়া গন্ধ পেল। সেইসঙ্গে মদের হালকা অপবাস।

ও মুখ সরিয়ে নিতে গেল। তখন মাস্টারজি হিংস্র চাপা গলায় বলল, 'কোকো আমার। ও আমার সঙ্গে যাবে। তুই ''না'' বলার কে রে?'

রাহুল একটুও দমল না। জেদি বাচ্চার মতো আবার বলল, 'না, কোকো যাবে না!'

মাস্টারজি মাথা পিছিয়ে নিল। ভয়ংকর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল রাহুলের গালে।

সাইকেলের টায়ার ফাটার মতো শব্দ হল। রাহুল কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

মাম চিৎকার করে উঠলেন। সেইসঙ্গে বাপিও।

আর কোকোর হাত বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল। পলকে মাস্টারজির টুঁটি চেপে ধরল। মাস্টারজি জলে তলিয়ে যাওয়া মানুষের মতো দু-হাত শূন্যে ছুড়ে খাবি খেতে লাগল।

'রাহুলকে মারবে না!' কোকো পশুর মতো গর্জন করে উঠল।

'শিকলি! শিকলি!' মাস্টারজি চেঁচিয়ে উঠতে চাইল : 'রানা! রানা! জানোয়ারটাকে ধর!'

ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ বেরোল মাস্টারজির গলা থেকে। শিকলি আর তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা শাগরেদ ছুটে এল মাস্টারজির দিকে। শিকলির হাতে একটা লিকলিকে ফলার ছুরি ঝিকিয়ে উঠল।

বাপি আর মাম ততক্ষণে রাহুলকে ধরে মেঝে থেকে তুলেছেন। রাহুলের ফরসা গালে পাঁচ আঙুলের লালচে দাগ বসে গেছে।

শিকলি কোকোকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছিল বুলেটের মতো। আর কোকো মাস্টারজির টুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ও চকিতে একটা পা ভাঁজ করে শূন্যে তুলল—ঠিক একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারসের মতো। এবং পরমুহূর্তে সেই পা-টা ছুটে আসা শিকলিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

শিকলির শরীরটা আবার বুলেটের গতিতেই ছিটকে গেল পিছনদিকে। দেওয়ালে গিয়ে সপাটে বাড়ি খেল। তারপর খসে পড়ল মেঝেতে। ছুরিটা ওর হাত থেকে কোথায় যেন ঠিকরে পড়ল।

রাহুল ওর স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। মাম তখন হাউহাউ করে কাঁদছেন আর কোকোর নাম ধরে ডাকছেন।

রানা নামের পাবলিক বোধহয় নিজেকে একটু বেশি বুদ্ধিমান ভেবেছিল। কারণ, ও কোকোর দিকে ছুটে আসতে-আসতে আচমকা মেঝেতে শুয়ে পড়ল। ফলে ওর দেহটা মসৃণ মেঝেতে পড়ে কোকোর পা লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে পিছলে এল।

সংঘর্ষটা যদি ঠিকঠাক হত তা হলে কোকো নির্ঘাত উলটে পড়ত।

কিন্তু কোকোর তৎপরতায় সেটা ঠিকঠাক হল না।

ও মাস্টারজিকে এক ধাক্কা দিয়ে পিছনে ফেলে দিল। এবং বেড়ালের ক্ষিপ্রতায় শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

যখন কোকো নীচে পড়ল তখন ওর পায়ের নীচে রানা। ঢেঁকির পাড় দেওয়ার মতো কোকোর পা রানার শরীরে বারবার আছড়ে পড়ল। তারপর ওকে চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় কোকো দাঁড় করিয়ে দিল। নিজের মাথা ঠুকে দিল ওর মাথায়।

পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি হল যেন। একটা 'আঁক' শব্দ করে রানা গোড়াকাটা কলাগাছের মতো পড়ে গেল। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেল।

রাহুলরা অবাক হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখছিল। মাস্টারজি, রানা আর শিকলি—তিনজন তিনদিকে পড়ে আছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোকো লড়াকু সিংহের মতো ফোঁস-ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। এক অদ্ভুত ভালোবাসার চোখে ও রাহুলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওদিকে সুলতান এখনও মেঝেতে উবু হয়ে বসে আছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ও যে কী করবে সেটা ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না।

মাকু নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবলেশহীন মুখ। চোয়াল নড়ছে। চুয়িংগাম বা কিছু একটা চিবোচ্ছে। রাহুল আর কোকোর সর্বনাশ দেখার জন্য ও যেন অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারে।

কোকো রাহুলের দিকে এক পা এগিয়ে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে জিগ্যেস করল : 'রাহুল, তোমার লাগেনি তো? তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

কথা শেষ হতে না হতেই কোকো যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠল। পাগলের মতো ছটফট করতে লাগল। ওর গলার কন্ট্রোল ব্যান্ডে লাল আর সবুজ আলো দপদপ করে জ্বলতে লাগল।

রাহুল দেখল, মাস্টারজি কখন যেন উঠে বসেছে। বাঁ-হাতে একটা চেয়ার ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সোনালি ব্যান্ডের হাতঘড়িটা ছিটকে পড়ে আছে দূরে।

কিন্তু রাহুলের নজর কাড়ল মাস্টারজির ডানহাতে ধরা জিনিসটা। একটা কালো রঙের রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট। কোকোর দিকে তাক করে মাস্টারজি বোতাম টিপে ধরেছে। আর তাতেই কোকোর শরীরে বৈদ্যুতিক মরণযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে।

কোকো ছটফট করতে-করতে মেঝেতে পড়ে গেল। ওর শরীরটা এমনভাবে ঝটকা দিয়ে বেঁকেচুরে যাচ্ছিল যেন কেউ ওকে হাই ভোল্টেজ শক দিচ্ছে। একইসঙ্গে ও যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল। মনে হচ্ছিল, ও বোধহয় এখনই মরে যাবে।

বাপি আর রাহুল কোকোর নাম ধরে বারবার ডাকছিল। মাম কোকোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইছিলেন। আর কোকোর শরীরটা ঘন-ঘন ঝটকা মেরে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল।

মাস্টারজি তখন হিংস্রভাবে হাসছে। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসেছে কোকোর কাছে। রিমোটটা স্থির লক্ষ্যে কোকোর দিকে তাক করা।

রিমোটটা বাঁ-হাতে নিল মাস্টারজি। তারপর ডানহাত শার্টের নীচে ঢুকিয়ে পিস্তলটা বের করে নিল। কোকোর মাথার দিকে পিস্তলের নলটা তাক করে চাপা গর্জন করে উঠল : 'সালা, পাগলা কুত্তা! তোকে আর রেখে লাভ নেই। বড্ড বাড় বেড়েছিস। এবার খতম!'

মাস্টারজি হয়তো ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।

বাইরে কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল। একইসঙ্গে মাম হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাপি আর রাহুল 'না! না!' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর আহত সুলতান ছুটে এসে মাস্টারজির পা জড়িয়ে ধরল। কুকুরের মতো কাতর 'কেঁউকেঁউ' শব্দে কোকোর প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগল।

মাকু পায়ে-পায়ে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এসেছিল। ও অবাক হয়ে দেখছিল, একটা সহজ-সরল প্রতিবন্ধী ছেলেকে বাঁচানোর জন্য চার-চারটে মানুষ কেমন আকুলি-বিকুলি করছে। তার মধ্যে একটা আবার মুসলমান!

অথচ এই চারজন কোকোর কেউ নয়!

মাকু এই সমীকরণটা বুঝতে পারছিল না। রক্তের সম্পর্কের বাইরের সম্পর্কটা ওকে অবাক করে দিয়েছিল। ওর মনের ভেতরে অন্যরকম একটা ঝড় উঠেছিল।

একটা টাকমাথা বেঁটে শয়তান আমাদের গ্রাম থেকে একজনকে এভাবে তুলে নিয়ে যাবে! নয়তো লাশ ফেলে দেবে বলছে! আর আমি চুড়ি পরে বসে থাকব! এটা না আমার গ্রাম! আমাদের গ্রাম!

এই কথাগুলো মনে-মনে ভাবল মাকু। একইসঙ্গে ওর মনে হল, এতক্ষণ ধরে ও ভেবেছে অনেক কিন্তু কিছু করেনি—এবার কিছু করা দরকার।

মাকু যে-দৌড়টা শুরু করল সেটা বোধহয় ওর বাইককে হারানোর মতন। শূন্য গতিবেগ থেকে এক অদ্ভুত ত্বরণ তৈরি করল ও। এবং যখন ওর শরীরটা মাস্টারজির শরীরে গিয়ে ধাক্কা খেল তখন মাস্টারজির মনে হল একটা প্রকাণ্ড উল্কার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়েছে।

মাস্টারজির শরীরটা দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা বুককেসে গিয়ে ধাক্কা খেল। ঝনঝন শব্দে বুককেসের কাচ ভেঙে পড়ল। মাস্টারজির হাতের পিস্তল আর রিমোট দু-দিকে ছিটকে পড়ল। আর মাকু হাত-পা মুড়ে কাত হয়ে পড়ে গেল চেয়ার-টেবিলের ওপরে।

মাস্টারজির জীবনীশক্তির তারিফ করতে হয়। কারণ, ভাঙা কাচের ওপরে সে স্থির হয়ে পড়ে রইল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরই দু-দিকে নজর চেলে দেখে নিল পিস্তল আর রিমোটটাকে। চট করে যে কোনও একটাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু কোনটা?

পিস্তলটাই বেছে নিল মাস্টারজি। এবং সেখানেই ভুল হয়ে গেল।

'ফাইটার' বয় কোকো এই কয়েক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মাস্টারজি যখন পিস্তল আর রিমোটের দিকে নজর চালিয়েছে তখনই ও মেঝেতে পড়ে থাকা রানাকে মাথার ওপরে তুলে নিয়েছে। মাস্টারজির হাত পিস্তলের দিকে এগোনোমাত্রই ও রানার দেহটা মাস্টারজিকে লক্ষ্য করে স্রেফ ছুড়ে দিয়েছে।

সংঘর্ষের শব্দ হল। আর কোকো একইসঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে মাস্টারজির ওপরে। রানার শরীরের নীচ থেকে মাস্টারজিকে টেনে বের করেছে। জামার কলার ধরে তার মুখটা তুলে এনেছে নিজের মুখের কাছে।

হাপরের মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে কোকো বলল, 'রাহুলকে ছেড়ে আমি যাব না।' তারপর একটা ভয়ংকর হেডবাট। নিজের মাথাটা মাস্টারজির মাথায় ও সাংঘাতিক জোরে ঠুকে দিয়েছে।

'রাহুলকে ছেড়ে...আমি কোথাও যাব না।' আবার বলল কোকো।

আবার হেডবাট।

'রাহুলকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কিছুতেই না।'

আবার মাথায়-মাথায় সংঘর্ষ।

কোকো যেন সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। বারবার ও একই কথা বলছে আর ওর মাথাটা ঠুকছে মাস্টারজির টাকমাথায়। মাস্টারজির কপাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

'কোকো! কোকো, থামো!' চেঁচিয়ে উঠল রাহুল। ছুটে গেল ওর কাছে। ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

বাপি, মাম আর সুলতানও ওকে থামাতে চেষ্টা করল।

কোকো মাস্টারজির শরীরটা ছেড়ে দিতেই সেটা জাপানি পাখার মতো ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

মাকু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ওদের কাছে এসে বলল, 'আমি থানায় খবর দিচ্ছি—।'

বাপি ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—।'

ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থমকে গেল মাকু। মেঝেতে পড়ে থাকা শিকলি, রানা আর মাস্টারজির দিকে দেখল। বলল, 'আমরা দুজনেই যাব? এখানে যদি কিছু হয়?'

হাসলেন বাপি। কোকোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। কোকো আছে।'

ওরা দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল।

সরি, রং নাম্বার





।।এক।।

মিমোর শর্টস-এর পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল। চিনিং করতে-করতে থেমে গেল মিমো। মাথার ওপরের রডটা ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। জিমের ফ্লোরে ভালকানাইজড রাবারের ফ্লোর ম্যাট, তার ওপরে সবুজ রঙের জুট কার্পেট। তাই কোনও শব্দ হল না।

নিশ্চয়ই মা ফোন করেছে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করতে-করতে ভাবল মিমো। কারণ, ওর মা একটুতেই উতলা হয়। সবসময় টেনশানে ভোগে। তাই ইনকামিং কলের নম্বরের দিকে না তাকিয়েই ফোনটা কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলল। এবং তখনই বুঝল, মা ফোন করেনি। তার বদলে অন্য একটা মেয়ের গলা।

আজ জিমে মেম্বাররা বেশি আসেনি। অবশ্য শীতকালে এমনিতেই লোক কম হয়। এখন 'শীতকাল' চলে গেলেও শীতটা যেন পুরোপুরি যায়নি। ভোরের দিকে বেশ ঠান্ডা থাকে। তাই সাতসকালে জিমে এসে ব্যায়াম করার উৎসাহ বেশির ভাগেরই নেই। কিন্তু মিমোর ওসব ব্যাপার নেই। জিমে ভোরবেলা এসে শরীরটাকে তনদুরস্ত করা ওর নেশা। প্রায় বছরখানেক হল ও নিয়মিত এই জিমে আসছে।

জিমের নাম শক্তি সংঘ জিমনাশিয়াম। ব্যায়ামের এই ক্লাবটার তদারকি অনেকে মিলে করলেও আসল লোক হল বিশ্বজিৎদা—বিশ্বজিৎ সাহা। যেমন সাহেবদের মতো টকটকে ফরসা গায়ের রং তেমনই আর্নল্ড সোয়ার্ৎজেনেগারের মতো বডি। জিমে প্রথমদিন ভরতি হতে এসে বিশ্বজিৎদাকে দেখেই ভরসা পেয়েছিল মিমো। ওর মনে হয়েছিল, এই জিমটায় ঢুকলে ওর বডির সত্যি কিছু হবে।

আজ হালকা ওয়ার্ম-আপের পর মিমো চিনিং করছিল। স্লিভলেস গায়ে হলদে রঙের ওর বামচাম গেঞ্জি আর পায়ে কালো শর্টস। দু-হাতে কালো চামড়ার হাফ-দস্তানা। কবজিতে কালো রিস্টব্যান্ড।

মাথার ওপরের রডটাকে আঁকড়ে ধরে ও নিজের শরীরটাকে ধীরে-ধীরে টেনে ওপরে তুলছিল। আবার একইভাবে শরীরটা নামিয়ে ঝুলে পড়ছিল।

এই ব্যায়ামটায় অসম্ভব শক্তি খরচ হয়। কয়েকবার শরীরটা ওঠানামা করালেই হাঁপ ধরে যায়। কিন্তু মিমো মনে-মনে জেদ ধরে ছিল। আজ ও চিনিংটা সাতবার করবেই।

জিমের ঘরটা প্রায় বিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট। ঘরের সব দেওয়ালে সুন্দর করে আয়না বসানো। যেন হঠাৎ করে মনে হয় আয়নামহল। সেই সব আয়নার ফাঁকে-ফাঁকে কাচের শার্সি দেওয়া স্টিল উইন্ডো। সব আয়নাগুলোই জানলার মাথা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। তার ওপরে দেওয়ালে পৃথিবীর বিখ্যাত সব ব্যায়ামবীরের রঙিন ছবি সার দিয়ে টাঙানো। তারই মাঝে এক জায়গায় লাগানো একটা বড় মাপের ইলেকট্রনিক দেওয়াল-ঘড়ি।

জিমের ঘরে ডিভিডি প্লেয়ারে হিমেশ রেশমিয়ার গান বাজছিল। ব্যায়াম করার সময় সবসময়েই কোনও গান কিংবা মিউজিক বাজানো হয়। এতে নাকি ব্যায়ামের রিদম ঠিক থাকে। বিশ্বজিৎদা বলেছেন।

মিমো ফোনে 'হ্যালো' বলতেই প্রথমে একটু কড়কড় শব্দ ভেসে এল। তারপরই শোনা গেল একটি মেয়ের উদভ্রান্ত স্বর : 'কে, বাপি? আমি পিয়া বলছি—।'

'বাপি?' অবাক হয়ে মিমো বলল, 'সরি, রং নাম্বার...।'

কথাটা বলেই ও লাইন কেটে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটা বিপর্যস্ত গলায় বলে উঠল, 'লাইন কাটবেন না, প্লিজ। আপনি কে বলছেন? চট করে বলুন—।'

মিমো একটু বিরক্ত হল। সাতসকালে ও মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে বেরোয় শুধুমাত্র মায়ের জন্য। কারণ, ওর কোনও বন্ধুবান্ধবই এ সময়ে ফোন-টোন করে না। আর এই উটকো মেয়েটা অসময়ে ফোন করে ওকেই জিগ্যেস করছে, 'আপনি কে বলছেন?' অদ্ভুত তো!

'আপনি ফোন করেছেন, আপনি বলুন আপনি কে বলছেন। হঠাৎ এই অড টাইমে ফোন করে আমাকে ডিসটার্ব করছেন কেন?' রুক্ষ গলায় বলে উঠল মিমো।

'প্লিজ—প্লিজ। আমার হাতে সময় নেই। আপনি একটু পুলিশে খবর দিন...প্লিজ...।'

ডিভিডি প্লেয়ারের আওয়াজের জন্য কথাগুলো শুনতে মিমোর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ফোনটাকে ও এত জোরে কানে চেপে ধরেছিল যে, কান ব্যথা করছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কথাটা শুনেই মিমো চমকে উঠল। ব্যাপারটা মনে হল সিরিয়াস। কারণ, ওর কোনও বন্ধুবান্ধব এ সময়ে ফোন করে কিছুতেই এ ধরনের ইয়ারকি করবে না।

'আপনি কোত্থেকে বলছেন? আপনার নাম কী? পুলিশে খবর দেব কেন?'

'আমি...আমাকে এখানে...।'

কানেকশানটা পট করে কেটে গেল।

মিমো বারবার 'হ্যালো-হ্যালো' করেও ও-প্রান্ত থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেল না। তখন ও বোতাম টিপে 'কলার আইডি' দেখল। অচেনা একটা ফোন-নম্বর। ল্যান্ডলাইন—নম্বরটা 2573 দিয়ে শুরু।

একটু দূরে বাবলি চিত হয়ে শুয়ে বেঞ্চ প্রেস করছিল। মিমো মোবাইলে কথা বলা শুরু করতেই ও ব্যায়ামটা থামিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই মিমোর মা ফোন করেছে। বাড়িতে হয়তো কোনও ঝামেলা হয়েছে। হয়তো সাতসকালেই পিসিদের সঙ্গে কলতলার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। প্রায়ই এরকম হয়।

কিন্তু মিমোর কথাবার্তা বাবলি যেটুকু শুনতে পেল তাতে বুঝল, কেসটা অন্যরকম। তাই ও বেঞ্চ প্রেস ছেড়ে উঠে পড়ল।

জিমে ঢোকার বড় দরজাটার পাশেই একটা ক্যাবিনেটে ডিভিডি প্লেয়ারটা রাখা আছে। তার স্পিকার দুটো দুপাশের দেওয়ালে প্রায় সিলিং-এর কাছাকাছি বসানো। সেগুলো থেকে জোরালো আওয়াজ বেরোচ্ছিল। এই আওয়াজের মধ্যে কথাবার্তা বলা বেশ অসুবিধে। তাই বাবলি চেঁচিয়ে বলল, 'এই পঞ্চাদা, গানটা একটু অফ করো তো—।'

পঞ্চাদা এই মুহূর্তে জিমের কেয়ারটেকার। জিমের বকেয়া চাঁদার তাগাদা করা, কেউ চাঁদা দিলে তাকে বিল কেটে দেওয়া, খাওয়ার জলের ব্যবস্থা করা, ডিভিডি প্লেয়ারের সিডি পালটানো কিংবা ভলিয়ুম বাড়ানো-কমানো—সবই পঞ্চাদার দায়িত্বে।

ডিভিডি প্লেয়ারের কাছেই একটা বড় টেবিল। টেবিলের একদিকে একটা শৌখিন রিভলভিং চেয়ার। বিশ্বজিৎদা এলে এই চেয়ারটাতেই বসেন। এখন সেখানে কেয়ারটেকার পঞ্চাদা বসে আছে।

জিমে ভরতি হওয়ার সময় বিশ্বজিৎ সাহাকে দেখে যেমন মনে ভরসা হয়, কেয়ারটেকার পঞ্চাদাকে দেখলে সেই ভরসা ফরসা হয়ে যেতে পারে। কারণ, পঞ্চাদা টিংটিঙে রোগা, তালগাছের মতো ঢ্যাঙা। ওর গায়ের রং কালো, চুল খোঁচা-খোঁচা, ছানাবড়া চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, আর গায়ে সবসময় ক্যাটক্যাটে রঙের জামা।

এই পঞ্চাদা যখন জিমের মেম্বারদের ওপরে খবরদারি করে তখন মিমোর ভীষণ হাসি পায়।

পঞ্চাদা চেয়ারে বডি এলিয়ে চোখ বুজে গানের তালে-তালে দোল খাচ্ছিল। বাবলির কথায় ওর ঘোর ভাঙল। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে হাত বাড়াল টেবিলে রাখা ডিভিডি প্লেয়ারের রিমোটের দিকে।

গান থেমে গেল।

মিমো অ্যাব কিং প্রো মেশিনটার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল। বাবলি ওর কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কেসটা কী? পিসিদের সঙ্গে ক্যাচাল হয়েছে?'

বাবলি উচ্চতায় মিমোর চেয়ে একটু খাটো। এই জিমে ও মিমোর তিনমাস আগে ভরতি হয়েছে। এর মধ্যেই বেশ মাসল বানিয়ে ফেলেছে। ওর ল্যাটতো দেখার মতো।

বাবলির মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। ফরসা কপালের একপাশে একটা কাটা দাগ। লেখাপড়ার চেয়ে জিম ঢের বেশি ভালোবাসে। আর সবসময়েই উৎসাহে টগবগ করছে।

মিমো বাবলির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল : 'না রে। কেসটা পিকিউলিয়ার। জানি না, কেউ মজাক করছে কি না...।'

'কে ফোন করেছে?'

'জানি না। একটা মেয়ের গলা। আননোন মেয়ে—আননোন ফোন-নাম্বার...।'

বাবলি ঠোঁটের কোণে হেসে চোখ টিপল : 'শালা আননোন মেয়ে! বস, আমার কাছে লুকোলে কাকিমার কাছে কেস বিলা করে দেব...।'

'বিশ্বাস কর। গড ক্রস। মেয়েটা বলছিল পুলিশে খবর দিতে। তাই তো অবাক লাগছে।'

কথাটা শুনে বাবলি চুপ করে গেল। চারপাশটা একবার দেখল। ওরা ছাড়া আরও তিনজন ব্যায়াম করছে। তুহিন চেন-পুলি নিয়ে ল্যাট তৈরি করছে। বিষাণ লেগ পুশ নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। আর মাঝবয়েসি পুলিনবাবু ভুঁড়ি কমানোর জন্য টুইস্টারে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে কোমরে মোচড় দিচ্ছে আর আয়নায় নিজের ভুঁড়ির উন্নতি, কিংবা অবনতি আঁচ করার চেষ্টা করছে।

না, মিমো আর বাবলির দিকে ওদের নজর নেই। তবে পঞ্চাদাটা ড্যাবডেবে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবটা এমন, যেন চোখ দিয়েই ওদের সব কথা শুনে ফেলবে।

বাবলি চাপা গলায় বলল, 'চল, বাইরে চল—দেখি ফোনটা আবার আসে কিনা।'

মিমো বাবলির কথায় সায় দিল। ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি দেওয়ালের হুক থেকে জামাকাপড় নিয়ে জিমের এক কোণে চলে গেল। নিজেদের তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে জলদি ড্রেস করে নিল। তারপর চলে এল পঞ্চাদার টেবিলের কাছে।

টেবিলে রাখা অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার খুলে 'আউট' কলামে সই করে সময় লিখল মিমো।

মিমোর পর বাবলি যখন সই করছে তখন পঞ্চাদা জিগ্যেস করল, 'কী রে, আর ব্যায়াম করবি না? কুড়ি মিনিটেই হয়ে গেল!'

বাবলি জানে, পঞ্চাদার হেভি কৌতূহল। সবসময় সকলের হাঁড়ির খবরের খোঁজ করে বেড়ায়। ও শান্ত গলায় বলল, 'না, মানে, শরীরটা খারাপ লাগছে—।'

'দুজনেরই?' পঞ্চাদা চোখ কুঁচকে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ, দুজনেরই। তোমার কোনও প্রবলেম আছে?' মিমো বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে ওর মোবাইল ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

পঞ্চাদা কী যেন একটা জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু সেদিকে মিমো আর বাবলি মন দিতে পারল না। ওরা তাড়াহুড়ো করে জিমের কাচের দরজার দিকে প্রায় ছুটে গেল। তারপর একটানে দরজা খুলে জিমের বাইরে। সেখানে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ বেশ কয়েকজোড়া নতুন-পুরোনো চটি। কারণ, জিমে খালি পায়ে ঢোকার নিয়ম, যাতে কার্পেট নোংরা না হয়।

মিমো আর বাবলি তাড়াতাড়ি যার-যার চটিতে পা গলাতে লাগল। চটি পরতে-পরতেই মোবাইল ফোনের সুইচ টিপে 'হ্যালো' বলল মিমো। সিঁড়ি নামতে শুরু করল।

আবার সেই মেয়েটির গলা।

'আমার নাম প্রিয়াংকা—প্রিয়াংকা মজুমদার। আমাকে এরা কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে। আটকে রেখেছে। শিগগির পুলিশে খবর দিন। প্লিজ! যে করে হোক...আমাকে...বাঁচান। এরা বোধহয় আমাকে মেরে ফেলবে। আপনি...।'

প্রিয়াংকা ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

মিমো বলল, 'আমি এখুনি থানায় যাচ্ছি। আপনি ভয় পাবেন না। খবরটা দিলেই পুলিশ অ্যাকশান নেবে...।'

মিমো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কড়কড় শব্দ করে টেলিফোনের লাইনটা হঠাৎ কেটে গেল।

'যাঃ, কেটে গেল।' বলে বাবলির দিকে তাকাল মিমো।

বাবলি একরাশ কৌতূহল আর উৎকণ্ঠা নিয়ে মিমোর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মিমো মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢোকাতেই ও বলল, 'কী করবি এখন? থানায় যাবি?'

'এ ছাড়া তো আর কোনও পথ নেই—।'

সিঁড়ি নামতে-নামতে ওরা দোতলা থেকে একতলায় চলে এল।

একতলায় একটা মেঠো উঠোন। উঠোনের বাঁদিকে কলতলা। সেখানে বালতি, কলসি, হাঁড়ির লাইন লেগেছে। সেগুলো ঘিরে তাদের মালিকরা দাঁড়িয়ে। আর ডানদিকে একটা বড় ঘরে ছোট-ছোট বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন স্কুল চলছে। তার লাগোয়া একটা সিমেন্ট বাঁধানো স্টেজ। সেখানে মাঝে-মাঝে জিমের অনুষ্ঠান হয়। আবার কখনও-বা কোনও ফাংশানের জন্য অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

মিমো আর বাবলি কথা বলতে-বলতে উঠোন পেরিয়ে গেল।

উঠোনের পরই একটা গ্রিলের গেট। গেট পেরোলেই বাইরে যাওয়ার পথ—সিমেন্ট বাঁধানো একটা সরু গলি—এঁকেবেঁকে চলে গেছে চওড়া রাস্তার দিকে।

মিমোকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে বাবলি ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিল। প্রিয়াংকা নিজের নাম বলেছে বটে কিন্তু কোথায় থাকে সেটা বলেনি। তা ছাড়া 'এরা' মানে কারা? প্রিয়াংকাকে ওরা কোথায়ই-বা আটকে রেখেছে? ওকে কিডন্যাপ করেছে কেন? মুক্তিপণের জন্য?

বাবলি হঠাৎ বলল, 'অ্যাই, তুই এক্ষুনি মেয়েটার নাম্বারে ফোন করে দেখ তো—।'

মিমোরও এই কথাটা মনে হচ্ছিল। একবার ফোন করে দেখলে তো হয়! মেয়েটা কেন বারবার লাইন কেটে দিচ্ছে সেটা অন্তত বোঝা যাবে।

ইনকামিং কলের লিস্ট দেখে সেই নম্বরটায় ফোন করল মিমো।

কয়েক সেকেন্ড পরেই ও-প্রান্তে রিং বাজতে শুরু করল। বাজছে তো বাজছেই। কেউ ফোন ধরছে না।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ হল না। শুধু রিং বেজেই গেল।

মিমো কপালে ভাঁজ ফেলে বাবলিকে বলল, 'কেসটা কিছু বুঝতে পারছি না। কেউ ফোন ধরছে না...।'

ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে মনে হল বাবলির। ফোন করলে ফোন ধরছে না, অথচ মাঝে-মাঝে মিমোর মোবাইলে ফোন করছে!

কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ মিমোর মোবাইলে ফোন করল কেন? ওর ফোন-নম্বর পেল কোথায়? আর কথা বলতে-বলতে হুট-হাট করে লাইনই-বা কেটে দিচ্ছে কেন?

এসব কথা আলোচনা করতে-করতে ওরা দুজনে গলি ধরে এগোচ্ছিল। বাবলি গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, 'মিমো, এক্ষুনি একটা কাগজ আর পেন জোগাড় করি চল। প্রিয়াংকা আবার যদি ফোন করে তা হলে ওর কাছ থেকে কী-কী জানতে চাইব তার একটা লিস্ট করে ফেলি। তারপর ও যা-যা জবাব দেবে

সেগুলো চটপট টুকে নেব। কারণ, বস, থানায় গিয়ে তোমাকে তো কিছু সলিড খবর দিতে হবে। তা না পারলে পুলিশ হয়তো আমাদেরই ভেতরে ভরে দেবে—।'

কথাটা মিমোর মনে ধরল। কারণ, ল্যান্ডলাইনের ওই একটা নম্বর আর প্রিয়াংকার নাম ছাড়া আর কিছুই ওরা জানে না।

ও এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকান দেখতে পেল। দোকানটার একপাশে মাদার ডেয়ারির দুধের ট্যাঙ্ক। মালিক লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসে ট্যাঙ্কের কল খুলে পাবলিককে দুধ বিক্রি করছে। দোকানের বাকি অংশে ছোট কাউন্টার—সেখানে লজেন্স-বিস্কুট বোতলে সাজানো।

মিমো পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার কয়েন বের করল। দোকানদারের কাছে গিয়ে বলল, 'একটা সাদা কাগজ আর পেন দিন তো। কুইক!'

দোকানদার অবাক চোখে মিমো আর বাবলিকে দেখল। সাত-সকালে ছেলেদুটোর এত তাড়া কীসের!

এমন সময় মিমোর মোবাইল আবার বাজতে শুরু করল।

ফোন ধরতে-ধরতেই মিমো দোকানদারকে ইশারায় তাড়া দিল।

বাবলি দুধের খদ্দেরদের শুনিয়ে মন্তব্য ছুড়ে দিল, 'জলদি করুন! এমার্জেন্সি। পুলিশ কেস—।'

'পুলিশ' শব্দটা ম্যাজিকের মতো কাজ করল। দোকানদার ভদ্রলোক লুঙ্গি সামলে চট করে উঠে দাঁড়াল। লজেন্স-বিস্কুটের বোতলের ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল কাউন্টারের ওপারে। একটু পরেই দিস্তে কাগজের একটা শিট আর একটা নীল রঙের বল পয়েন্ট পেন বাবলির হাতে তুলে দিল। বলল, 'সাড়ে চার টাকা।'

মিমো তখন ফোনে কথা বলছে। পাঁচ টাকার কয়েনটা ও দোকানদারের হাতে দিয়েই বাবলিকে লিখে নেওয়ার জন্য ইশারা করল। বাবলি পঞ্চাশ পয়সা ফেরত নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লেখার সুবিধের জন্য একটা জুতসই জায়গা খুঁজতে লাগল। এবং পেয়েও গেল। সামনেই একটা ছোট মন্দিরের চাতাল। তার একপাশ দিয়ে একটা বটগাছ ওপরে উঠে গেছে।

মিমোকে জামা ধরে টান মারল বাবলি। পা চালিয়ে চাতালের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। পেন বাগিয়ে ধরল কাগজের ওপর। মিমোর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'মেয়েটা যা-যা বলবে জোরে জোরে সেগুলো বলবি—যাতে আমি টুকে নিতে পারি...।'

মিমো তখন টেলিফোনে বলছে, 'আপনি কোথায় থাকেন? বাড়ির অ্যাড্রেসটা বলুন...।'

।।দুই।।

বেনেবউ পাখিটাকে অনেক দূর থেকে দেখতে পেল প্রিয়াংকা। ভোরের আলো এসে পড়েছে পাখিটার গায়ে। হলুদ রং ঝকঝক করছে। কালো কুচকুচে মাথা। ডানার শেষদিকটা মাথার মতোই কালো।

বাইনোকুলার চোখে দিল প্রিয়াংকা। ওঃ, দারুণ! মনে হচ্ছে, পাখিটা হাতের নাগালে এসে গেছে। এইবার একটা ফটো তোলা দরকার। সুতরাং বাইনোকুলার ছেড়ে হ্যান্ডিক্যাম তাক করল ও। 'জুম' মোডে গিয়ে চট করে বেনেবউটার ছবি ক্যামেরাবন্দি করে নিল।

প্রিয়াংকা ওর ছোটভাই সোনমকে নিয়ে প্রতিদিন ভোরবেলা ময়দানে আসে। সোনম খেলা করে, ছুটোছুটি করে। আর প্রিয়াংকা জগিং। সেইসঙ্গে আছে ওর পাখির নেশা। ও পাগলের মতো পাখি দেখে বেড়ায়, পাখি খুঁজে বেড়ায়। তখন ওর গলায় ঝোলে বাইনোকুলার, আর হাতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা থাকে সনি হ্যান্ডিক্যাম। এই বাইনোকুলার আর ভিডিয়ো ক্যামেরা—দুটোই এসেছে আমেরিকা থেকে। ওর ছোটকাকু ওকে প্রেজেন্ট করেছে।

প্রিয়াংকা ঘড়ি দেখল। ছ'টা প্রায় বাজে। মাথার ওপরে ঘোলাটে আকাশ। গাছের পাতায়-পাতায় শিশিরের ফোঁটা। শীত চলে গেলেও ভোরবেলায় তার ছোঁয়া ভালোই রয়ে গেছে। সেইজন্য প্রিয়াংকা সোয়েট কাপড়ের একটা হলদে ফুলহাতা টপ আর জিনস পরে এসেছে।

মাথা তুলে চারপাশের গাছগুলোর দিকে তাকাল। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বিশাল সব গাছ। একটা অশ্বত্থ বলে চিনতে পারল—বাকিগুলোর নাম ও জানে না। সবুজ পাতার ঘন ভিড়ের মধ্যে ও পাখির নড়াচড়া খুঁজতে লাগল। পাখিগুলো যদি নড়াচড়া না করে চুপটি করে পাতার ফাঁকে বসে থাকত তা হলে ওদের খুঁজে বের করাই মুশকিল হত।

কখনও খালি চোখে কখনও বাইনোকুলার চোখে দিয়ে পাখির খোঁজ করে চলল প্রিয়াংকা। একবার চোখ ফিরিয়ে তাকাল দূরের মাঠের দিকে। সেখানে আট-দশজন ছেলে ব্যাট-বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে। তার মধ্যে সোনমও আছে। বাইনোকুলার চোখে দিয়ে সোনমের মুখটাকে খুঁজে বের করল ও। ফুটফুটে স্পষ্ট মুখ। ক্রিকেট খেলার উৎসাহে টগবগ করছে। খেলতে-খেলতে গা গরম হওয়ায় হাফ-হাতা সোয়েটারটা এখন খুলে রেখেছে।

হঠাৎই কথাবার্তার শব্দ কানে এল। কারা যেন কাছেই কোথাও কথা বলছে।

প্রিয়াংকা অবাক হয়ে গেল।

পাখির খোঁজে ও যেদিকটায় এসেছে সেখানে শুধুই বড়-বড় গাছ, আর আশেপাশে কিছু খাটো ঝোপ। লোকজনের ভিড় এখানে নেই। খেলাধুলো করা ছেলেরা বা ভোরবেলা ময়দানে পায়চারি করতে আসা মানুষজনের ভিড় ওই মাঠের দিকে। তা হলে এখানে কথা বলছে কারা?

কথাগুলো যেদিক থেকে আসছে বলে মনে হল অনুমানে সেদিকে কিছুটা এগিয়ে গেল প্রিয়াংকা। ওর সামনে দুটি বিশাল গাছের গুঁড়ি আর একমানুষ সমান আগাছার ঝোপ। তার আড়ালে দাঁড়িয়ে ও কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল।

'হিরেগুলো এখন কোথায়?' শক্ত গলায় কেউ জানতে চাইল।

'আ-আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আ-আমি জানি না।' কাতর অনুনয়ের সুর।

'এবার মনে পড়েছে?'

ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারল প্রিয়াংকা। এবং যা দেখল তাতে ওর মুখ থেকে হেঁচকি তোলার মতো শব্দ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কোনওরকমে মুখে হাত চাপা দিয়ে ও শব্দটাকে আটকাল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল, পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করল—ধক-ধক-ধক-ধক।

প্রিয়াংকার মাথার ভেতরে সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে যেতে চাইল। সামনে এ কী দৃশ্য দেখছে ও!

ঝোপের কাছ থেকে হাত-দশেক দূরে তিনজন মাঝবয়েসি মানুষ। একজন প্রিয়াংকার দিকে পিছন ফিরে মাঠের ওপরে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজন। তাদের মধ্যে একজন একটা মোটা নল লাগানো রিভলভার হাঁটুগেড়ে বসে থাকা লোকটির মাথার একপাশে ঠেকিয়ে রেখেছে। দেখে প্রিয়াংকা বুঝতে পারল, রিভলভারটা সাইলেন্সার লাগানো। কারণ, সিনেমায় ও এরকম হ্যান্ডগান অনেক দেখেছে।

অন্য লোকটি কোমরে হাত দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার ময়াল সাপের মতো ঠান্ডা চোখ হাঁটুগেড়ে বসে থাকা লোকটির দিকে স্থির।

রিভলভার-হাতে লোকটা আবার প্রশ্ন করল, 'এবার মনে পড়েছে, হিরেগুলো কোথায় আছে?'

হাঁটুগেড়ে বসে থাকা লোকটি ভিক্ষা চাওয়ার ভঙ্গিতে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে দু-হাত মুঠো করে মাথা নামিয়ে প্রণামের ভঙ্গি করল। এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকিয়ে কান্না-ভাঙা গলায় বলল, 'আমি জানি না—আমি জানি না।'

প্রিয়াংকার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। ও কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এখানে দাঁড়িয়েই 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করবে? নাকি এই মুহূর্তে সোনমদের মাঠের দিকে ছুট লাগাবে?

কিন্তু ওই লোকটা যদি গুলি চালায়?

প্রিয়াংকার জিভটা যেন নারকোল-দড়ির তৈরি পাপোশ—খড়খড়ে, শুকনো। ওর গলা দিয়ে কি এখন কোনও চিৎকার বেরোনো সম্ভব?

হঠাৎই প্রিয়াংকার মনে পড়ে গেল হ্যান্ডিক্যামটার কথা। অসাড় হাতে ওটা যে এখনও ধরা আছে সেটা ওর মনেই ছিল না।

সুতরাং কাঁপা হাতে ভিডিয়ো ক্যামেরাটা তুলে ধরল। ঝোপের আড়াল থেকে সামনের লোকগুলোকে তাক করে ক্যামেরা চালু করে দিল। ওর কান ভোঁ-ভোঁ করছিল, ঢোঁক গিলতে গলা ব্যথা করছিল, পা দুটোও মনে হয় কাঁপছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ক্যামেরা চলতে লাগল, ছবি উঠতে লাগল।

পাঁচ-দশ সেকেন্ড কেটে যাওয়ার পর প্রিয়াংকা খানিকটা সুস্থির হল। ওর মধ্যে যেন 'ফটোগ্রাফার' প্রিয়াংকা জেগে উঠল। ছবি তুলতে-তুলতে লোকগুলোকে ও খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

কোমরে হাত দিয়ে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে সে-ই মনে হয় আসল লোক।

লোকটার রং ফরসা। মাথায় টাক। জংলা ভুরু চোখে চশমা। পুরু গোঁফ। বেশ মোটাসোটা চেহারা। একটা মাঝারি মাপের মানানসই ভুঁড়ি কোমরের ওপরে উপচে পড়ছে।

লোকটার গায়ে নীল-সাদা ট্র্যাকসুট। গলায় ঝুলছে ফিতেয় বাঁধা মোবাইল ফোন।

যে-লোকটা শক্রুর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে রেখেছে সে তুলনায় বেশ রোগা। তবে চোয়াল, কাঁধ, চওড়া কবজি আর হাতের শিরা দেখে বোঝা যায় তার শক্তি মোটেও কম নয়। আর মুখে বেশ একটা পোড়-খাওয়া ভাব। যেন এরকম দৃশ্য তার কাছে জলভাত।

লোকটার গায়ে ঘিয়ে রঙের হাফহাতা টি-শার্ট। তার ওপরে একটা কালো রঙের বুকখোলা স্লিভলেস জ্যাকেট। পায়ে বাদামি রঙের কটন প্যান্ট। বাঁ-হাতের কবজিতে স্টিল ব্যান্ড লাগানো রিস্টওয়াচ, আর ডানহাতের মধ্যমায় একটা স্টিলের আংটি।

লোকটার গায়ের রং তামাটে। মাথায় কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো চুল। চোখজোড়া মুখের তুলনায় বেশ বড় মাপের। বাঁ-গালে একটা ছোট জড়ুল মতন রয়েছে।

হাঁটুগেড়ে বসে থাকা লোকটার মাথায় কাঁচাপাকা চুল—তবে পাকার ভাগটাই বেশি। চেহারা মোটার দিকে। গায়ে গাঢ় নীল রঙের পোলো নেক টি-শার্ট, কোমরে কালো চামড়ার বেল্ট, তার নীচে ছাই রঙের ঢোলা প্যান্ট।

প্রিয়াংকার দিকে পিছন ফিরে থাকায় ও মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু লোকটার ঘাড়ের কাছে, চুল যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দুটো চর্বির থাক আর একটা ভারী সোনার চেন ওর নজর টানছিল।

লোকটার 'আমি জানি না' উত্তর শোনার পর রিভলভারওয়ালা চাপা গলায় হাসল। বলল, 'তা হলে আর কী! কাম তামাম। খাল্লাস!'

রিভলভারের সেফটি ক্যাচ খোলার 'ক্লিক' শব্দ হল।

সঙ্গে-সঙ্গে অসহায় লোকটা কঁকিয়ে উঠল, 'বলছি, বলছি—প্লিজ, প্লিজ...।'

রিভলভার-হাতে লোকটা ঠোঁট বেঁকিয়ে একবার হাসল। তারপর পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যার অর্থ হল : 'দেখলেন তো, কীভাবে মুখ খোলাতে হয়!'

হাঁটুগেড়ে বসে থাকা লোকটা দু-হাত জোড় করে কান্নায় হাঁউমাঁউ করতে-করতে জড়ানো গলায় বলল, 'আমার বেডরুমের ড্রেসিং টেবিলে—একটা কোল্ড ক্রিমের কৌটোর ভেতরে হিরেগুলো আছে— সাতটা— ক্রিমের ভেতরে লুকোনো আছে...।'

লোকটার কথা পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই একটা চাপা 'ফট' শব্দ হল। পিচবোর্ডের দেওয়ালে একটা ছোট্ট ঢিল ছুড়ে মারলে যেরকম শব্দ হয়। আর সঙ্গে-সঙ্গে নীল টি-শার্ট পরা মোটা লোকটা ঢলে পড়ল মাটিতে। ওর দেহটা কেমন যেন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ভাঁজ হয়ে ঘাসের ওপরে পড়ে রইল। মাথাটা বাঁ-দিকে কাত হয়ে থাকায় কপালের ডানপাশের ছোট কালো ফুটোটা প্রিয়াংকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

সামনাসামনি এই খুনের দৃশ্যটা দেখে প্রিয়াংকা একটা বিশাল ধাক্কা খেল। ওর গোটা শরীরটা কাঁপতে লাগল। ওর অজান্তেই মুখ দিয়ে একটা চাপা শব্দের টুকরো বেরিয়ে এল।

লোকদুটো চকিতে শব্দ লক্ষ করে চোখ ফেরাল। তারপর দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল আগাছার ঝোপের দিকে।

প্রিয়াংকা আর দেরি করল না। ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুট লাগাল সোনমদের খেলার মাঠের দিকে। আর একইসঙ্গে 'সোনম! সোনম!' করে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল।

লোকদুটো আগাছার ঝোপ হাতে ঠেলে একপাশে সরিয়ে তার ফাঁক দিয়ে ছুটন্ত প্রিয়াংকাকে দেখতে লাগল।

রোগা লোকটা রিভলভারটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে চালান করে দিল। তারপর মোটা সঙ্গীর দিকে না তাকিয়েই বিড়বিড় করে বলল, 'মেয়েটার হাতে একটা হ্যান্ডিক্যাম আছে খেয়াল করেছেন?'

'করেছি—।'

'নিশ্চয়ই আমাদের অপারেশানের ছবি তুলেছে। নাঃ, মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।'

'তার চেয়েও জরুরি ওই হ্যান্ডিক্যামের মাইক্রো-ক্যাসেটটা। যেভাবে হোক ওটা আমাদের চাই-ই চাই। ওটা হাতে পেলে আর কোনও ভয় নেই। বাকি সব আমি ম্যানেজ করে নেব। তখন মেয়েটা কোর্টে হাজার চেঁচালেও কিছু লাভ হবে না। কোর্ট প্রমাণ চায়, প্রমাণ।'

স্লিভলেস জ্যাকেট পরা লোকটা ঠোঁটের কোণে হাসল : 'তখন ওই ছামিয়া বাঁচুক কি মরুক কিছু যায় আসে না—।'

'উঁহু—' মাথা নাড়ল ট্র্যাকসুট পরা লোকটা : 'কোনও রিসক নেওয়ার দরকার নেই। আগে মাইক্রো-ক্যাসেট হাতাও, তারপর মেয়েটাকে ওড়াও...।'

'কিন্তু মেয়েটার ডিটেইলস তো জানতে হবে। কী নাম, কোথায় থাকে...বাড়িতে আর কে-কে আছে...নইলে ওর খোঁজ পাব কী করে?'

'ইজি—' এবার ট্র্যাকসুটের বাঁকা হাসির পালা : 'এখন থেকেই তোমার কাজ শুরু করে দাও। ফলো হার—।'

ঝোপের আড়াল থেকে ওরা দেখতে পাচ্ছিল, প্রিয়াংকা সোনমকে ব্যস্তভাবে কী বলতে-বলতে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর ছোট ছেলেটা ওর খেলার কিটব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে একটা স্লিভলেস সোয়েটার হাতে মেয়েটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাঁটতে চেষ্টা করছে।

ওদের কয়েক সেকেন্ড লক্ষ করার পরই লোকদুটো বুঝতে পারল, প্রিয়াংকা আর সোনম মাঠ পেরিয়ে পিচের রাস্তার দিকে এগোচ্ছে। আর সেখানে রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করা রয়েছে মেরুন রঙের একটা মারুতি অলটো।

মোটা লোকটা চাপা শিস দিয়ে উঠল, বলল, 'থ্যাংক গড! মেয়েটা মনে হয় ওই মেরুন গাড়িটায় উঠবে। কুইক—ওদের গাড়ির নম্বরটা আমাদের দরকার। তারপর রুটিন এনকোয়ারি—দু-তিনদিনেই সব খবর বেরিয়ে পড়বে। শিগগির চলো—।'

ঝোপ থেকে হাত সরিয়ে নিল মোটা লোকটা। তারপর দুজনে পা চালাল নিজেদের গাড়ির দিকে। যাওয়ার সময় রোগা লোকটা ঘাসের ওপরে পড়ে থাকা অসাড় মৃতদেহটা একলাফে টপকে গেল।

চারপাশে ভোরের আমেজ তখনও ছড়িয়ে আছে। তবে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য এখন উঁকি মেরেছে। বড়-বড় গাছের পাতার আড়াল থেকে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। গাছগাছালির কাছ থেকে কিছুটা দূরে খোলা জায়গায় ঘাসের শিষ ছন্নছাড়াভাবে গজিয়ে উঠেছে। সেই শিষের ওপরে ছোট-ছোট হিমের ফোঁটা। সকালের মিষ্টি আলো পড়ে চিকচিক করছে।

এদিকটায় কোনও লোকজন নেই। যত ভিড় খেলার মাঠের দিকে। সেই কারণেই হিরেগুলো নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য ওরা দুজনে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিল। ট্র্যাকসুট পরা মোটা লোকটা রোজ ভোরে ময়দানে মর্নিং ওয়াক করতে আসে। সে জানে, এখনও অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এই ডেডবডিটা কারও

নজরে পড়বে না। শুধু ওই জিনস পরা মেয়েটা ব্যাপারটা আচমকা দেখে ফেলেছে, তাই। এখন চটপট গাড়িতে উঠে ওই মেরুন অলটোটাকে ধরতে হবে। ওটার নম্বর নিতে হবে।

কিছুটা দূরে মাঠের ওপরে ওদের রুপোলি স্যান্ট্রো গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা দুজনে আরও জোরে পা চালাল সেই গাড়ির দিকে।

ভেজা ঘাস মাড়িয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকাল ট্র্যাকসুট। মৃতদেহটার পাশে তিনটে কাক এসে বসেছে। ডাকাডাকি করছে।

।।তিন।।

মিমোর কথা শুনে-শুনে বাবলি প্রিয়াংকার ঠিকানাটা লিখে নিল।

ঠিকানা জানার পর মিমো ওকে বলল, 'আমরা এক্ষুনি থানায় যাচ্ছি। আপনার ফোন-নাম্বারটাও পুলিশকে দিচ্ছি। ওরা যদি আপনাকে কনট্যাক্ট করতে চায় তা হলে...।'

প্রিয়াংকা উদভ্রান্তের মতো বলল, 'কোনও লাভ নেই। আমার মোবাইল ওরা কেড়ে নিয়েছে। আমি ওদের একটা ভাঙা টেলিফোন থেকে ফোন করছি। আপনি বরং আমার বাবার মোবাইল নাম্বারটা লিখে...।'

যাঃ, লাইনটা আবার কেটে গেল! বিরক্তির একটা শব্দ করে মিমো নিজের ঊরুতে একটা থাপ্পড় মারল।

বাবলি জিগ্যেস করল, 'কী হল?'

'সেই এক কেস—লাইন কেটে গেল। চল, আমরা বরং থানায় যাই—।'

'কোন থানায় যাবি?'

'কেন, মানিকতলা থানায়। আমাদের বাড়ি তো ওই এরিয়ায়।'

মিমো আর বাবলি চটপট পা চালাল। এখান থেকে মিমোদের বাড়ি অন্তত আট-দশ মিনিটের হাঁটা পথ।

মিমো মোবাইল ফোনটা হাতে ধরে রেখেছিল। ভাবছিল, এই বোধহয় প্রিয়াংকার ফোন আসবে।

ওরা গলির নানান প্যাঁচ পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সামনেই অরবিন্দ সেতু—সমতল রাস্তা ধীরে-ধীরে উঁচু হয়ে গেছে। অটো, বাস কিংবা গাড়ির সংখ্যা এখনও তেমন বাড়েনি। আর ঘণ্টাখানেক পরই এই রাস্তাটা ব্যস্ততায় উপচে পড়বে।

খাল পেরিয়ে ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় এসে নীচে নামার সিঁড়ি ধরল ওরা। এখানে নেমে খালধারের রাস্তা বরাবর মিনিটদশেক হেঁটে গেলে মানিকতলা থানা। সেখানে একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে মিমোর সামান্য পরিচয় আছে। ভদ্রলোক কী পোস্টে চাকরি করেন মিমো জানে না। তবে মাসদুয়েক আগে অরবিন্দু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে—মিমোদের বাড়ির কাছাকাছি—একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। বলতে গেলে মিমোর চোখের সামনেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। তারপর পুলিশ যখন স্পটে আসে তখন সেই অফিসার মিমোর এজাহার নিয়েছিলেন। মিমোর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেছিলেন। এর পরে জিপে করে মিমোদের পাড়া দিয়ে যাতায়াতের সময় ওঁর সঙ্গে মিমোর কয়েকবার দেখা হয়েছে। দুবার তো তিনিই গাড়ি থামিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু ওঁর নামটা মিমোর জানা নেই। কে জানে, এখন ওঁকে থানায় পাওয়া যাবে কি না।

ও আর বাবলি যখন থানার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে তখন মিমোর মোবাইল বেজে উঠল। ও তাড়াতাড়ি ফোনের উইন্ডোর দিকে তাকাল। না, প্রিয়াংকার নয়, মায়ের ফোন।

ফোন ধরতেই মায়ের একরাশ কথা। জিমে এতক্ষণ লাগছে কেন? ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে পড়তে বসবি কখন? আর তো দু-সপ্তাহ পরেই পরীক্ষা—সে-খেয়াল আছে!

মায়ের কথার তোড়ের মুখে মিমো প্রিয়াংকা কিংবা পুলিশের কথা মাকে বলতে ভরসা পেল না। বললেই মা হয়তো ছুটে চলে আসবে মানিকতলা থানায়। তারপর দুনিয়া মাথায় করে ছাড়বে।

মিমো জানে, বিশ্বজিৎদাকে মা বেশ পছন্দ করে, ভরসাও করে। জিমে মিমোকে ভরতি করার সময় মা এসেছিল, বিশ্বজিৎদার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। তা ছাড়া মিমোকে জুনিয়ার বডি-শো কম্পিটিশানে নানান জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বজিৎদা বেশ কয়েকবার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে।

সুতরাং মায়ের কাছে জবাবদিহি করার এই বিপদের সময় মিমো বিশ্বজিৎদাকেই মনে-মনে আঁকড়ে ধরল এবং টেলিফোনে বলে বসল, 'একটা বডি-শো কম্পিটিশানের ব্যাপারে আমরা বিশ্বজিৎদার সঙ্গে ডিসকাস করছি। চিন্তা কোরো না—আধঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব।'

বাবলি জিগ্যেস করল, 'কে?'

মিমো ক্লান্ত গলায় বলল, 'মা—আর কে!'

ততক্ষণে ওরা থানায় ঢুকে পড়েছে। সামনে চওড়া করিডরের একপাশে একটা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। সেখানে বসে আছে একজন কনস্টেবল।

একটু এগিয়েই ডানদিকে লোহার দরজা লাগানো হাজতঘর। ভেতরে একটা লোক গারদ ধরে দাঁড়িয়ে। তার আর-একজন সঙ্গী দূরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে।

অকারণেই মিমোর ভয়-ভয় করতে লাগল। এর আগে কখনও ও থানায় আসেনি।

বাঁ-দিকে তাকাল মিমো। সাদা য়ুনিফর্ম পরা একজন অফিসার চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছেন। টেবিলে দুটো বড়-বড় খাতা, খাতার পাশে একটা বলপয়েন্ট পেন, আর একটা টেলিফোন। ইনিই বোধহয় ডিউটি অফিসার—ডায়েরি-টায়েরি লেখেন।

মিমো আর বাবলি ওঁর কাছে এগিয়ে গেল। মিমো বারবার ভাবছিল, ইস, ওর সেই চেনা অফিসার থাকলে কত ভালো হত। কে জানে, তিনি হয়তো এর মধ্যে অন্য কোনও থানায় বদলি হয়ে গেছেন। সেই চেনা মানুষটার খোঁজে ও এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল। কিন্তু তাঁকে দেখতে পেল না।

মিমো আর বাবলিকে দেখে ডিউটি অফিসার ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকালেন। বছর ষোলো কি সতেরোর দুটো ছেলে। চোখে পড়ার মতো স্বাস্থ্য। একজন একটু লম্বা, অন্যজন উচ্চতায় খাটো।

ডিউটি অফিসারের টেবিলের সামনে একটা ছোট বেঞ্চি পাতা ছিল। 'বসছি', বলে মিমো সেটাতে বসে পড়ল। দেখাদেখি বাবলিও।

'কী ব্যাপার?' খানিকটা বিরক্ত ভাব দেখিয়ে ডিউটি অফিসার জানতে চাইলেন।

'আমরা—আমরা একটা...কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারে রিপোর্ট করতে এসেছি।' মিমো বলল।

'কিডন্যাপিং?' প্রশ্নের ঢঙে কথাটা বলে অফিসার একটা খাতা টেনে নিয়ে খুললেন। পাতা উলটে-উলটে ঠিকঠাক পৃষ্ঠায় এলেন। পেনটা তুলে নিয়ে লেখার জন্য বাগিয়ে ধরলেন।

মিমো পুরো ঘটনাটা ওঁকে বলল। তারপর বাবলি পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করে প্রিয়াংকার নাম-ঠিকানা বলল। অফিসার খাতায় লিখতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বোঝার জন্য মাঝে-মাঝে ওদের প্রশ্ন করতে লাগলেন।

লেখার কাজ মিটে গেলে অফিসার মিমো আর বাবলির নাম-ঠিকানা, গার্জেনের নাম, কোন স্কুলে ওরা পড়ে—এসব জেনে নিয়ে খাতায় লিখলেন। তারপর খাতাটা ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা মাইনর—মানে, আঠেরো বছর তো হয়নি—তবুও এই জায়গাটায় সই করে দাও—।'

মিমো আর বাবলি সই করে দিল।

তারপরই ওদের অবাক করে দিয়ে অফিসার ভদ্রলোক ওদেরই জেরা করতে শুরু করলেন।

হঠাৎ মিমোর ফোনেই বা প্রিয়াংকা ফোন করতে গেল কেন?

মিমোরা গল্পটা বানিয়ে বলছে না তো?

প্রিয়াংকা নামের মেয়েটিকে যে কিডন্যাপ করা হয়েছে সেটা ওরা বুঝল কেমন করে? এইসব কমবয়েসি ছেলেরা বা মেয়েরা অনেকসময় নানারকম মজা করে। এটাও হয়তো সেরকমই কিছু।

এইসব পুলিশি প্রশ্নের আক্রমণের মুখে পড়ে মিমো আর বাবলি সাধ্যমতো আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। মিমো ওর মোবাইলের বোতাম টিপে প্রিয়াংকার ল্যান্ডলাইন নম্বরটা আগেই অফিসারকে দেখিয়েছিল। সেটা

তিনি ডায়েরির খাতায় লিখেও নিয়েছিলেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ভদ্রলোকের মুখ থেকে সন্দেহের ভাবটা যাচ্ছিল না।

মিমো বারবার করে বলল, 'দেখুন স্যার, মেয়েটার মনে হয় হেভি বিপদ। ও ফোন করলে লাইনটা বারবার কেটে যাচ্ছে। আর আমি ওই নাম্বারে ফোন করলে কোনও কানেকশান পাচ্ছি না। বিশ্বাস করুন, মেয়েটাই বারবার বলছে পুলিশে খবর দিতে। আপনারা প্লিজ কিছু একটা করুন—।'

ডিউটি অফিসার একটা হাই তুললেন। তারপর 'তেওয়ারি!' বলে চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকলেন।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রোগা চেহারার একজন কনস্টেবল সামনে এসে দাঁড়াল। গাল বসা শুকনো মুখে একজোড়া পেল্লাই গোঁফ ভীষণ বেমানান লাগছে। উর্দি পরতে-পরতেই সে 'স্যার'-এর ডাক শুনে ছুটে এসেছে। এখন জামাটাকে ব্যস্তভাবে প্যান্টের ভেতরে গুঁজে দিচ্ছে।

ডিউটি অফিসার তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে আড়মোড়া ভাঙছিলেন। একটা হাই তুলতে-তুলতে বললেন, 'লাইটারটা দে—।'

তেওয়ারি হুকুম শোনামাত্রই পালন করতে ঝট করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। সে লাইটার বের করতে-করতেই ডিউটি অফিসারের ঠোঁটে একটা বিড়ি জায়গা করে নিয়েছে। তেওয়ারি ঝুঁকে পড়ে লাইটার জ্বেলে বিড়িটা ধরিয়ে দিল। অফিসার চোখ বুজে বিড়িতে টান দিলেন। বাঁ-হাতের আঙুল নেড়ে তেওয়ারিকে বুঝিয়ে দিলেন ওর কাজ আপাতত শেষ। ও এখন যেতে পারে।

তেওয়ারি চলে গেল।

ডিউটি অফিসারের এই কাণ্ড দেখতে-দেখতে মিমো আর বাবলি অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। একইসঙ্গে এই গয়ংগচ্ছ ভাব ওদের অসহ্য লাগছিল।

মিমো আশেপাশে তাকাল—যদি অন্য কোনও পুলিশ অফিসারকে দেখতে পায়। নাঃ, সেরকম কেউ নেই। থানার ও. সি-র ঘরও এখন খালি। নইলে ওঁর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা...।

যখন ও ভাবছে, কী করা যায়...ঠিক তখনই ওর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ইনকামিং কলের নম্বরটা দেখেই মিমো বুঝল, প্রিয়াংকার ফোন। ও চটপট বোতাম টিপে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে প্রিয়াংকার ভয় পাওয়া গলা শোনা গেল : 'আপনি পুলিশে খবর দিয়েছেন? জলদি! আর বেশি সময় নেই। এই ফোনটা খারাপ। বারবার লাইন কেটে যাচ্ছে...। যা করার জলদি করুন...।'

মিমো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমরা এখন মানিকতলা থানায়। এই নিন, ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলুন—।'

মিমোর ফোন বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে অফিসার ভদ্রলোক সজাগ হয়েছিলেন। এখন মিমো ওর মোবাইলটা বাড়িয়ে দিতেই তিনি তাড়াতাড়ি সেটা কানে দিয়ে 'হ্যালো' বললেন। হাতের বিড়িটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে নিভিয়ে দিলেন।

প্রিয়াংকা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কাঁদতে-কাঁদতেই ও বলল, 'স্যার, স্যার...আমাকে বাঁচান। এরা আমাকে খুন করে ফেলবে...।'

'কোনও ভয় নেই—আমরা এখুনি অ্যাকশান নিচ্ছি। আপনাকে কোথায় আটকে রেখেছে বলুন তো? জায়গাটা ডেসক্রাইব করতে পারেন?'

প্রিয়াংকা উত্তরে কী যেন বলছিল—কিন্তু তখনই ফোনে একটা 'গোঁ-ও-ও' শব্দ শোনা গেল। ওর কথা আর ভালো করে বোঝা গেল না।

অফিসার অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কীসের শব্দ হচ্ছে?'

'একটা প্লেন উড়ে গেল। আমাকে যে করে হোক বাঁচান...।'

প্রিয়াংকার কথা শেষ হওয়ার আগেই লাইনটা কেটে গেল। বারকয়েক 'হ্যালো! হ্যালো!' করেও ডিউটি অফিসার আর কোনও সাড়া পেলেন না। তখন ফোনটা মিমোকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো তো, ওই

নম্বরটায় লাগাতে পারো কি না—।'

মিমো জানত চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই, তবুও তিনবার প্রিয়াংকার নম্বরটায় কল করল। প্রত্যেকবারই শুধু রিং বেজে গেল। কেউ ধরল না। হয়তো ফলস রিং হচ্ছে—মিমো ভাবল।

ডিউটি অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিমো আর বাবলির দিকে সহজ চোখে দেখলেন। নাঃ, এই ছেলেদুটো তো সত্যি কথাই বলেছে! আর ফোনে মেয়েটার কান্নাকাটি শুনে মনে হয় না মজা করার জন্য এইরকম অভিনয় করছে। সুতরাং কিছু একটা করা দরকার।

হঠাৎই মিমো আর বাবলি দেখল, ডিউটি অফিসার ওদের পিছনদিকে তাকিয়ে কাকে যেন সেলাম ঠুকলেন।

পিছন ফিরে তাকিয়েই মিমোর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওর চেনা সেই পুলিশ অফিসার। গায়ে য়ুনিফর্ম। মাথার টুপিটা হাতে ধরা। পাশে একজন কনস্টেবল। মনে হয়, আউটডোর ডিউটিতে কোথাও বেরিয়েছিলেন—এইমাত্র ফিরেছেন।

মিমোকে লক্ষ করে তিনিই প্রথম কথা বললেন, 'কী ব্যাপার? তুমি থানায় কেন?'

ডিউটি অফিসার চটপট বললেন, 'ওরা একটা রিপোর্ট লেখাতে এসেছিল।' তারপর অবাক হয়ে ওপরওয়ালাকে জিগ্যেস করলেন, 'ওকে চেনেন নাকি, স্যার?'

'খুউব চিনি—' হেসে বললেন তিনি। তারপর মিমোর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এসো—এ-ঘরে এসো। তোমাদের কথা শোনা যাক।' ডিউটি অফিসারের দিকে তাকিয়ে : 'তুমিও এসো, পালচৌধুরী।'

ও. সি.-র ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি। ওঁর পিছন-পিছন মিমো, বাবলি আর ডিউটি অফিসার পালচৌধুরী।

।।চার।।

কলেজ ছুটি হওয়ার পর ক্যাম্পাসের বাইরে বেরিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আড্ডা মারা প্রিয়াংকার রোজকার অভ্যেস। আজও ওরা সাতজন বন্ধু ক্যাম্পাসের মেনগেটের বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তুমুল আড্ডা মারছিল। আড্ডা ঠিক নয়—আসলে বিতর্ক। ফিল্মের সবচেয়ে সুপুরষ নায়ক কে? এই বিতর্কে শেষ তিনজন প্রতিযোগীকে নিয়ে এখন লড়াই চলছে : সলমান খান, হৃতিক রোশন এবং জন আব্রাহাম।

প্রিয়াংকা সলমানের অন্ধ ভক্ত—তাই সলমানকে 'সেরা' প্রমাণ করার জন্য গলা ফাটাচ্ছিল। হঠাৎই ওর হাতের মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

'হ্যালো—।'

'কী রে, এখনও ছুটি হয়নি?' ও-প্রান্ত থেকে বাপি জিগ্যেস করল।

চার বছর আগে আচমকা হার্ট অ্যাটাকে ওর মা চলে যাওয়ার পর থেকে সোনম আর ওর কাছে বাপি একাই 'বাপি' আর 'মা-মণি'। সবসময়ে ওদের জন্য চিন্তা করে—কখনও কারণে, আর বেশিরভাগ সময়েই অকারণে।

প্রিয়াংকা বাপিকে বলল, 'এইমাত্র প্র্যাকটিক্যাল শেষ হয়েছে। তুমি চিন্তা কোরো না। বন্ধুদের সঙ্গে একটু কথা বলেই গাড়িতে উঠছি—।'

বাপি বলল, 'যাকগে, বেশি দেরি কোরো না। মণিরাম অনেকক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে।'

মণিরাম প্রিয়াংকাদের ড্রাইভার। বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। বহুবছর ধরে ওদের গাড়ি চালায়। খুব বিশ্বাসী। প্রিয়াঙ্কা আর সোনমকে বলতে গেলে নিজের ছেলেমেয়ের মতো ভালোবাসে। ওর কলেজে আসতে বা সোনমের স্কুলে যেতে মণিরাম আজ পর্যন্ত কখনও দেরি করেনি।

বাপির সঙ্গে কথা শেষ করেই বন্ধুদের বলল, 'অ্যাই, বাপি তাড়া দিচ্ছে। টা-টা। কাল আবার এই ইস্যুটা রিওপেন করে ঝগড়া করব। ও.কে.?'

বন্ধুদের হাত নেড়ে চটপট পা চালাল প্রিয়াংকা। সামনে ডানদিকে ঘুরেই যে-সাইডরোডটা পাওয়া যায়, মণিরাম বরাবর সেখানেই গাড়ি নিয়ে দাঁড়ায়।

সেদিকে এগোতে-এগোতে চারপাশের গাছপালার দিকে তাকাল ও। সবে সাড়ে পাঁচটা বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই আকাশ ছাইরঙা হয়ে গেছে। বড়-বড় গাছের ফাঁকফোকরে ছোট-ছোট অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। সেখানে রাত্রিবাস করতে আসা পাখিদের দেখা না গেলেও তাদের ডাক শোনা যাচ্ছে।

প্রিয়াংকাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা সল্ট লেকে। কলেজের ক্যাম্পাসটা দারুণ—গাছপালা আর আধুনিক ছাঁদের ঘরবাড়ি দিয়ে একটা মিনি শহরের মতো করে সাজানো। ক্যাম্পাস ঘিরে চওড়া-চওড়া রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমুল আর দেবদারু গাছ। কলেজের শুরু আর শেষের সময়টা ছাড়া রাস্তাগুলো প্রায় নির্জন থাকে। মাঝে-মাঝে ছুটে যাওয়া গাড়ির আওয়াজ যদি না থাকত তা হলে শুধু পাখির ডাকই শোনা যেত। কী দারুণ হত তখন!

প্রিয়াংকার বিষয় ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং হলেও পাখির নেশা ওর ছোটবেলা থেকেই। পাখির ডাক নকল করে পাখিকে ঠকানোর জন্য ও বাপির কাছে শিস দেওয়া শিখেছে। বেশ মনে আছে, তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ে।

এখন রাস্তায় কলেজ ছুটির ব্যস্ততা। প্রিয়াংকা জানে, মিনিট-কুড়ি কি আধঘণ্টা পর এই ব্যস্ততা কমে যাবে। নেমে আসবে নির্জনতা এবং অন্ধকার।

গাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল ও। একটু পরে ডানদিকে ঘুরেই মেরুনরঙা মারুতি অলটোটা ওর চোখে পড়ল।

গাড়ির কাছে গিয়ে রোজকার অভ্যেস মতো পিছনের দরজা খুলে কাঁধের ব্যাগটা ভেতরে ছুড়ে দিয়ে সিটে বসে পড়ল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে মণিরাম গাড়ি ছুটিয়ে দিল।

প্রিয়াংকা মণিরামের দিকে কোনওরকম নজর না দিয়ে ওর ব্যাগটা টেনে নিল। ব্যাগ থেকে ক্লাসনোটের লম্বা খাতা বের করল। কাল সুনীতা ম্যাডাম কমিউনিকেশান সিস্টেমস-এর ক্লাস টেস্ট নেবেন। কমিউনিকেশান প্রিয়াংকার ফেভারিট সাবজেক্ট। তা ছাড়া সুনীতা ম্যাডাম ব্যাপক পড়ান। ক্লাসে যা বলেন সব যেন মনে গেঁথে যায়। এই টেস্টটায় প্রিয়াংকাকে হায়েস্ট পেতেই হবে। নইলে ম্যাডামের কাছে ওর প্রেস্টিজ থাকবে না।

প্রিয়াংকা বেশ মন দিয়ে ক্লাস নোট দেখছিল। ফলে খেয়াল করেনি যে, গাড়ি জোরে ছুটছে। এও খেয়াল করেনি, গাড়ি ওর বাড়ির দিকে নয়, ছুটে চলেছে অন্য রাস্তা ধরে। আর গাড়ি মণিরাম চালাচ্ছে না, তার বদলে অন্য একজন লোক স্টিয়ারিং-এ বসে আছে।

গাড়িটা হঠাৎ বেশ জোরে ব্রেক কষল। প্রিয়াংকা ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। মণিরামকে লক্ষ করে 'কী হল, মণিদা?' বলতে গিয়েই ও প্রথম খেয়াল করল, অন্য লোক গাড়ি চালাচ্ছে।

ও চিৎকার করতে যাবে অমনই গাড়ির দুপাশের দরজা খুলে দুটো লোক চটপট ওর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। রোগা মতন একজন ওর কোমরে একটা পিস্তল চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, 'স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকো। নইলে খতম।'

আর অন্য লোকটা—সামান্য মোটাসোটা গালফোলা চেহারা—ওর ব্যাগ হাতড়ে মোবাইল ফোনটা বের করে সুইচ অফ করে দিল। তারপর পকেটে পুরে নিল।

ব্রেক কষার পর থেকে পুরো ব্যাপারটা ঘটতে সময় লেগেছে বড়জোর পাঁচ-সাত সেকেন্ড। তারপরই গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছিল। যেন কিছুই হয়নি।

পিস্তল-ধরা লোকটা রুক্ষ গলায় প্রিয়াংকাকে বলল, 'চোখে হাত চাপা দিয়ে কোলের ওপর মাথা ডাউন করো—জলদি।'

লোকটা শুধু হুমুমই দিল না—হুকুমটাকে জোরদার করতে সেইসঙ্গে একটা পিস্তলের খোঁচাও দিয়েছে।

প্রিয়াংকা সঙ্গে-সঙ্গে চোখে হাত চাপা দিয়ে মাথা নীচু করল। গাড়িটা ব্রেক কষার পর ও একপলক রাস্তার দিকে তাকাতে পেরেছিল। তাতে রাস্তাটা বা এলাকাটা ওর চেনা বলে মনে হয়নি। আর এখন এই অবস্থায় তো পথ চেনার কোনও প্রশ্নই নেই।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল প্রিয়াংকা, আর গাড়ির হর্ন। এ ছাড়া পথচলতি গাড়ির হর্নের শব্দও পাচ্ছিল। কিন্তু লোকগুলোর কোনওরকম কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল না—কারণ, অচেনা তিনটে লোক নিজেদের মধ্যে একটি কথাও বলছিল না।

প্রিয়াংকা বুঝল, ওদের প্ল্যান এতই নিখুঁত যে, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার কোনও প্রয়োজন নেই।

কিডন্যাপিং-এর ঘটনাটা এমন আচমকা ঘটেছে যে, প্রিয়াংকা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর, সেই ঝোঁকটা কেটে যেতেই, একটা ঠান্ডা ভয় ওর মধ্যে চারিয়ে গেল। বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের ছটফটানির শব্দও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। ভয় আর চাপা কান্নায় ওর গলার কাছটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন করছিল। সোনমের কথা মনে পড়ছিল, বাপির কথা মনে পড়ছিল, আর মনে পড়ছিল মা-মণির কথা। দম আটকানো কান্নায় ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

হঠাৎই গাড়িটা কোথাও একটা থামল। দুটো শক্ত হাত ওর কাঁধ চেপে ধরল। প্রিয়াংকা প্রতিবাদে ছটফট করে উঠতেই একটা কাঁধ থেকে হাত সরে গেল। তারপরই পিঠের ঠিক মাঝখানে একটা রুক্ষ খোঁচা টের পেল। সেই সঙ্গে হুকুম : 'একদম চুপ। ফড়ফড় করলেই ওপরে ফুঁকে দেব।' একটু থেমে : 'চোখ থেকে হাত সরাও—।'

প্রিয়াংকা হাত সরাতেই অন্য লোকটা দুটো ইলাস্টিকের হেডব্যান্ড ওর চোখের ওপরে পরিয়ে দিল। ইলাস্টিকের চাপ টের পেল ও। তারপর একজন বলল : 'গাড়ি থেকে নেমে পড়ো—।'

ওর হাত ধরে টেনে কেউ গাড়ি থেকে ওকে নামাল।

কয়েক পা এলোমেলো হাঁটানোর পর ওকে অন্য আর-একটা গাড়িতে তোলা হল। স্টার্ট দিয়েই গাড়িটা ছুটতে শুরু করল। আর প্রিয়াংকাদের অলটো গাড়িটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেদিকেই ছুটে চলল।

নতুন গাড়িটা প্রায় আধঘণ্টা কি তার বেশিক্ষণ চলার পর একটা সাদামাঠা দোতলা বাড়ির কাছে এসে থামল। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বিশাল ফাঁকা জমি। সেখানে অগোছালোভাবে ছোট-বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়াংকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওরা দুজন।

বাড়িতে ঢোকার পর ওর চোখের ওপর থেকে ইলাস্টিক ব্যান্ড খুলে দিল। ওর সাইডব্যাগটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিল।

প্রিয়াংকা চোখ পিটপিট করে চারপাশে তাকাল।

কয়েক সেকেন্ড পর ওর দৃষ্টি স্বাভাবিক হল। তখন বুঝল, বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতরে টিউবলাইট জ্বলছে।

লাগেজ টানার ঢঙে ওকে করিডর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল ওরা। প্রিয়াংকা নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওর গাল বেয়ে জলের রেখা নেমে চলেছে। এতক্ষণে বাপি নিশ্চয়ই ওর খোঁজ করে-করে পাগল হয়ে গেছে।

করিডরের শেষ প্রান্তে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একজন মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ডায়াল করল। তারপর বলল, 'পাখি খাঁচায় এসে গেছে।' বলেই ফোন অফ করে দিল।

ততক্ষণে আর-একজন ঘরের দরজা ঠেলে প্রিয়াংকাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ঘরটা মাপে মাঝারি গোছের। দু-দিকের দেওয়ালে দুটো জানলা—কিন্তু দুটো জানলাই বন্ধ। ঘরটা দেখে মনে হয়, গোডাউন বা ভাঁড়ার ঘর। বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা আর প্লাস্টার অফ প্যারিসের প্যাকেট। তার পাশে দুটো প্লাস্টিকের ড্রাম আর রঙের টিন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটা ভাঙা চেয়ার-

টেবিল এদিক-ওদিক দাঁড় করানো রয়েছে। ডানদিকের মেঝেতে কয়েকটা জলের পাইপ আর লোহালক্কড়। তার পাশে নীল রঙের কয়েকটা পলিথিন শিট ভাঁজ করে রাখা। সবমিলিয়ে মনে হয়, ঘরটা কোনও কনস্ট্রাকশন কোম্পানির গোডাউন।

ঘরের মেঝেটা নিট সিমেন্ট দিয়ে ফিনিশ করা নেই। দেখে বোঝা যায়, এ-ঘরটাকে প্রিয়াংকার অস্থায়ী আস্তানা করার জন্য মালপত্র এদিক-ওদিক সরিয়ে মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে সাফ করা হয়েছে। ঘরের পিছনের দেওয়ালের কাছাকাছি মেঝেতে একটা বিছানা পাতা রয়েছে। সস্তা সবুজ রঙের বেডশিট দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। পায়ের দিকে ভাঁজ করে রাখা একটা বেডকভার।

প্রিয়াংকা বুঝল, এই গোডাউনে ওকে এখন থাকতে হবে। শুতে হবে এই জঘন্য বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন একটা ঢেউ শরীরের ভেতর থেকে ওর কান্নাটাকে উথলে দিল।

প্রিয়াংকাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যে-লোকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে বলল, 'এই ঘরটায় তুমি ক'দিন থাকবে। তোমার যা-যা দরকার ওই মাসিকে বলবে—মাসি ব্যবস্থা করবে।'

লোকটা আঙুল তুলে ঘরের একদিকে দেখিয়েছিল। প্রিয়াংকা সেদিক লক্ষ করে তাকাল।

প্রথমে ভেবেছিল কোনও মূর্তি। কিন্তু চোখের পাতা পড়তেই বুঝল মূর্তি নয়—এর প্রাণ আছে। প্লাস্টিকের ড্রামের পিছনে শরীরটাকে খানিক আড়াল করে মানুষটা উবু হয়ে মেঝেতে বসে আছে। রোগা, আদিবাসী টাইপের চেহারা, কুচকুচে কালো গায়ের রং, চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, নাকে নথ, কানে দুল, গায়ে একটা ময়লা গোলাপি শাড়ি।

লোকটা ইশারায় মাসিকে ডাকল।

মাসি উঠে দাঁড়াল। একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হেঁটে এগিয়ে এল প্রিয়াংকাদের কাছে।

প্রিয়াংকা লক্ষ করল, মাসি পানপরাগ জাতীয় পানমশলা চিবোচ্ছে। গাল ফোলা, ঠোঁট শক্ত করে চেপে আছে।

লোকটা বলল, 'মেয়েটা রইল। ঠিকমতো নজর রেখো। দেখো, কোনও অসুবিধে না হয়—।'

মাসি 'উঁ' শব্দ করে মাথা হেলাল। প্রিয়াংকাকে আপাদমস্তক খরচোখে জরিপ করল। ওর কেমন যেন অস্বস্তি হল।

লোকটা দু-আঙুলে টুসকি বাজিয়ে প্রিয়াংকার মনোযোগ চাইল। তারপর বলল, 'এবারে তোমার বাবার মোবাইল নম্বরটা ঝটপট দাও। আজ রাতে কথা বলতে হবে। তারপর দেখি কী বলে...তোমাকে ক'দিন এখানে রাখতে হয়...।'

প্রিয়াংকা ওর বাপির মোবাইল নম্বর বলল। লোকটা পকেট থেকে একটা সেলফোন বের করে বোতাম টিপে নম্বরটা স্টোর করে নিল।

প্রিয়াংকা কান্না-কান্না গলায় জিগ্যেস করল, 'আমাকে এখানে...নিয়ে... এসেছেন কেন?'

'বস জানে।' বলে লোকটা গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাসি পিছন-পিছন গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। প্রিয়াংকা লক্ষ করল দরজাটায় ভেতর থেকে খিল কিংবা ছিটকিনি লাগানোর কোনও ব্যবস্থা নেই।

মাসি আঙুল তুলে ওকে ইশারা করে বিছানাটা দেখাল। প্রিয়াংকা কোনও কথা না বলে বিছানার কাছে গিয়ে ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। তারপর ধপ করে বসে পড়ল। কান্নাটা ভেতর থেকে আরও জোরে উথলে উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রিয়াংকা শব্দ করে কেঁদে উঠল। কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে ওর শরীরটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

কান্নার মধ্যেই প্রিয়াংকা প্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ পেল। একবার নয়—বেশ কয়েকবার। ওর মনে হল, জায়গাটা নিশ্চয়ই এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। ওর মাথার মধ্যে নানান চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে-খেয়ে গুলিয়ে যাচ্ছিল।

বাপি নিশ্চয়ই ওর খোঁজ না পেয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে। হয়তো পুলিশকেও জানিয়েছে। পুলিশ ওর কলেজ, বন্ধুদের বাড়ি, আত্মীয়ের বাড়ি—কোনও জায়গাতেই বোধহয় খোঁজ করতে বাকি রাখেনি। তারপর তারা হয়তো কিডন্যাপারদের ফোনকলের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এরা মণিরামকে কোথায় সরাল, কী করেই-বা সরাল? প্রিয়াংকাদের গাড়িটাই-বা এখন কোথায়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রিয়াংকার উথালপাথাল মন শান্ত হয়ে এল। ও বুঝল রাগ বা জেদ দেখিয়ে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। আর কান্নাকাটি করেও কোনও লাভ নেই। বরং কীভাবে বাপিকে একটা খবর দেওয়া যায় সেই বুদ্ধি বের করতে হবে।

ওকে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে সেই কারণটা প্রিয়াংকা মনে-মনে বুঝতে চাইছিল। ময়দানে খুনের ঘটনাটা আটদিন আগের কথা। ভয়ে ব্যাপারটা ও কাউকে জানায়নি—বাপিকেও না, সোনমকেও না। শুধু সেই মাইক্রো-ক্যাসেটটা হ্যান্ডিক্যাম থেকে বের করে একটা অদ্ভুত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। বহুবার ভেবেছে, বাপিকে সঙ্গে নিয়ে ও থানায় যাবে—সব জানাবে। কিন্তু তারপরই একটা ভয় ওকে থামিয়ে দিয়েছে। যদি পুলিশ ওদের ঝামেলায় জড়িয়ে দেয়, হ্যারাস করে?

বেশ মনে আছে, সেইদিনটা খুব ভয়ে-ভয়ে দুরুদুরু বুকে কাটিয়েছে ও। রাতে সোনমের পাশে শুয়ে সারাটা রাত ছটফট করেছে—একফোঁটা ঘুমোতে পারেনি। পরদিন খবরের কাগজে ময়দানে খুনের খবরটা ছোট্ট করে বেরিয়েছে : '*...অজ্ঞাতপরিচয় একজন মাঝবয়েসি লোকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে...।*'

হতে পারে এই লোকগুলো সেই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই সেই মাইক্রো-ক্যাসেটটার খোঁজে প্রিয়াংকাকে তুলে এনেছে। কিন্তু এরা প্রিয়াংকার খোঁজ পেল কী করে? কীভাবে জানতে পারল ও কোন কলেজে পড়ে, কখন কোন গাড়ি করে বাড়ি ফেরে? তবে যে-তিনজন লোককে প্রিয়াংকা এ পর্যন্ত দেখেছে—দুজন কিডন্যাপার আর ড্রাইভার—তাদের কাউকেই ও চেনে না।

তবে কি এই লোকগুলো ময়দানের খুনের ব্যাপারটার কিছুই জানে না? স্রেফ ওর বাপির কাছ থেকে মোটা টাকা আদায়ের জন্য ওকে ধরে নিয়ে এসেছে?

প্রিয়াংকার মাথার ভেতরে আবার চিন্তার ঝড় বইতে শুরু করল। ও মাসির দিকে আড়চোখে তাকাল। ওকে বিছানায় পাঠানোর পর থেকে মাসি দেওয়ালের কাছে গিয়ে ছবি হয়ে বসে আছে। চোখ দুটো আধবোজা। ওর নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বোঝা যায়, ও জানে প্রিয়াংকার এখান থেকে পালানোর কোনও পথ নেই। এই ঘরটার দরজা খোলা থাকলেও বাড়ির সদরে নিশ্চয়ই তালা দেওয়া আছে।

প্রিয়াংকা ওর ব্যাগটা টেনে নিল। জিপ খুলে একটা খাতা আর পেন বার করে নিল। তারপর এ পর্যন্ত যা-যা হয়েছে, যা-কিছু ও দেখেছে, সব ইংরেজিতে লিখে ফেলল। এমনকী লোকগুলোর চেহারার বর্ণনাও বাদ দিল না।

ও ঠিক করল, যখনই ও প্লেনের শব্দ শুনবে তখনই সময়টা টুকে রাখবে। এই তথ্যটা পরে কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

লেখার কাজ যখন শেষ হল তখন প্রিয়াংকার মন অনেক শান্ত হয়ে গেছে। প্রথমদিকের ভয় আর মনখারাপের ঝোঁকটাও অনেক কমে গেছে।

ও খাতা-পেন রেখে উঠে দাঁড়াল। হাতঘড়িতে চোখ রাখল : আটটা দশ। তারপরই ওর নজর গেল ওর পাহারাদারের দিকে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা মূর্তিটা কখন যেন সজাগ হয়ে উঠেছে, পিটপিট করে প্রিয়াংকাকে দেখছে।

প্রিয়াংকা মাসিকে লক্ষ করে জিগ্যেস করল, 'এ জায়গাটা কোথায়? এয়ারপোর্টের কাছে মনে হচ্ছে...।'

মাসি মুখে কোনও জবাব দিল না। শুধু হাত ঘুরিয়ে বোঝাল, কে জানে কোথায়!

'আমাকে এখানে আটকে রেখেছে কেন? টাকার জন্যে?'

স্থির চোখে প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে থেকে আবার একই ভঙ্গিতে হাত ঘোরাল মাসি।

প্রিয়াংকা কাঁধ ঝাঁকাল। আচ্ছা বোবা-কালার পাল্লায় পড়া গেছে!

ও ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করল। কী করে যে সময় কাটায় এখন! দু-একটা গল্পের বই সঙ্গে থাকলে বেশ হত। কিংবা একটা কম্পিউটার থাকলে দিব্যি কম্পিউটার গেমস খেলা যেত।

প্রিয়াংকা এলোমেলোভাবে ঘোরাঘুরি করছিল আর ঘরটাকে খুঁটিয়ে জরিপ করছিল। দুটো চেয়ারকে পাশ কাটিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা টেবিলের কাছে পৌঁছল প্রিয়াংকা।

টেবিলটা ধুলো মাখা। একটা পায়া জোড়তালি দেওয়া। টেবিলের নীচে চার-পাঁচটা খালি সিমেন্টের বস্তা আর ছ'-সাতখানা ইট। কিন্তু তার পাশে ওটা কী?

একটা পুরোনো আমলের টেলিফোন।

কিন্তু টেলিফোনটা যে বাতিল সেটা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। হাতলের প্লাস্টিক কভারটা ভাঙা—কভারের বেশ খানিকটা উধাও। ভেতরের যন্ত্রপাতি দেখা যাচ্ছে। বেস ইউনিটটার অবস্থাও একইরকম—তবে নম্বর লেখা মেটাল ডায়ালটা এখনও অক্ষত আছে।

যন্ত্রটার সর্বাঙ্গে ধুলো। বোঝাই যায়, বহুকাল ওটা কেউ ব্যবহার করেনি। হ্যান্ডসেট থেকে বেরিয়ে থাকা টেলিফোনের তারটা মরা কেঁচোর মতো মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে।

মাসির দিকে একবার তাকাল প্রিয়াংকা। একটা প্লাস্টিকের ড্রামের পাশ দিয়ে মহিলার শরীরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। প্রিয়াংকা হঠাৎই একটা গান ধরল—'ঝুম বরাবর ঝুম—।' লক্ষ করল, মাসি সামনে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে প্রিয়াংকাকে একবার দেখল। তারপর তার মুখটা আবার ড্রামের আড়ালে সরে গেল।

গান গাইতে-গাইতে খানিকটা ঝুঁকে পড়ল প্রিয়াংকা। টেবিলের নীচ দিয়ে লাগোয়া দেওয়ালের দিকে তাকাল। টেলিফোন কানেকশানের একটা প্লাগ দেখা যাচ্ছে। সেটা থেকে তার উঠেছে দেওয়াল বেয়ে। তারপর একটা জানলার ফ্রেমের কাঠ ফুটো করে তারটা বেরিয়ে গেছে বাইরে।

এই ভাঙা টেলিফোনটা দিয়ে কিছু একটা করা যায় না?

প্রিয়াংকার বুকের ভেতরটা ধকধক করে উঠল।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করেই ও টুপ করে বসে পড়ল। কিন্তু গুনগুন করে গান করার ব্যাপারটা থামাল না। টেলিফোনের তারের ডগাটা ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল টেবিলের নীচে। তারপর তারের দুটো প্রান্ত প্লাগের গর্তে গুঁজে দিল।

এবার শরীরটাকে বেঁকিয়ে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। কানে চেপে ধরেই বুঝতে পারল যা ভেবেছিল তাই—কোনও ডায়াল টোন নেই—টেলিফোনটা ডেড। তারটা আবার খুলে দিয়ে টেবিলের নীচ থেকে ও বেরিয়ে এল।

গান গাইতে-গাইতেই আবার বিছানার কাছে ফিরে এল প্রিয়াংকা। আড়চোখে দেখল, মাসির কোনও হেলদোল নেই। ও সামান্য গলা তুলে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

দেওয়াল ঘেঁষে বসে থাকা পাথরের মূর্তি ড্রামের আড়ালে গুটখার পিক ফেলে বলল, 'দশটায় খেতে পাবে।'

প্রিয়াংকা বারবার করে বলল যে, ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে, কিন্তু মাসি আর কোনও জবাবই দিল না।

এমন সময় প্লেনের শব্দ পেল। ও তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এল। খাতায় সময়টা টুকে নিল। সবে আটটা দশ বাজে। কিন্তু খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। দশটা বাজতে এখনও ঢের দেরি। প্রায় দু-ঘণ্টা ওকে এই খিদে চেপে বসে থাকতে হবে। জীবনে কখনও এই হেনস্থা কল্পনাও করেনি প্রিয়াংকা। ওর চোখে জল এসে গেল। সেই অবস্থাতেই ওর মনে হল, টেলিফোনটা নিয়ে একটা মরিয়া চেষ্টা ওকে করতেই হবে। মনে-মনে কিডন্যাপার লোকগুলোর ওপরে ভীষণ রাগ হল ওর। কিছু একটা করে ওদের শায়েস্তা করা যায় না? ওই টেলিফোনটা...।

হঠাৎই ঘরের দরজা খুলে গেল।

রোগা মতন যে-লোকটা পিস্তল উঁচিয়ে ওকে ভয় দেখিয়েছিল সে ঘরে এসে ঢুকল। তার হাতে প্রিয়াংকার মোবাইল ফোন।

লোকটাকে দেখে মাসি উঠে দাঁড়াল। চটপটে পায়ে লোকটা প্রিয়াংকার কাছে এগিয়ে এল। মোবাইল ফোনটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'তোমার বাবা লাইনে আছে—কথা বলো।'

ফোনটা হাতে নিয়ে প্রিয়াংকা উঠে দাঁড়াল। ও 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে বাপি বলল, 'পিয়া! তুই ভালো আছিস তো?'

প্রিয়াংকা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। ওর মনে হল, কয়েকঘণ্টা নয়—যেন কয়েকবছর পর ও বাপির গলা শুনতে পেয়েছে। ও হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনেক—অনেক কথা ও বলতে চাইছিল, কিন্তু মুখ দিয়ে কান্না আর গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরোল না। আর দু-গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

প্রিয়াংকা জীবনে কখনও এরকম করে কাঁদেনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর ও শান্ত হল। ধরা গলায় বলল, 'বাপি...বাপি... আমাকে এরা এখানে আটকে রেখেছে। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও...শিগগির নিয়ে যাও। নইলে দিজ বাস্টার্ডস উইল কিল মি...।'

'পিয়া, লিসন কেয়ারফুলি। ওরা আমার কাছে টাকা চায়নি। কী একটা মাইক্রো-ক্যাসেট চাইছে। ওটা নাকি তোর কাছে আছে। ওটা দিলেই ওরা তোকে ছেড়ে দেবে। পিয়া, তুই আমাকে বল ওটা কোথায় রেখেছিস—আমি ওদের দিয়ে দিচ্ছি। তারপরই ওরা তোকে ছেড়ে দেবে। শিগগির বল, ওটা কোথায় আছে...।'

'বললেও তুমি খুঁজে পাবে না, বাপি। ওটা আমি এমন জায়গায় রেখেছি যে, আমি নিজে না বের করে দিলে আর কেউ ওটা খুঁজে পাবে না। ইট ইজ অ্যাবসোলিউটলি ইমপসিবল।'

'তা হলে কী করি বল তো এখন!' বাপির গলা বিভ্রান্ত শোনাল, 'ওরা আমাকে তোর মোবাইল থেকে দু-তিনবার ফোন করেছে। বারবার একই কথা বলছে। বলছে...ওই ক্যাসেটটা না দিলে ওরা...ওরা তোকে...শেষ করে দেবে।' কথা বলতে-বলতে বাপির গলা ভেঙে গেল।

প্রিয়াংকার মধ্যে কী একটা যেন হয়ে গেল। ও শক্ত গলায় বলল, 'ক্যাসেটটা কোথায় রেখেছি মনে পড়ছে না, বাপি। আমি একদম ভুলে গেছি—।' তারপর হঠাৎই ওর কান্না পেয়ে গেল।

এক থাবা মেরে প্রিয়াংকার হাত থেকে মোবাইল ফোনটা ছিনিয়ে নিল লোকটা। বোতাম টিপে লাইন কেটে দিল।

প্রিয়াংকার চোখে জল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই ও দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, 'জানোয়ার—।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা সপাটে এক চড় কষিয়ে দিল ওর গালে। প্রিয়াংকা ছিটকে পড়ে গেল বিছানায়। ওর ফরসা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেছে। গালটা অসহ্য জ্বালা করছে। ও গালে হাত চেপে জ্বালাযন্ত্রণা কমাতে চাইল।

লোকটা দাঁত বের করে অসহায় প্রিয়াংকাকে দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'মাইক্রো-ক্যাসেটটা বসের চাই। নয়তো তোমাকে ছিবড়ে করে ছাড়ব। তুমি খরচ হয়ে গেলে তোমার বাপি আর সোনমের কী হাল হবে ভেবে দেখেছ!' লোকটা একবার মাসির দিকে তাকাল, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বসকে রিপোর্টটা দিই...তারপর দেখি তোমাকে নিয়ে কী করতে বলে...।'

লোকটা হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল। কী একটা যেন আচমকা মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে চটপট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রিয়াংকা কষ্ট পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে ওর ভেতরে একটা রাগ টগবগ করে উঠল। লোকগুলো ভেবেছে কী! যখন খুশি যাকে-তাকে খুন করবে, যখন খুশি যাকে-তাকে কিডন্যাপ করবে। নাঃ, পালটা কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা...।

বিছানায় শুয়ে নানান কথা ভাবছিল প্রিয়াংকা, আর মাঝেমধ্যেই মায়ের স্মৃতি মনে পড়ছিল, বাপির কথা মনে পড়ছিল, মনে পড়ছিল সোনমের কথা। আর বুকের ভেতরের কষ্ট আর যন্ত্রণা কান্না হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।

এইভাবে শুয়ে থাকতে-থাকতে কখন যেন ও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মাসির ধাক্কায় ওর ঘুম ভাঙল। ও ধড়মড় করে উঠে বসল। অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। টিউবলাইটের আলো চোখে পড়ায় চোখ পিটপিট করে তাকাল।

মাসি বলল, 'খেয়ে নাও—খাবার এনেছি...।'

মাসির ইশারা মতো তাকাল প্রিয়াংকা। ওর বিছানার কাছেই মেঝেতে স্টিলের থালা আর গ্লাস। থালায় চারখানা রুটি। তার সঙ্গে কী একটা ভাজা আর সবজি।

খাবারের চেহারা দেখে গা গুলিয়ে উঠল ওর। এইরকম খাবার ও জীবনে কখনও খায়নি। কিন্তু এখন তো আর কোনও বিকল্প নেই!

প্রিয়াংকা খাওয়া শুরু করতেই মাসি দেওয়ালের কাছে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। সেখানে প্রাণহীন স্ট্যাচুর ভঙ্গিতে বসে নিজের খাওয়া শুরু করল। আর মরা মাছের চোখে প্রিয়াংকাকে দেখতে লাগল।

প্রিয়াংকার খাওয়া শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আগের লোকটা আবার এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে মাসি অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। প্রিয়াংকা বিছানায় বসে ছিল, বসেই রইল।

লোকটা মাসির দিকে তাকালই না। সোজা প্রিয়াংকার কাছে এসে বলল, 'ক্যাসেটটা কোথায় রেখেছ মনে পড়েছে?'

প্রিয়াংকা চোয়াল শক্ত করে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

লোকটা আবার একই কথা জিগ্যেস করল।

প্রিয়াংকা কাঠ-কাঠ গলায় বলল, 'মনে পড়েনি—মনে পড়বে না।'

লোকটা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল—কী যেন ভাবতে লাগল। তারপর পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপে কার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

'হ্যালো—।'

...

'না, এখনও গোঁ ধরে রয়েছে। কোনও চেঞ্জ নেই।'

...

'হ্যাঁ—সেটা ঠিক। ও ছাড়া আর কেউ জানে না ক্যাসেটটা কোথায়। তা হলে একে খালাস করে দিলে আর কোনও প্রবলেম নেই। ক্যাসেটটা আর কেউ হাতে পাবে না। এটা ছাড়া আর কোনও...হ্যাঁ, হ্যাঁ—দিচ্ছি—।'

মোবাইল ফোনটা প্রিয়াংকার দিকে এগিয়ে দিল লোকটা। চাপা গলায় বলল, 'নাও, বসের সঙ্গে কথা বলো...।'

একটু ইতস্তত করে প্রিয়াংকা ফোনটা নিল। 'হ্যালো' বলল।

সঙ্গে-সঙ্গে ওপাশ থেকে একটা মিহি গলা কথা বলতে শুরু করল। প্রিয়াংকার মনে হল, কেউ যেন ইচ্ছে করে গলাটাকে মেয়েলি করে কথা বলছে। যাতে ও আসল গলার স্বরটাকে চিনতে না পারে।

সেই গলা তখন বলছে,

'প্রিয়াংকা, তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি বলে মার্জনা চাইছি...।'

প্রিয়াংকার মনে হল, জীবনে কখনও ও এত মোলায়েম স্নেহমাখানো কথা শোনেনি। কোনও জাদুকর কাউকে হিপনোটাইজ করার সময় যেভাবে ধীরে-ধীরে কথা বলে, এই কথাগুলোর ঢং ঠিক সেইরকম।

'...কিন্তু কী করব বলো, আমার যে আর কোনও কর্মপন্থা জানা নেই। তুমি কি চাও, একটা হিরে-চোরকে বিনাশ করার জন্যে আমার সাজা হোক? আমি জানি, তুমি সেটা চাও না। লক্ষ্মীসোনা মেয়ে, এরকম গোঁয়ার্তুমি করে না। এতে কী লাভ বলো? তোমার মতো একটা সুন্দরী ফুটফুটে মেয়েকে অপচয় করতে আমার যথেষ্ট মনোকষ্ট হবে। তুমি অকপটে প্রকাশ করে দাও কোথায় আছে সেই মাইক্রো-ক্যাসেটটা। বলে ফ্যালো, সোনা মেয়ে আমার, প্লিজ, বলে ফ্যালো...।'

প্রিয়াংকা যেন একটা ঘোরের মধ্যে এই মিষ্টি-মিষ্টি কথাগুলো শুনছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর কানে কে যেন মধু ঢালছে। স্নেহ আর মমতা ঝরে পড়ছে লোকটার গলায়। অথচ এই লোকটাই বস!

প্রিয়াংকা বলল, 'আমাকে একটু ভাবার সময় দিন, প্লিজ...।'

মিহি গলা হেসে উঠল : 'এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, কেউ আর তোমাকে উত্ত্যক্ত করবে না। তুমি প্রশান্ত মনে বিশ্রাম নাও, কেমন? এবার ফোনটা আমার লোকের হাতে প্রত্যর্পণ করো...।'

'প্রত্যর্পণ করো'! তখন থেকে কীসব অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ মিশিয়ে কথা বলছে এই বস লোকটা! 'মার্জনা', 'কর্মপন্থা', 'বিনাশ', 'অপচয়', 'মনোকষ্ট'—আরও কত কী!

প্রিয়াংকা মোবাইলটা লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিল।

লোকটা ফোন কানে দিয়ে কিছুক্ষণ কী শুনল। তারপর ছোট্ট করে 'ও. কে., বস,' বলে বোতাম টিপে ফোন পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল।

'এখন ঘুমোও—কাল সকালে তোমার ব্যাপারে ডিসিশান জানা যাবে। গুড নাইট।'

লোকটা চটপট পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মাসি পা টেনে-টেনে দরজা পর্যন্ত গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর প্রিয়াংকার দিকে তাকিয়ে 'শুয়ে পড়ো—' বলে দেওয়ালের কাছে গিয়ে নিজের বিছানা পাতার কাজ শুরু করল।

একটু পরেই মাসি কয়েকবার হাই তুলে শুয়ে পড়ল। প্রিয়াংকা বুঝল, ঘরের আলো জ্বালাই থাকবে—কারণ, তাতে মাসির নজরদারির সুবিধে হবে। তবে এটা একদিক থেকে ভালোই হল। প্রিয়াংকা মাঝরাতে সুযোগমতো উঠে ওই ভাঙা টেলিফোনটা নিয়ে খুটুরখুটুর করতে পারবে। যদি কপালজোরে বাপিকে একটা ফোন করতে পারে। একবার যোগাযোগ করতে পারলেই...।

বেডকভারটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে প্রিয়াংকা চুপচাপ শুয়ে পড়ল। আলোর দিকে পিছন ফিরে ওর সাইডব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে! ওর শরীর ক্লান্ত হলেও একটা চাপা উত্তেজনার ঢেউ বুকের ভেতরে দপদপ করতে লাগল।

*

প্লেন উড়ে যাওয়ার শব্দ পেল প্রিয়াংকা। ওর ইচ্ছে ছিল, পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নিয়ে বিদেশে যাবে। কত নতুন-নতুন দেশে ঘুরে বেড়াবে। এখন মনে হচ্ছে, স্বপ্ন স্বপ্নই। কাল সকালে এরা হয়তো ওকে খতমই করে দেবে। কিন্তু ক্যাসেটটা কোথায় লুকোনো আছে সেটা বলে দিলেই কি এরা ওকে ছেড়ে দেবে? মনে হয়, না। ক্যাসেটটা হাতে পাওয়ার জন্য এরা এখন এইসব কথা বলছে। পরে উলটো কাজ করবে। খবরের কাগজে এইরকম বহু ঘটনার কথা পড়েছে ও। সিনেমাতেও দেখেছে।

নাঃ, ওদের হাতে মারা যাওয়ার আগে প্রিয়াংকা ওই ভাঙা টেলিফোনটা নিয়ে একটা মরিয়া চেষ্টা করে দেখবে। মরার আগে কিছুতেই ও মরবে না।

অনেক ডাকাডাকি করেও ঘুম প্রিয়াংকার কাছে আসেনি। ও চোখে হাত চাপা দিয়ে আলো আড়াল করে শুয়ে ছিল। আর মাঝে-মাঝেই মাসির দিকে দেখছিল।

একসময় ও মাসির নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। তখন ধীরে-ধীরে উঠে বসল বিছানায়। তারপর খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে চলে গেল টেবিলের নীচে রাখা টেলিফোনটার কাছে। খোলা তারটা প্লাগে গুঁজে

দিয়ে যন্ত্রটা নিয়ে কারিকুরি করতে লাগল। একবার ডায়াফ্রামটা খুলে ইলেকট্রোম্যাগনেটটা চেক করল। তারপর রিসিভারটা কানে দিয়ে অন্যান্য তার, লিভার, জয়েন্ট নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। ডায়ালটোনের বদলে একটা কড়কড় শব্দ কাটা-কাটাভাবে শোনা গেল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর প্রিয়াংকা হতাশ হয়ে বিছানায় ফিরে এল। ওর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা কোনও কাজে লাগাতে পারল না দেখে নিজের ওপর বিরক্ত হল। কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না।

সারা রাত ধরে বেশ কয়েকবার টেলিফোন-অভিযান চালাল। একবার চেষ্টা করে, তারপর বিছানায় ফিরে এসে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার চেষ্টা চালায়...।

এইভাবে যখন ও ভীষণ হতাশ এবং ক্লান্ত, তখনই কী করে যেন ও হঠাৎ করে ডায়ালটোনের শব্দ শুনতে পেল। ওর হাত- ঘড়িতে তখন সাড়ে ছ'টা বাজে। জানলা বন্ধ থাকায় ভোরের আলো চোখে পড়ার উপায় নেই। কিন্তু পাখির ডাক কানে আসছে। কয়েকটা ডাক চিনতে পারল প্রিয়াংকা। বউ কথা কও, বুলবুলি, কোকিল—আর কাক তো আছেই।

ডায়ালটোন পাওয়ামাত্রই প্রিয়াংকার বুকের ভেতরটা টিপটিপ করে উঠল। ও কাঁপা হাতে বাপির মোবাইল নম্বরটা ডায়াল করল।

একটু পরেই অবাক হয়ে শুনল, ওপাশে রিং বাজছে।

একজন পুরুষের গলা ফোন ধরে 'হ্যালো' বলতেই প্রিয়াংকা উদভ্রান্ত স্বরে বলে উঠল, 'কে, বাপি? আমি পিয়া বলছি—।'

'বাপি?' ও-প্রান্ত থেকে অচেনা গলায় কে যেন বলে উঠল, 'সরি, রং নাম্বার...।'

।।পাঁচ।।

মিমোর চেনা সেই অফিসারের নাম অনুজ দাশগুপ্ত।

ডিউটি অফিসার পালচৌধুরীর বক্তব্য শোনার পর তিনি মিমো আর বাবলির কথা ধৈর্য ধরে শুনলেন। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে পরপর চার-পাঁচটা ফোন করলেন। তার মধ্যে প্রথম ফোনটা যে মানিকতলা থানার ও.সি-কে করলেন সেটা ওঁর কথাবার্তা শুনেই মিমো বুঝতে পারল।

দাশগুপ্ত ডিউটি অফিসারকে বললেন, 'ইমপরট্যান্ট ডেটাগুলো একটা ডায়েরিতে টুকে নিয়ে মহেন্দ্র শর্মাকে বলুন প্লেন ড্রেসে তৈরি হয়ে নিতে। ডেটাগুলোর একটা কপি মহেন্দ্রকে দিয়ে দিন।—আমাদের পাঁচমিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে। দেরি করলে মেয়েটাকে হয়তো বাঁচানো যাবে না।'

পালচৌধুরী হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দাশগুপ্ত ওঁর টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মিমোকে বললেন, 'মিমো, তোমার মোবাইলটা আমাদের সঙ্গে থাকা দরকার—কারণ, প্রিয়াংকার টেলিফোনটা গোলমেলে থাকায় ও আর কারও ফোনে কানেক্ট করতে পারছে না—শুধু তোমার ফোনেই লাইন লাগছে...কী যে করি!'

মিমোর মনে একটা সাধ ডানা মেলে দিল। ও অনেকসময় ভেবেছে, ও বড় হয়ে পুলিশ হবে—কিন্তু ভয়ে কখনও কথাটা মাকে বলেনি। এখন সাহস করে সেই সাধটা উগরে দিল।

'আমাকে আপনার সঙ্গে নেবেন, স্যার?'

অনুজ মুখ ফিরিয়ে মিমোকে দেখলেন। বয়েস সতেরো কি আঠারো হবে। গোঁফের রেখা সবে জানান দিচ্ছে। চোখে চকচক করছে প্রত্যাশা, আর পুলিশি অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দীপনা। এ-বয়েসটা এরকমই।

প্রিয়াংকা মেয়েটা সকাল থেকে মিমোর সঙ্গেই কথা বলেছে। মাঝে একবার শুধু ডিউটি অফিসার পালচৌধুরীর সঙ্গে। মিমোর সঙ্গে মেয়েটা হয়তো সহজভাবে কথা বলতে পারবে। ও গাড়িতে সঙ্গে থাকলে মন্দ কী!

কপালে ভাঁজ ফেলে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করার পর দাশগুপ্ত বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো—।'

কথাটা বলামাত্রই মিমো আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, 'থ্যাংক য়ু, স্যার। থ্যাংক য়ু, স্যার।'

আর বাবলি দাশগুপ্তর পায়ের কাছে হাতজোড় করে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল। কাতর গলায় বলল, 'আমাকে বাদ দেবেন না, স্যার। সক্কাল থেকে আমি ওর সঙ্গে আছি, স্যার। দয়া করুন, স্যার, দয়া করুন—প্লিজ!'

'আরে, কী করছ! ওঠো, ওঠো—' বাবলিকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন দাশগুপ্ত। আপনমনেই বললেন, 'কাজটা বেআইনি। তবে তোমাদের দুজনকে উইটনেস হিসেবে রেকর্ডে দেখিয়ে দেব।' তারপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন, 'চলো, দুজনেই চলো। তবে কাজটায় কিন্তু রিসক আছে। যা অর্ডার করব অক্ষরে-অক্ষরে শুনবে। কোনও জায়গায় এনকাউন্টারের পসিবিলিটি থাকলে যেখানে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে বলব সেখানেই স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—।'

দাশগুপ্তর কথায় মিমো আর বাবলি এতবার করে ঘাড় কাত করতে লাগল যে, দাশগুপ্তর হাসি পেয়ে গেল।

এরপর বাকি ছিল মিমো আর বাবলির বাড়িতে খবর দেওয়া।

মিমো ওর মাকে ফোন করল। লাইন পেতেই দাশগুপ্ত ওর মায়ের সঙ্গে কথা বললেন।

'...না, না, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। একটা ইমপরট্যান্ট আইডেন্টিফিকেশানের কাজে ওকে সঙ্গে নিচ্ছি। কোনও ভয় নেই। সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে। আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করবে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ—সন্ধের আগেই বাড়ি ফিরে আসবে। মাঝে-মাঝে ফোনে আপনার সঙ্গে কথা বলবে...।'

বাবলি বলল যে, ওর বাড়িতে ফোন-টোন নেই। বরং জিমে একটা মেসেজ দিয়ে রাখলেই হবে যে, ও একজন বন্ধুর বাড়িতে গেছে। মা কিংবা বাবা যদি জিমে খোঁজ করতে আসে তা হলে পঞ্চাদা যা বলার বলে দেবে।

দাশগুপ্ত ওদের 'একমিনিট—আসছি', বলে চলে গেলেন।

একটু পরেই সাদা পোশাকে তৈরি হয়ে ফিরে এলেন। ডান হাতে ধরা একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ডাবল অ্যাকশান ০.৩৮ ক্যালিবারের চিফস স্পেশাল রিভলভার। সেটা জামা তুলে কোমরের কাছে গুঁজে নিলেন।

মহেন্দ্র শর্মা নামের একজন অফিসার মিমো আর বাবলির কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দোহারা ফরসা চেহারা। মাথায় লম্বা-লম্বা চুল। ধারালো চোখ-মুখ। পানের রসে ঠোঁট রঙিন।

দাশগুপ্ত ওঁকে জিগ্যেস করলেন, 'আর্মস নিয়েছ তো?'

মহেন্দ্র মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, নিয়েছেন।

'চলো—' বলে অনুজ থানার গেটের দিকে এগোলেন।

থানার বাইরে বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা লাল রঙের টাটা সুমো দাঁড়িয়ে ছিল। মিমো দেখল, সেটার গায়ে 'পুলিশ' লেখা নেই। সেটা করে ওরা সবাই রওনা হল। দাশগুপ্ত মিমোকে ড্রাইভারের পাশে বসালেন, তারপর নিজে জানলা ঘেঁষে বসলেন। বাবলি আর মহেন্দ্র বসলেন ওঁদের ঠিক পিছনের সিটে।

গাড়ি খালপাড়ের রাস্তা ধরে রওনা হতেই দাশগুপ্ত ড্রাইভারকে বললেন, 'এয়ারপোর্টের দিকে চলো—।'

কিছুক্ষণ পর দাশগুপ্তর মোবাইল ফোন বেজে উঠল। তিনি ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন। মিমো কান খাড়া করে কথাবার্তাগুলো শুনতে লাগল।

কথা শেষ হলে মিমো আর কৌতূহল চাপতে পারল না। সরাসরি জিগ্যেস করে বসল, 'স্যার, আর কোনও খবর পাওয়া গেল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাশগুপ্ত বললেন, 'নাঃ, সেরকম কোনও খবর নেই। প্রিয়াংকার বাড়ির ঠিকানা তো তুমি জানো...কনভেন্ট রোডে...মানে, এন্টালি থানা এলাকায়। সেখানে খবর দিয়েছিলাম। ওঁরা প্রিয়াংকার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ওর বাবার হাই কানেকশান থাকায় লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টও

ব্যাপারটার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখন ওরা মিস্টার মজুমদারের মোবাইল ফোন ট্যাপ করে কনভারসেশান টেপ করার জন্যে মোবাইল ফোন সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে কথা বলছে। হয়তো আর আধঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মধ্যে টেপ করার কাজটা শুরু হয়ে যাবে। দেখি, তখন যদি নতুন কিছু জানা যায়...।'

ওদের গাড়ি ততক্ষণে উলটোডাঙ্গার আন্ডারপাসে এসে পড়েছে। অফিসটাইমের জ্যাম ভালোমতোই জাঁকিয়ে বসেছে। বাস, প্রাইভেট কার, অটো সব একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। অকারণেই গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছে।

দাশগুপ্ত বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর মিমো মনে-মনে প্রিয়াংকার ফোনের জন্য অপেক্ষা করছিল। একইসঙ্গে ও টের পাচ্ছিল, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে সে-কথা অনুজ দাশগুপ্তকে বলতে পারছিল না।

জ্যামজট ছাড়িয়ে উলটোডাঙ্গা-ভি. আই. পি-র মোড়ে আসতে প্রায় মিনিট-পনেরো লেগে গেল। তারপরই বাঁ-দিকে ঘুরে বেশ ফাঁকা রাস্তা। রাস্তায় গাড়ি থাকলেও গতি আছে। দাশগুপ্ত চাপা গলায় পাইলটকে বললেন, 'ধনিয়া, থোড়া তেজ চালাও...।'

বাবলি হঠাৎ পিছনের সিট থেকে মিমোর কাঁধে চাপ দিল। মিমো ফিরে তাকাতেই ও মাথা ঝুঁকিয়ে মিমোর কানের কাছে মুখ এনে খুব চাপা গলায় বলল, 'বস, পেটে চুঁহা দৌড়চ্ছে। আর পারছি না। তুই স্যারকে বল।'

অনুজ দাশগুপ্ত মিমোর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার?'

মিমো আমতা-আমতা করে বলল, 'সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি—।'

'ওঃ হো!' একটু লজ্জা পেয়ে দাশগুপ্ত বললেন, 'ধনিয়া, একটা খাবারের দোকান দেখে গাড়ি লাগাও...।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টাটা সুমোটা লেক টাউনের মোড়ে এসে গেল। ধনিয়া বাঁ-দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে কয়েকটা খাবারের দোকানের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল।

আর ঠিক তখনই মিমোর মোবাইল বাজতে শুরু করল। মিমো মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকাল।

প্রিয়াংকা।

দাশগুপ্তর দিকে তাকিয়ে 'প্রিয়াংকা' বলে মিমো ফোন ধরে 'হ্যালো' বলল।

'ওঃ, অনেক কষ্টে আবার লাইন পেয়েছি।' ওপাশ থেকে প্রিয়াংকা চাপা গলায় বলল। 'যা বলছি, ভালো করে শুনুন...।'

'হ্যাঁ, বলুন...।'

'তিনটে লোক কলেজের কাছ থেকে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন ড্রাইভার। পথে গাড়ি চেঞ্জ করেছে। আমার চোখে পটি বেঁধে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি একটা গোডাউনের মতো ঘরে রয়েছি। একতলায়। ঘরে সিমেন্ট, বালি, স্টোনচিপের বস্তা। একজন মাসি আমাকে পাহারা দিচ্ছে। এখন মাসি ঘরে নেই। ট্রাই করতে-করতে লাইনটা হঠাৎ পেয়ে গেছি। এই জায়গাটা এয়ারপোর্টের কাছে। খুব ফ্রিকোয়েন্টলি প্লেন ওঠা-নামা করছে। তা ছাড়া একটু আগেই টয়লেটে যাওয়ার নাম করে আমি ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলাম। দিনের বেলা এই ফার্স্ট টাইম। যা-যা দেখেছি বলছি—ভালো করে শুনুন...।'

'শুনছি, বলুন...।' মিমো রুদ্ধশ্বাসে বলল।

'বাড়িটার সঙ্গে একটা বাগান মতো আছে। এ ছাড়া ইস্টের দিকে—মানে, সূর্য এখন যেদিকে—সেদিকে তাকিয়ে একটা সবুজ রঙের তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি—মানে, বাড়ির পেছনদিকটা—দেখতে পেয়েছি। বাড়িটার ছাদের ওপর একটা টাওয়ার—লাল আর সাদা রঙের। মানে, মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার যেমন হয়। আর এদের একজন বস আছে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে। আমার কাছে একটা মাইক্রো-ক্যাসেট চাইছে—হ্যান্ডিক্যামের মাইক্রো-ক্যাসেট। সেটা কোথায় আছে বলছি না বলে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। শুনছি, আজ সকালে আমার ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশান নেবে। যা করার জলদি করুন—।'

‘আপনি ভয় পাবেন না। পুলিশ আপনার বাবার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছে। ওঁর মোবাইল ট্যাপ করার ব্যবস্থা করেছে। এ ছাড়া পুলিশ অফিসাররা এর মধ্যেই গাড়ি নিয়ে আপনার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। সেই গাড়িতেই আমি বসে আছি—।’

‘আপনার নাম কী?’

মিমোর খেয়াল হল, সকাল থেকে নিজের নামটাই প্রিয়াংকাকে কখনও বলা হয়নি। ও ফোনে নাম বলল। তারপর আরও বলল, ‘ভয় পাবেন না। একটু ওয়েট করুন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আপনাকে খুঁজে বের করব...।’

হঠাৎই দাশগুপ্ত মিমোর কাছ থেকে মোবাইল ফোনটা চেয়ে নিলেন। প্রিয়াংকাকে বললেন, ‘প্রিয়াংকা, মানিকতলা থানার অ্যাডিশনাল ও.সি. অনুজ দাশগুপ্ত বলছি। য়ু আর রিয়েলি আ ব্রেভ গার্ল। যা করার আমরা করছি। এয়ারপোর্ট এরিয়ার থানাগুলোকে আমরা অ্যালার্ট করে দিয়েছি। লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যেই অ্যাকশানে নেমে পড়েছে। মনে হয় আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তোমাকে রেসকিউ করতে পারব। য়ু জাস্ট হ্যাং অন। ডোন্ট গেট নার্ভাস। আচ্ছা, ওই লোকগুলোর কাছে কি আর্মস আছে?’

‘হ্যাঁ—আছে। রিভলভার।’

‘ডোন্ট উয়ারি, প্রিয়াংকা। আমরাও তৈরি আছি। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। আর ড্রাস্টিক কিছু করতে যেয়ো না। ও. কে.?’

‘যা করার তাড়াতাড়ি করুন। আজ সকালের মধ্যেই আমার ব্যাপারে ওরা যা হোক একটা ফাইনাল ডিসিশান নিয়ে...এই রে, মাসি এসে গেছে।’ কথাটা বলেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিল প্রিয়াংকা।

দাশগুপ্ত মিমোকে মোবাইলটা ফেরত দিতে-দিতে জিগ্যেস করলেন, ‘মাসিটা কে?’

মিমো বলল। তারপর ওর সঙ্গে প্রিয়াংকার যা-যা কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানাল। পিছনের সিটে বসা মহেন্দ্র কাগজ পেন বের করে পয়েন্টগুলো সংক্ষেপে টুকে নিলেন।

মিমোর মুখে ‘মাইক্রো-ক্যাসেট’-এর কথা শুনে দাশগুপ্তর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি জিগ্যেস করলেন, ‘এই মাইক্রো-ক্যাসেটের ব্যাপারটা কী?’

মিমো ঠোঁট উলটে বলল, ‘কী জানি—জানি না। এই ফার্স্ট টাইম শুনছি। পরের বার ফোন করলে জিগ্যেস করব।’

গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ আলোচনার পর দাশগুপ্ত পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে মহেন্দ্রকে বললেন সামনের দোকানগুলো থেকে কিছু খাবার কিনে নিতে, আর সঙ্গে স্প্রাইটের একটা দু-লিটারের বোতল। তা হলে চলন্ত গাড়িতে বসেই খাওয়ার কাজটা সেরে নেওয়া যাবে। শুধু-শুধু আর সময় নষ্ট হবে না।

মহেন্দ্র খাবার কিনে নিয়ে ফিরে আসতেই ধনিয়া গাড়ি ছুটিয়ে দিল। অনুজ দাশগুপ্ত ওদের সবাইকে খাবার ভাগ করে নিতে বললেন। নিজেও নিলেন। তারপর খাওয়া শুরু করার আগেই কোথায় যেন ফোন করে কথা বলতে লাগলেন।

মিমো হাঁ করে দাশগুপ্তর কথাগুলো গিলতে লাগল। ওর ভেতরে-ভেতরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা চারিয়ে যাচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, দাশগুপ্ত অন্য কোনও থানার পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছেন।

‘...হ্যাঁ, আপনারা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এলাকায় চক্কর দিন। আর এটা লক্ষ রাখবেন—সবুজ রঙের তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি...বাড়ির ছাদে মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারের লাল আর সাদা রঙের টাওয়ার...মানে, ভোডাফোন, এয়ারটেল, টাটা ইন্ডিকম—এইসব কোম্পানির টাওয়ার। লোকেট করতে পারলেই লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে জানাবেন। ওরাই ব্যাপারটা সেন্ট্রালি ডিল করছে। ...এই অপারেশনটার নাম হচ্ছে ‘‘অপারেশান ব্ল্যাক’’। ওরা আমাকে এই অপারেশানের কো-অর্ডিনেটর

করেছে।...হ্যাঁ, আমিই ইন্সট্রাকশন দেব, তবে ইনফরমেশান আপনারা যা পাবেন সবই লালবাজারে জানাবেন। ওরা আমাকে সবসময় আপডেট করবে।...হ্যাঁ, হ্যাঁ—ও. কে.।'

দাশগুপ্ত ফোন শেষ করে সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। শুরু থেকেই মানুষটার বিশ্রাম নেই—একের পর এক ফোন—হয় আসছে, নয় যাচ্ছে। এখন একটু ফুসরত পেয়ে খেতে শুরু করলেন।

মিমো, বাবলি, ধনিয়া আর মহেন্দ্রর খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। স্প্রাইটের বোতলটা ওদের হাতে-হাতে ঘুরছিল। মহেন্দ্র এবার বোতলটা দাশগুপ্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন, স্যার।'

দাশগুপ্ত মুখ উঁচু করে খুব সাবধানে দু-ঢোঁক স্প্রাইট খেলেন। মিমো লক্ষ করল, স্যারের যাতে ওভাবে কোল্ড ড্রিংক খেতে অসুবিধে না হয় সেজন্য পাইলট ধনিয়া গাড়ির স্পিড অনেক কমিয়ে দিল।

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বললেন, 'স্যার, লগতা হ্যায় বহত সারে ক্রিমিনাল লোগ ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়ে আছে। প্রথমে তিনটে লোক—তারপর ওই ''বস''। আর পাহারাদার মাসি।'

দাশগুপ্ত একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, 'হুঁ। তার ওপর মহেন্দ্র, আর-একটা ব্যাপার নোট করো : কিডন্যাপাররা টাকা চাইছে না—চাইছে স্রেফ হ্যান্ডিক্যামের একটা মাইক্রো-ক্যাসেট।' বাইরের ছুটে যাওয়া রাস্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দাশগুপ্ত। তারপর আপনমনেই বললেন, 'কী আছে ওই মাইক্রো-ক্যাসেটে—যেটা এত ডেসপারেটলি ওদের দরকার?'

মিমো মনে-মনে ভাবল, মাইক্রো-ক্যাসেটটা কি কোনও গুপ্তধনের খোঁজ দেবে? নইলে একটা সামান্য ক্যাসেটের জন্য এত হইচই হাঙ্গামা!

ওদের টাটা সুমো বাগুইআটির জমজমাট মোড় পেরিয়ে গেল। জায়গাটা অটোরিকশো, সাইকেল, সাইকেল রিকশোয় একেবারে থিকথিক করছে। তার ওপরে অফিসটাইমের মানুষজন, গাড়ি, বাস আর মিনিবাসের ভিড়।

মোড়টা পেরোনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মিমোর মোবাইল বেজে উঠল। বাবলি চাপা গলায় বলে উঠল, 'প্রিয়াংকা!'

কিন্তু না—মিমোর মায়ের ফোন।

উতলা মাকে ঠান্ডা করতে মিমোকে বেশ কষ্ট করতে হল। ও বারবার করে বলল, পেট ভরে টিফিন খেয়েছে। কোনও ভয় নেই। 'স্যার' ওদের সঙ্গেই গাড়িতে বসে আছেন। মা যেন ওর জন্য বসে না থেকে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে নেয়।

মিমো ফোন ছাড়তে-না-ছাড়তেই দাশগুপ্তর ফোন বেজে উঠল।

এপাশের কথা শুনে বোঝা গেল, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ফোন।

'...ওরা মিস্টার মজুমদারকে ফোন করেছিল?...কার ফোন থেকে?...ও, প্রিয়াংকার ফোন থেকে?...কী বলছে?...ওঃ, সেই একই মাইক্রো-ক্যাসেট! তো লাইনটা ট্যাপ করা গেছে? বাঁচালেন—মেনি থ্যাংকস! কিন্তু প্রিয়াংকার মোবাইল থেকে করা কলটা কোন এরিয়ার টাওয়ারের টাই-আপ থেকে আসছে সেটা জানা যায়নি? মানে...এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কোন টাওয়ার-বেস-স্টেশান থেকে...মানে...। তাই নাকি? ও. কে. ও. কে.। আমরা এখুনি সেই টার্গেট ধরে এগোচ্ছি। আ লট অফ থ্যাংকস!...হ্যাঁ, হ্যাঁ—দরকার হলেই আমি রিং করে নেব। ডিসি ডিডি ওয়ান কেসটায় দারুণ ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন? সেটা আমাদের গুডলাক বলতে হবে। হ্যাঁ—ঠিক আছে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

দাশগুপ্তর ফোন শেষ হতেই মিমো আগ্রহ নিয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকাল। একদিকের কথাবার্তা শুনে ব্যাপারটা মোটামুটি বোঝা গেলেও শেষদিকের ওই টাওয়ারের ব্যাপারটা পুরো জানা যায়নি। তাই কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর ও জিগ্যেস করল, 'স্যার, মোবাইল ফোনে তো এরিয়ার নাম ওঠে। আর ভোডাফোন, এয়ারটেল—এসব কোম্পানির কাছে শুনেছি নানান মডার্ন যন্ত্রপাতি আছে। ওরা সব জানে।

কথাবার্তাও টেপ করে রাখতে পারে। প্রিয়াংকার মোবাইল ফোন থেকে কিডন্যাপাররা ওর বাবাকে ফোন করেছিল শুনলাম। তা হলে সেই কল থেকে...।'

হাতের ইশারায় মিমোকে থামিয়ে দিলেন দাশগুপ্ত। তারপর সামনের রাস্তার দিকে আড়চোখে নজর রেখে বললেন, 'ঠিকই প্রশ্ন করেছ। ওটা জানা গেছে। প্রিয়াংকা কৈখালি এরিয়ায় আছে। অন্তত ওর মোবাইল ফোনের টাওয়ার তাই বলছে। যদি না বদমাশগুলো আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে ওর ফোনটা নিয়ে কৈখালি এলাকায় এসে ফোন করে থাকে। প্রিয়াংকার মোবাইলে ভোডাফোনের কানেকশান। ওরা নিজেদের ডিপার্টমেন্টে এনকোয়ারি করে কৈখালি এরিয়ায় ওদের টাওয়ারটা এগজ্যাক্টলি কোন বাড়ির ছাদে বসানো আছে সেটা চেক করে একটু পরেই জানাচ্ছে। ততক্ষণে আমরাও ট্রাই করে দেখি...।'

ওদের গাড়ি তেঘরিয়ার নতুন ফ্লাইওভারের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। সামনে ফাঁকা মসৃণ রাস্তা। গাড়ি ঘণ্টায় নব্বইতে চলছে। জানলা দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে। মহেন্দ্রর লম্বা চুল পাখির মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনুজ দাশগুপ্ত আবার মুখ খুললেন। পাইলটকে লক্ষ করে বললেন, 'ধনিয়া, আর-একটু পরেই আমরা কৈখালির মোড়ে এসে পড়ব। ওই মোড়ে ডানদিক নেবে। তারপর চিড়িয়ামোড় পার করে গাড়ি সাইড করবে।'

পাইলট ধনিয়া গাড়ি চালাতে-চালাতেই ঘাড় নাড়ল।

দাশগুপ্ত এবার মোবাইল ফোন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বোতাম টিপে ফোন করতে শুরু করলেন।

'হ্যালো, ইন্সপেক্টার অনুজ দাশগুপ্ত বলছি। অপারেশান ব্ল্যাকের কো-অর্ডিনেটর।...কৈখালি এরিয়া থেকে কিডন্যাপাররা প্রিয়াংকার বাবাকে কনট্যাক্ট করেছিল। আমরা চিড়িয়ামোড়ের কাছে যাচ্ছি। আপনারাও কনভার্জ করুন। তারপর তিনতলা সবুজ রঙের ফ্ল্যাটবাড়ি, মোবাইল ফোনের টাওয়ার—রেড অ্যান্ড হোয়াইট—আর লাস্ট পয়েন্টার হল সিমেন্ট, বালি, স্টোনচিপের গোডাউনে গ্রাউন্ড ফ্লোরে মেয়েটা রয়েছে। পসিবলি কোনও বিল্ডার, মানে, সিভিল কন্ট্রাক্টরের বাড়ি। সেই বাড়িতে বিল্ডারের অফিসও থাকতে পারে। তবে সার্ভিস প্রোভাইডারের—মানে, ভোডাফোন কোম্পানির কাছ থেকেও যখন-তখন আমরা মোবাইল টাওয়ারটার এগজ্যাক্ট লোকেশান পেয়ে যেতে পারি। পেলেই আপনাদের ইনফরম করব।...আপনারা কেয়ারফুলি কনভার্জ করুন। লালবাজার থেকেও গাড়ি আসছে। টপ লেভেল থেকে ইনস্ট্রাকশন আছে, যে-করে-হোক মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। দরকার হলে এনকাউন্টার করতে হবে। তবে আমি ফাইনাল ''ও. কে.'' সিগন্যাল দেওয়ার পর। ...হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওভার অ্যান্ড আউট।'

গাড়ি কৈখালির মোড়ে এসে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকল। অনুজ দাশগুপ্ত মহেন্দ্র শর্মাকে লক্ষ করে বললেন, 'মহেন্দ্র, আর্মস রেডি রাখবে। লোকগুলো মনে হয় ডেঞ্জারাস। যদি দরকার হয়, শুট টু কিল।'

ছোট্ট করে হাসলেন মহেন্দ্র। বললেন, 'আপ বেফিকর রহিয়ে, স্যার। সোজা দু-চোখের মাঝখানে...।'

মহেন্দ্রর কথায় মিমো ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠল। মহেন্দ্র কত সহজে দু-চোখের মাঝখানে গুলি করে ক্রিমিনাল খতম করার কথা বলছেন! মিমো টের পেল ওর বুকের ভেতরে টিপটিপ শব্দ শুরু হয়ে গেছে।

চিড়িয়ামোড় যতই এগিয়ে আসছিল, অনুজ দাশগুপ্ত ততই ওঁর মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন। ক্রমশ উত্তেজনার পারা যে বাড়ছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

চিড়িয়ামোড়ে পিচের রাস্তার বাঁকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওদের টাটা সুমো বাঁ-দিকে বাঁক নিল। তারপর আবার ডানদিকে। তারপর বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাশগুপ্ত ধনিয়াকে গাড়ি সাইড করতে বললেন। ধনিয়া গাড়ি থামাতেই অনুজ দাশগুপ্ত নেমে পড়লেন। ওঁর ইশারায় মিমো, বাবলি আর মহেন্দ্রও নামলেন।

দাশগুপ্ত আপনমনেই বিড়বিড় করলেন, 'সবুজ রঙের তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ি, তার সঙ্গে মোবাইল ফোনের টাওয়ার...।' তারপর মহেন্দ্রকে লক্ষ করে বললেন, 'শর্মা, চলো দোকান-টোকানগুলোয় জিগ্যেস করি—কোথায় আছে ওই ফ্ল্যাটবাড়ি আর ওই টাওয়ার। যদি কপাল ভালো থাকে তা হলে এর মধ্যেই হয়তো ভোডাফোন কোম্পানি থেকে টাওয়ারের ইনফরমেশান এসে পড়বে...।'

মিমো বলল, 'স্যার, আমি আর বাবলিও একটু এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে খোঁজ করি?'

অনুজ ঠোঁট কামড়ে কয়েক লহমা কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বি কেয়ারফুল—বেশি দূরে যেয়ো না। কোনও প্রবলেম হলেই গাড়িতে ফিরে আসবে। তা ছাড়া যে-কোনও সময় আমরা টাওয়ারটার খোঁজ পেয়ে যেতে পারি...।'

মিমো ঘাড় কাত করে বলল, ঠিক আছে। তারপর ও আর বাবলি টাওয়ার আর ফ্ল্যাটবাড়ির সন্ধান করতে রওনা হয়ে গেল।

রাস্তার দুপাশে ছোট-বড় দোকান। একটা বড়সড় মিষ্টির দোকানে গিয়ে বাবলি টাওয়ারটার কথা জিগ্যেস করল। দোকানদার এমনভাবে ওর মুখের দিকে তাকাল যে, মিমোর মনে হল ভদ্রলোক মঙ্গলগ্রহের কিম্ভূতকমাকার এক প্রাণী দেখছে। তাই ওরা আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল।

এরপর একটা স্টেশনারি দোকান আর একটা ওষুধের দোকানে খোঁজ করে হতাশ হওয়ার পর ওরা একটা মোবাইল ফোনের দোকান খুঁজে পেল।

মিমো বলল, 'এই দোকানটায় নিশ্চয়ই ঠিক খবর পাওয়া যাবে।'

দোকানটায় ঢুকে সবে জিগ্যেস করতে যাবে, এমন সময় মিমোর মোবাইল বেজে উঠল।

প্রিয়াংকার ফোন ভেবে ও চটপট বোতাম টিপে ফোন কানে চেপে 'হ্যালো' বলল।

ফোনটা করেছেন অনুজ দাশগুপ্ত।

'মিমো, এক্ষুনি গাড়িতে চলে এসো। আমরা টাওয়ারটার খোঁজ পেয়ে গেছি। কুইক।'

সঙ্গে-সঙ্গে মিমো আর বাবলি পিছনে ফেলে আসা রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করল।

যখন ওরা টাটা সুমোর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে তখনই প্রিয়াংকার ফোন এল।

'হ্যালো...হ্যালো...প্রিয়াংকা বলছি...।'

'বলুন—।'

টেলিফোনে এমন কড়কড় শব্দ হচ্ছিল যে, মিমোর ভয় হল লাইনটা এক্ষুনি কেটে না যায়।

'আপনারা কোথায়?'

'আপনার আস্তানার খুব কাছাকাছি।'

'ওরা আমাকে শিফট করার কথা ভাবছে। শুনলাম, এক্ষুনি গাড়ি আসবে। তা ছাড়া মাসির সঙ্গে টাকাপয়সার হিসেব মেটাচ্ছে। আপনারা তাড়াতাড়ি করুন।'

'মনে হয় আর দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আপনার কাছে পৌঁছে যাব।'

'হাতে আর বেশি সময় নেই। ওই ''বস'' লোকটা আবার ফোন করেছিল। ক্যাসেটটা ওর চাই-ই চাই। আমার ভীষণ ভয় করছে। আর কতক্ষণ এভাবে টেনশান নিয়ে থাকতে পারব জানি না। প্লিজ, তাড়াতাড়ি করুন...।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—করছি। কিন্তু ওই ক্যাসেটটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? কী আছে ওই ক্যাসেটে?' কৌতূহল চাপতে না পেরে জানতে চাইল মিমো।

'সরি। আপনি আমার অনেক উপকার করছেন কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওই ক্যাসেটটায় কী আছে, ওটা কোথায় রেখেছি—এসব কাউকেই বলব না। এগুলোই আমার বেঁচে থাকার লাইসেন্স। আগে এখান থেকে পুলিশ আমাকে রেসকিউ করুক—আমি স্টেবল লাইফে ফিরে যাই—তারপর টপ লেভেলে ওই ক্যাসেট জমা দেব...।'

প্রিয়াংকার কথাবার্তায় একটা জেদি ভাব ছিল। সেটা বুঝতে পেরে মিমো আর ঘাঁটাল না।

এমন সময় একটা প্লেনের শব্দ শোনা গেল। কাছেই এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্লেন আকাশে উড়েছে।

প্রিয়াংকা বলল, 'একমিনিট ওয়েট করুন। একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে—বড্ড শব্দ হচ্ছে—কোনও কথা শোনা যাবে না...।'

'এই তো! প্লেনটা আমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ওটার পেটে লাল আর সবুজ রঙের পটি আঁকা—।'

'আমি ঘরের ভেতরে। প্লেনটা দেখতে পাচ্ছি না—শুধু শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় আমরা একই প্লেনের কথা বলছি। ওঃ, আপনারা তা হলে এত কাছে এসে গেছেন। আমার...।'

প্রিয়াংকার কথার মাঝখানে লাইনটা কেটে গেল।

গাড়ির কাছে পৌঁছে মিমো আর বাবলি রীতিমতো হাঁপাতে লাগল। অনুজ আর মহেন্দ্র গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ওরা আসামাত্র সবাই চটপট গাড়িতে উঠে পড়লেন। ধনিয়া এক ঝটকায় গাড়িটা ছুটিয়ে দিল।

দাশগুপ্ত মোবাইলে কথা বলতে শুরু করলেন। ওঁর কথা শুনে বোঝা গেল আরও দুটো গাড়ি আর্মড অফিসারদের নিয়ে একই টার্গেট লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। সবমিলিয়ে আর কয়েক মিনিটের মামলা।

মহেন্দ্র শর্মা কোমর থেকে রিভলভারটা বের করে একবার আগেপিছে খটাখট করে দেখে নিলেন অস্ত্রটা রেডি আছে কি না। ফোনে কথা বলতে-বলতেই মহেন্দ্রকে লক্ষ করলেন দাশগুপ্ত। সামান্য হেসে চোখের ইশারায় যেন বলতে চাইলেন, 'এই তো চাই! অলওয়েজ বি প্রিপেয়ারড বিফোর অ্যাকশান।'

একটু পরেই মিমোরা পৌঁছে গেল তিনতলা একটা ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে। বাড়িটার রং হালকা সবুজ। আর ছাদে মোবাইলের টাওয়ার।

দাশগুপ্ত মিমোকে বললেন, 'মিমো, তুমি বলেছিলে, ইস্টের দিকে তাকিয়ে প্রিয়াংকা এই ফ্ল্যাটবাড়িটার পেছনদিক দেখতে পেয়েছিল—তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার—।'

'তা হলে আমাদের এখন পেছনদিকে যেতে হবে।' বলেই ধনিয়ার দিকে তাকালেন দাশগুপ্ত : 'ধনিয়া, কুইক।'

গাড়ি আবার স্টার্ট দিল। সুযোগ পেয়ে মিমো দাশগুপ্তকে প্রিয়াংকার শেষ ফোনটার কথা বলল। বলল, 'ওরা প্রিয়াংকাকে শিফট করবে। এখুনি গাড়ি আসবে।'

এদিক-ওদিক গাড়িটা ঘুরিয়ে ধনিয়া এক জায়গায় গাড়িটা এনে দাঁড় করাল। দরজা খুলে একলাফে নেমে পড়লেন অনুজ। মোবাইল ফোনে আবার ব্যস্তভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। বোঝা যাচ্ছিল, তিনি রাস্তার ডিরেকশান দিচ্ছেন।

ওঁর কথা বলার মধ্যেই আরও দুটো গাড়ি এসে হাজির হল। গাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ ব্যস্তভাবে নেমে পড়ল। অনুজ দাশগুপ্ত ফোনে কথা বলা শেষ করে ওঁদের কাছে এগিয়ে গেলেন। কয়েকজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দ্রুত পরিচয়ের পালা শেষ করলেন। তারপর হাত নেড়ে-নেড়ে ইশারা করে নানারকম নির্দেশ দিতে লাগলেন।

মিমো আর বাবলি বুঝতে পারছিল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝোড়ো অ্যাকশান শুরু হবে।

।।ছয়।।

আসল বাড়িটা খুঁজে পেতে ওঁদের বেশিক্ষণ সময় লাগল না। হাঁটা পথে বাড়িটা মিনিটখানেক। বাড়ির সামনে সরু পিচের রাস্তা। রাস্তার অবস্থা ভালো নয়। এখানে-ওখানে গর্ত আর ফাটল। আর যানবাহন বলতে সাইকেল রিকশো আর সাইকেল—কখনও একটা কি দুটো মোটরবাইক।

নানান দিকে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করে চারজনের একটা দল নিয়ে এই সরু রাস্তাটায় ঢুকে পড়েছেন দাশগুপ্ত। সঙ্গে মিমো আর বাবলি।

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা ফাঁকা জমির পাশে মিমোদের অপেক্ষা করতে বললেন অনুজ। আরও বললেন, প্রিয়াংকা যদি ফোন করে তা হলে ওকে বলতে যে, ও যেন ভয় না পায়। আর যদি কোনও বিপদের আভাস দেখা দেয় তা হলে মিমোরা যেন সোজা টাটা সুমোর দিকে ছুট লাগায়।

মিমোরা বাড়িটা দেখতে পাচ্ছিল। বাড়ির পাশ ঘেঁষে ইটের পাঁজা। তার পাশে স্তূপাকার স্টোনচিপ আর বালি। একটা সাইনবোর্ডও বাড়ির দেওয়ালে দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির কাছে গিয়ে পকেটের মোবাইল ফোনটা অফ করে দিলেন অনুজ। ওঁর দেখাদেখি অন্য অফিসাররাও তাই করলেন। এনকাউন্টারের সময় মোবাইলের আওয়াজ অন্যমনস্ক করে দিতে পারে।

চাপা গলায় 'রেডি' বলে অনুজ দরজার ফ্রেমে লাগানো কলিংবেলের বোতাম টিপলেন।

কোনও সাড়া নেই।

আবার বোতাম টিপতেই একজন মহিলা দরজা খুললেন। কুচকুচে কালো গায়ের রং, চোখজোড়া অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, নাকে নথ।

একটা শব্দও খরচ না করে মহিলাকে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢুকে গেলেন ওঁরা চারজন। আর্মস হাতে তুলে নিয়ে চিতার ক্ষিপ্রতায় এদিক-ওদিক ছিটকে গেলেন। অনুজ চেঁচিয়ে বললেন, 'শুট অ্যাট সাইট।'

অফিসারদের কে একজন বললেন, 'ও. কে., স্যার।'

বাড়িটা দোতলা। সামনে ফাটল ধরা সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন। পাশে খানিকটা খোলা জায়গা। তারপরই বাগান। বাগান বলতে কয়েকটা কলাগাছ, আর তার সঙ্গে গোটাতিনেক পেয়ারা আর তেঁতুল গাছ।

বাগানের পাশ ঘেঁষে একটা বড়সড় ঘর। মাথায় টালির দোচালা। ওটা গোডাউন হতে পারে ভেবে অনুজ সেদিকে ছুটলেন। একইসঙ্গে 'প্রিয়াংকা! প্রিয়াংকা!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন।

মহেন্দ্র শর্মা রিভলভার উঁচিয়ে বাগানটা একদৌড়ে পরখ করে নিয়েই ছুটলেন বাড়ির দিকে। অন্য দুজন অফিসার তখন যে বাড়ির অন্য ঘরগুলো সার্চ করছেন সেটা লাথি মেরে দরজা খোলার 'দড়াম! দড়াম!' আওয়াজে ভালোই বোঝা গেল।

গোডাউনের দরজা বন্ধ কিংবা ভেজানো ছিল। অনুজ ছোটার গতি এতটুকুও না কমিয়ে বাঁ-কাঁধের ধাক্কায় দরজার পাল্লা ছিটকে দিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে পড়লেন। দুটো পাক গড়িয়ে যখন সামনে রিভলভার তাক করে উপুড় হয়ে তাকালেন তখন পাথর হয়ে গেলেন।

ঘরটাকে গোডাউনই বলা যায়। দেওয়ালে ঘেঁষে কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা, প্লাস্টার অফ প্যারিসের প্যাকেট, প্লাস্টিকের ড্রাম, আরও কত কী! তা ছাড়া বাতাসে হালকাভাবে চুনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘরের মেঝেতে পাতা বিছানায় একটি একুশ-বাইশ বছরের ফরসা সুন্দরী মেয়ে হাঁটুগেড়ে বসে আছে। গায়ে গাঢ় নীল আর হালকা সবুজ মেশানো সালোয়ার কামিজ। ওর দু-চোখ ভয়ে গোল-গোল হয়ে আছে। কারণ, ওর ঠিক পিছনেই ঘাপটি মেরে বসে আছে রোগামতন একটা লোক—মেয়েটার বাঁ-কাঁধের কোণ থেকে উঁকি মারছে, আর ডানহাতের পিস্তলটা মেয়েটার ডান কানের নীচে চেপে ধরে আছে।

লোকটা চাপা গলায় হাসছিল। ওর ছোট-ছোট চোখে তির-বেঁধানো দৃষ্টি।

অনুজ হালকা গলায় বললেন, 'প্রিয়াংকা?'

ভয়ার্ত মেয়েটা ওপর-নীচে মাথা নেড়ে বলতে চাইল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

ওর পিছনে লুকিয়ে থাকা শত্রু ব্যঙ্গ করে হাসল। মেয়েটাকে বলল, 'প্রিয়াংকা তোমার টিকটিকি কাকুকে বলো ওই লোহার যন্ত্রটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে—।'

প্রিয়াংকা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ওর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

লোকটা এবার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অনুজকে হুমকি দিল, 'শিগগির রিভলভারটা ছুড়ে ফেলে দে। নইলে এই মেয়েটাকে উড়িয়ে দেব।'

অনুজ আর ইতস্তত করলেন না। ঘরের একপাশে কতকগুলো লোহার পাইপ পড়েছিল—রিভলভারটা সেদিকে ছুড়ে দিলেন। লোহায়-লোহায় টক্কর হল। 'ঠং' শব্দ উঠল।

এমন সময় একটা এরোপ্লেনের গর্জন শোনা গেল। তারমধ্যেই পরপর দুটো ফায়ারিং-এর শব্দ। শব্দগুলো বাড়ির দোতলার দিক থেকে এল।

অনুজ দ্রুত ভাবছিলেন। দোতলায় কী হল কে জানে! ওঁর গলাটা কেমন যেন শুকিয়ে আসছিল। এত কাণ্ড করে, এত কষ্ট করে, প্রিয়াংকাকে যদিও-বা খুঁজে পাওয়া গেল, শেষ পর্যন্ত হয়তো শেষরক্ষা হল না।

রিভলভার ধরা লোকটাকে জরিপ করছিলেন অনুজ। লোকটার চোখে একটা ঠান্ডা পেশাদার ভাব। মনে হচ্ছিল, এরকম পরিস্থিতি ওর কাছে নতুন কিছু নয়।

তবুও চেষ্টা না করলেই নয়।

তাই বললেন, 'পুলিশ বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। আর কোনও পথ নেই।'

ভুরু উঁচিয়ে লোকটা বলল, 'নেই?' তারপর চাপা গলায় হেসে উঠল। প্রিয়াংকার নরম গলায় রিভলভারের নলটা আরও জোরে ঠেসে দিয়ে বলল, 'তা হলে আমাকে অ্যারেস্ট করুন, স্যার।' বাঁ-হাতের আঙুল নেড়ে অনুজকে ইশারা করে ডাকল শত্রু : 'আয়—আয়, আমাকে অ্যারেস্ট করবি আয়...।'

বাড়িটার অন্যান্য অংশ থেকে নানান তীব্রতার শব্দ ছিটে আসছিল। তার সঙ্গে মিশে ছিল 'অপারেশান ব্ল্যাক'-এর অফিসারদের কথাবার্তার টুকরো। ওঁরা এই গোডাউনটার দিকে আসছেন না কেন? মহেন্দ্ররই বা কী হল?

এমন সময় মহেন্দ্র শর্মা ছুটতে-ছুটতে গোডাউনের দরজায় এসে হাজির হলেন। পরিশ্রমে বেশ হাঁপাচ্ছেন। ওঁর বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছটা লাল হয়ে আছে—বোধহয় গুলিতে চোট পেয়েছেন। ডানহাতে রিভলভার।

ঘরের দৃশ্যটা দেখেই মহেন্দ্র থমকে গেলেন। অনুজকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। একলহমা চোখ বুলিয়েই পরিস্থিতি আঁচ করে নিলেন।

একটু সময় নিয়ে তারপর অনুজকে মহেন্দ্র জিগ্যেস করলেন, 'স্যার, ইয়ে লড়কি...প্রিয়াংকা মজুমদার?'

অনুজ মাথা নেড়ে বোঝালেন, হ্যাঁ।

এই আহত অবস্থাতেও মহেন্দ্র হাঁপাতে-হাঁপাতে অনুজের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন : 'তা হলে, স্যার, দু-চোখের মাঝখানে...।'

এবং মহেন্দ্র গুলি করলেন। বদ্ধ ঘরে বিকট শব্দ হল।

ঠিক দু-চোখের মাঝখানে নয়—একটু ওপরে গুলিটা লাগল। লোকটার কপালে একটা কালো টিপ তৈরি হয়ে গেল। চোখের পলকে লোকটা প্রিয়াংকার পিছনে চিত হয়ে উলটে পড়ল।

'শাবাশ, মহেন্দ্র!' বললেন অনুজ দাশগুপ্ত। টার্গেট শুটিং-এ মহেন্দ্র শর্মার কোনও জুড়ি নেই। তাই যে-কোনও এনকাউন্টারে ওকে সঙ্গে নেন অনুজ।

প্রিয়াংকা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল।

অনুজ ছুটে গিয়ে নিজের রিভলভারটা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর চটপট পৌঁছে গেলেন প্রিয়াংকার কাছে। ওর হাত ধরে টেনে তুললেন। বললেন, 'কোনও ভয় নেই। য়ু আর সেফ।' মহেন্দ্রকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'শিগগির চলো, প্রিয়াংকাকে নিয়ে আমরা এখুনি বেরিয়ে যাব। আমি লালবাজারে ইনফর্ম করছি। তোমারও জলদি ডাক্তার দেখানো দরকার।'

মহেন্দ্র সামান্য হেসে বললেন, 'তেমন সিরিয়াস কিছু নয়, স্যার—।' কথা বলতে-বলতে মেঝেতে পড়ে থাকা ডেডবডিটার দিকে একবার তাকালেন শুধু। তারপর ওঁরা প্রিয়াংকাকে নিয়ে সাবধানে রওনা হলেন।

গোডাউনের বাইরে এসে সদরের দিকে কয়েক পা এগোতেই অন্য দুজন অফিসার একটা লোককে পাকড়াও করে অনুজদের মুখোমুখি হলেন। লোকটার পায়ের কাছটা লাল রঙে মাখামাখি।

একজন অফিসার আমতা-আমতা করে বললেন, 'একটা হুডলাম ছিটকে পালিয়ে গেছে, স্যার। এক্সট্রিমলি সরি।'

অনুজ বললেন, 'ইটস ও. কে.। আজ না হয় কাল জালে পড়বেই। এই অপারেশানে প্রিয়াংকাই আমাদের মেন কনসার্ন। আমরা দুজন এখন প্রিয়াংকাকে নিয়ে সোজা মানিকতলা থানায় যাচ্ছি। আপনারা এখানকার চ্যাপ্টার ক্লোজ করে যাঁর-যাঁর হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করুন। আমি সব জায়গায় ইনফর্ম করে দিচ্ছি। ও—ভালো কথা। ওই গোডাউনটায় একটা বডি আছে।' ইশারায় গোডাউনের দিকে দেখালেন অনুজ : 'টেক কেয়ার অ্যাবাউট ইট...।'

ততক্ষণে আরও তিনজন অফিসার বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন। প্রত্যেকের হাতেই খোলা রিভলভার।

অনুজ তাঁদের হাতের ইশারা করে বললেন, 'এভরিথিং ইজ আন্ডার কন্ট্রোল—।'

তারপর প্রিয়াংকাকে নিয়ে মহেন্দ্রকে সঙ্গে করে বাড়ির বাইরে এলেন। সেখানে তখন কৌতূহলী জনতার ভিড়। নানা গুঞ্জন। ডিজিটাল ক্যামেরা আর ভিডিয়ো ক্যামেরা নিয়ে কেউ-কেউ ছবি তুলছে।

ভিড় ঠেলে অনুজ এগিয়ে চললেন। সামনে এখন অনেক কাজ।

মিমো আর বাবলি বাড়িটার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। দরজার দিকে নজর রাখছিল। হঠাৎই দেখল, একজন কালোমতন মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়নোর ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মহিলা যখন ওদের খুব কাছাকাছি এসে গেছে তখনই পরপর দুটো জোরালো শব্দ শোনা গেল। বোধহয় গুলির শব্দ।

মিমোর কী মনে হল, বাবলিকে বলল, 'এই মেয়েটাকে শিগগির ধর। ধরে অন্য অফিসারদের কাছে জমা করে দে।'

বাবলি অবাক হয়ে বলল, 'কীসব আলফাল বকছিস! ধরি, তারপর কেস খেয়ে যাই...।'

'বলছি ধর। কেউ কিছু বললেই স্মার্টলি বলবি ''পুলিশ''।'

ব্যস, বাবলি ওর পাসওয়ার্ড পেয়ে গেল। একদৌড়ে মহিলার কাছে গিয়ে 'পুলিশ' বলেই খপ করে হাত চেপে ধরল। তারপর টানতে-টানতে নিয়ে চলল রাস্তার মোড়ের দিকে।

মহিলা হাউমাউ করে কাঁদছিল। তাই দেখে দু-একজন লোক কৌতূহলে এগিয়ে আসতেই বাবলি হাত নেড়ে সরে যেতে ইশারা করে তেড়ে উঠে বলল, 'সাইড। সাইড। কুইক। পুলিশ। কিডন্যাপিং-এর কেস।'

আশ্চর্য! মন্ত্রের মতো কাজ হল। বাবলি নির্বিঘ্নে একজন অফিসারের কাছে পৌঁছে গেল। মহিলাকে জমা করে বলল, 'স্যার, আমি ইন্সপেক্টার দাশগুপ্তর সঙ্গে এসেছি। ওই বাড়িটা থেকে গুলির আওয়াজ পেলাম—।'

সঙ্গে-সঙ্গে অফিসারটি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বাবলি কাজ শেষ করে ফিরে চলল মিমোর কাছে।

মিমো বাড়ির দরজার দিকে নজর রাখছিল। হঠাৎ দেখল, একটা লোক সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভিড় করতে থাকা লোকজনকে হাতের ধাক্কায় সরিয়ে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল মিমো। একটু পরেই লোকটাকে প্রায় ধরে ফেলল। পিছন থেকে এক ধাক্কা মারতেই লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তায়। মিমো ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে চিত হয়ে জোড়া পায়ের লাথি ছুড়ে দিয়েছে মিমোর ঝুঁকে পড়া শরীরের দিকে।

লাথিটা মিমোর পেটে এসে লাগল। কিন্তু তার আগেই মিমো পেটের মাসল শক্ত করে ফেলেছে। ফলে লাথিতে তেমন কাজ হল না। মিমোর শরীরটা খানিকটা টলে গেল শুধু। ও চট করে লোকটার ডান পায়ের গোড়ালি চেপে ধরল। তারপর সেটাকে প্রবল মোচড় দিয়ে নিজের শরীরটাকে পাশে ঝুঁকিয়ে দিল।

লোকটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। মিমো সেই চিৎকারটা জোরালো করতে লোকটার তলপেটে একটা নিষ্ঠুর লাথি কষিয়ে দিল।

জিমের বিশ্বজিৎদার কথা মনে পড়ল মিমোর। বিশ্বজিৎদা বলে, 'বডি তৈরি করার সবচেয়ে বড় কারণ হল সেলফ-ডিফেন্স—আত্মরক্ষা।' তার মানে, নিজের ডিফেন্স—এবং শত্রুর প্রতি অফেন্স। নাঃ, মিমোর কিছু করার নেই। সেই সকাল থেকে ও চুপচাপ অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে—কিন্তু কিছু করেনি। এখন সেই করার সুযোগ এসেছে।

সুতরাং, বাঁ-হাতের এক থাবায় লোকটার জামা খামচে ধরল মিমো। ওকে টেনে তুলেই ডানহাতের এক ঘুষিতে নাক-মুখ রক্তাক্ত করে দিল। লোকটা আত্মরক্ষার চেষ্টায় মিমোর জামা আঁকড়ে ধরেছিল। সেই অবস্থায় লোকটা রাস্তায় পড়ে যেতেই মিমোর শার্টটা ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল।

মিমোদের ঘিরে ভিড় জমে গিয়েছিল। নানান জল্পনা চলছিল। কিন্তু কেউ কিছু করে ওঠার আগেই বাবলি ভিড় ঠেলে 'মিমো! মিমো!' বলে ডাকতে-ডাকতে ঢুকে পড়ল। তারপর অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই সরে যান। এটা পুলিশ-কেস। এই লোকটা ক্রিমিনাল—।'

একটু আগেই যে গুলির শব্দ হয়েছে সেটা জনতার কেউ-কেউ শুনেছে। তাই বাবলির কথায় কাজ হল। ভিড়ের বৃত্তটা মাপে একটু বড় হল।

বাবলি আর মিমো নেতিয়ে পড়া লোকটাকে বলতে গেলে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। তারপর পুলিশের গাড়ির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল।

খানিকটা পথ যেতে না যেতেই অনুজ দাশগুপ্তর সঙ্গে ওদের দেখা। তিনি ব্যস্তভাবে বললেন, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? এই লোকটাই বা কে?'

'ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পালাচ্ছিল, স্যার।' হাঁপাতে-হাঁপাতে মিমো বলল। তারপর এক ঝটকায় লোকটাকে দাঁড় করিয়ে দিল।

প্রিয়াংকা লোকটাকে দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

অনুজ অবাক হয়ে প্রিয়াংকার দিকে তাকালেন। ওঁর চোখে জিজ্ঞাসা।

প্রিয়াংকা কাঁপা গলায় বলল, 'এই লোকটা আমাকে চড় মেরেছিল।'

মিমো সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার গালে সপাটে এক চড় কষিয়ে দিল। লোকটার মাথা চকিতে পাশে ঘুরে গেল।

তারপর ছেঁড়া জামাটাকে সাধ্যমতো ঠিকঠাক করে প্রিয়াংকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিমো বলল, 'হাই, প্রিয়াংকা। আমি মিমো—।'

'আমি বাবলি।' বাবলিও হেসে হাত বাড়াল প্রিয়াংকার দিকে।

প্রিয়াংকা মিমোর হাত চেপে ধরে বলল, 'হাই। আমি প্রিয়াংকা। মিমো, য়ু আর গ্রেট। তুমি হেলপ না করলে আমি হয়তো মরেই যেতাম—।'

মিমোর হাত ছেড়ে এবার বাবলির হাতে হাত মেলাল প্রিয়াংকা : 'বাবলি, য়ু অলসো ডিজার্ভ মেনি-মেনি থ্যাংকস। আই ও য়ু মাই লাইফ।'

বাবলি ইংরেজি কথাগুলোর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না।

পরিচয়ের প্রথম ধাপ শেষ হতেই অনুজ ওদের তাড়া দিলেন। মিমোদের হাত থেকে ক্রিমিনালটাকে নিয়ে মহেন্দ্রকে বললেন লোকটাকে অন্য অফিসারদের কাছে জমা করে দিতে। মিমো লক্ষ করল, মহেন্দ্রর বাঁ-হাতে কনুইয়ের ঠিক ওপরে কাপড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

এবার মিমোদের তাড়া লাগালেন অনুজ। বললেন, 'চটপট গাড়িতে চলো। পথে যেতে-যেতে কথা বলা যাবে।'

ওরা সবাই তাড়াতাড়ি পা চালাল গাড়ির দিকে।

ধনিয়া গাড়ি স্টার্ট দিতেই অনুজ নিজের মোবাইল ফোনটা প্রিয়াংকার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এবার তুমি তোমার বাবাকে ফোন করো। কথা বলার পর লাইনটা আমাকে দিয়ো...।'

গাড়ির দ্বিতীয় সিটে বাবলি আর মহেন্দ্রর মাঝে প্রিয়াংকা বসেছিল। এখন ও অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। একটু আগেও ওর চোখে-মুখে যে-ভয়ের কাঠ-কাঠ ভাবটা ছিল এখন সেটা আর নেই। ওকে এখন বেশ কোমল আর সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাবাকে লাইনে পাওয়ার পর কথা বলতে গিয়ে ও 'বাপি! বাপি!' বলে আবেগে কেঁদে ফেলল। আনন্দ আর খুশিতে ওর দু-চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর সোনম লাইনে এল। প্রিয়াংকা ভাইয়ের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলল।

কিছুক্ষণ পর কথা বলা শেষ করে অনুজ দাশগুপ্তকে ফোনটা ফিরিয়ে দিল প্রিয়াংকা।

অনুজ মিস্টার মজুমদারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, '...দেখুন, মিস্টার মজুমদার, থানায় গিয়ে আমাদের কিছু ফরমালিটি—মানে, পেপারওয়ার্ক—বাকি আছে। তারপরই প্রিয়াংকাকে আমি নিজে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে আমার এই নম্বরটায় যখন খুশি ফোন করবেন।...ও. কে.।'

ফোন ছাড়তে না ছাড়তেই অনুজের মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোনে 'হ্যালো' বলার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অনুজ নড়েচড়ে তটস্থ হয়ে বসলেন। ডিসি ডিডি ওয়ান নিজে ফোন করেছেন।

'হ্যাঁ, স্যার—বলুন। আমি অনুজ দাশগুপ্ত। মানিকতলা থানার অ্যাডিশন্যাল ও. সি.—।'

'হ্যাঁ, জানি।' ওপাশ থেকে গম্ভীর গলা ভেসে এল : 'আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো আগে কাশীপুর থানায় ছিলেন—।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'মেয়েটাকে রেসকিউ করার জন্যে কনগ্র্যাচুলেশানস।'

'থ্যাংক য়ু, স্যার।'

'মেয়েটাকে নিয়ে এক্ষুনি আমাদের ডিপার্টমেন্টে চলে আসুন। ওর স্টেটমেন্ট নেওয়ার সময় আমি থাকতে চাই। আর ওই মাইক্রো-ক্যাসেট...।'

'ইয়েস, স্যার—।'

'আমার কিডন্যাপিং সেকশানের এ. সি. সাহেব—মানে, চঞ্চল সরকার—উনি ওই ক্যাসেটটা দেখার জন্যে একেবারে উতলা হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া আমারও ইন্টারেস্ট আছে। আপনি মেয়েটাকে নিয়ে—আর ওই ক্যাসেটটা নিয়ে—হেডকোয়ার্টারে চলে আসুন, কেমন?'

অনুজ ইতস্তত করতে লাগলেন।

ও-প্রান্ত থেকে অধৈর্য গলা শোনা গেল, 'কী হল?'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর অনুজ বললেন, 'ক্যাসেটটার খোঁজ এখনও আমরাই জানি না, স্যার। প্রিয়াংকাকে অনেকবার জিগ্যেস করেছি। কিন্তু ও খুব সেনসিবল মেয়ে। ও বলছে, ক্যাসেটটাই ওর বেঁচে থাকার লাইসেন্স। টপমোস্ট লেভেল ছাড়া ওই ক্যাসেট ও জমা দেবে না...ও খুব কশাস...।'

'দ্যাটস গুড। সত্যিই খুব সেনসিবল মেয়ে। কিডন্যাপারদের ডেন থেকে যেভাবে ও টেলিফোনে বাইরের ওই ছেলেটার সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছে...কী যেন নাম? মিমো...রিয়েলি, ভাবা যায় না। আপনি প্রিয়াংকাকে আমার মোবাইল নম্বরটা দিয়ে দিন—ও যখন খুশি আমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে নেবে...নাঃ, আপনি বরং ফোনটা একমিনিটের জন্যে মেয়েটিকে দিন...আমি একটু কথা বলি...।'

অনুজ 'ইয়েস, স্যার—,' বলে মোবাইলটা প্রিয়াংকার দিকে এগিয়ে দিলেন। ওকে নীচু গলায় বললেন, 'ডিসি ডিডি ওয়ান। তোমার সঙ্গে পারসোনালি কথা বলতে চান...।'

প্রিয়াংকা ফোন নিয়ে কথা বলল, 'স্যার, আমি প্রিয়াংকা বলছি।'

'কনগ্র্যাটস, ব্রেভ লেডি। এ বছরের সেরা সাহসী মেয়ে বলে তোমার নাম আমি গভর্নমেন্টের কাছে রেকমেন্ড করব। ওই ক্যাসেটটা তোমার কাছে সেফ জায়গায় রাখা আছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। জায়গাটা মোর দ্যান সেফ—আমি ছাড়া কেউ খুঁজে পাবে না।'

'গুড। তা হলে ক্যাসেটটা নিয়ে আমরা কখন বসছি? তুমি কি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে লালবাজারে আসতে পারবে? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আর তোমার সবরকম প্রোটেকশানের বন্দোবস্ত করব। কোনও চিন্তা নেই—।'

প্রিয়াংকার ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। চোখের পাতা ঘুমে যেন জড়িয়ে আসছিল। ও আলতো গলায় বলল, 'স্যার, আজ আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। তা ছাড়া আমি এখনও বাড়ি যাইনি। বাপি বা ভাইয়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। যদি...মানে, কাল বা পরশু আপনার সঙ্গে কথা বলতে গেলে কি খুব অসুবিধে হবে?'

'না, না—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোনও অসুবিধে হবে না।' ওপাশ থেকে হেসে বললেন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের চিফ, 'শুধু একটা কথা। ক্যাসেটটা কোথায় আছে কাউকে বলবে না। ওটা কাউকে দেখাবে না। মোটকথা, ওটা নিয়ে কারও সঙ্গে একটি কথাও বলবে না। আন্ডারস্টুড?'

'পারফেক্টলি আন্ডারস্টুড, স্যার।' বলল প্রিয়াংকা।

'গুড গার্ল। আমি এক্ষুনি তোমার টপ প্রায়োরিটি প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করছি। কোনও চিন্তা কোরো না। য়ু উইল বি অ্যাবসোলিউটলি সেফ। কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না।'

'থ্যাংক য়ু, স্যার।'

'আর একটা কথা। ইন্সপেক্টার দাশগুপ্ত তোমার সঙ্গে আমাদের টপ সিক্রেট মিটিং-এর ব্যাপারটা কো-অর্ডিনেট করবেন। তবুও তুমি ওঁর কাছ থেকে আমার মোবাইল নম্বরটা নিয়ে রাখো। দরকার মনে করলেই ফোন করবে। ও. কে.?'

'ও. কে., স্যার।' প্রিয়াংকার এবার সত্যি-সত্যিই ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল।

ও ফোনটা অনুজ দাশগুপ্তকে ফিরিয়ে দিল। দাশগুপ্ত চিফের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোন ছাড়লেন। মিমোকে লক্ষ করে বললেন, 'মিমো, থানায় গিয়ে আমরা খাওয়া-দাওয়া করব। তা ছাড়া তোমার আর বাবলির সঙ্গেও কিছু পেপারওয়ার্কের কাজ আছে। দরকার হলে তোমার মাকে একবার ফোন করে দেব।'

খাওয়ার কথায় মিমো একটু লজ্জা পেয়ে গেল। তবে সত্যিই ওর খিদে পাচ্ছিল। পাওয়ারই কথা—কারণ, বেলা প্রায় দুটো বাজে।

একটু পরেই মানিকতলা থানায় পৌঁছে গেল ওরা। সেখানে মহেন্দ্র শর্মা ও আরও দুজন অফিসারকে নিয়ে দাশগুপ্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাবলি, মিমো আর প্রিয়াংকা একপাশে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দাশগুপ্ত প্রিয়াংকাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে মিমো আর বাবলিকেও তুলে নিলেন। বললেন, ওদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে তারপর প্রিয়াংকাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন।

প্রিয়াংকা মিমো আর বাবলিকে বলল, 'এসব ঝামেলা মিটলে তোমরা আমাদের বাড়িতে একদিন আসবে। বাপি আর সোনম তোমাদের দেখতে চেয়েছে। সেদিন খুব জমিয়ে গল্প করা যাবে—'

মিমো বাড়ির কাছে নেমে যাওয়ার আগে প্রিয়াংকা মিমোর মোবাইল নম্বরটা নিল। প্রিয়াংকার মোবাইল ফোন এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশের জিম্মায়। বাপিকে বলে আগে ও একটা নতুন ফোন কিনবে।

বাড়িতে ওকে নামিয়ে দেওয়ার সময় অনুজ দাশগুপ্ত যথেষ্ট ভরসা দিলেও প্রিয়াংকার মাথা থেকে ভয়টা কিছুতেই যাচ্ছিল না। আর একইসঙ্গে মাইক্রো-ক্যাসেটের দুশ্চিন্তাটা মনের ভেতরে পাগলের মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল।

।।সাত।।

ঘরে হালকাভাবে এসি চলছিল।

ঘরের একদিকের দেওয়ালের কাছে মেটাল স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো রয়েছে একটা প্রোজেকশান স্ক্রিন। তার কাছাকাছি একটা টেবিলে বসানো একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার আর এলসিডি প্রোজেক্টার। টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে আছে একজন অপারেটর। তার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে নির্দেশ পেলেই সে কাজ শুরু করবে। এলসিডি প্রোজেক্টার চালু হয়ে যাবে। সামনের পরদায় ফুটে উঠবে ছবি।

নির্দেশ যিনি দেবেন তিনি বাঁ-দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা সোফায় বসে আছেন। ডিসি ডিডি ওয়ান সুন্দরলাল প্রধান। ফরসা মাঝারি চেহারা। মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। পরিষ্কার করে গোঁফ-দাড়ি কামানো। চোখে ছোট লেন্সের চশমা।

'সিনেমা'-র দর্শকদের জন্য তিনটে লম্বা-লম্বা সোফা সমান্তরাল-ভাবে পাতা রয়েছে। তার প্রথম সারিতে বসেছেন অনুজ দাশগুপ্ত, ডানপাশে প্রিয়াংকা।

প্রিয়াংকাকে দেখেই বোঝা যায় ও বেশ টেনসড হয়ে রয়েছে। মুখে কোনও কথা নেই। 'সিনেমা' কখন শুরু হবে সেজন্য অপেক্ষা করছে।

অনুজ দাশগুপ্তর বাঁ-পাশে বসে আছেন আর-এক পুলিশকর্তা চঞ্চল সরকার। মিস্টার প্রধানের তুলনায় বেশ রোগা। গায়ের রং মাঝারি। কপালের দুপাশে চুল কমে এসেছে। বয়েস অবশ্যই পঞ্চাশ পেরিয়েছে। চোখে কার্বন ফ্রেমের চশমা। মুখে একটা নির্বিকার উদাসীন ভাব।

এই পাঁচজন ছাড়া ঘরে আর কোনও লোক নেই। মিস্টার প্রধানের নির্দেশে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রিয়াংকা ওর মাইক্রো-ক্যাসেটটা সত্যিই এক অদ্ভুত জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। ওটা একটা পলিথিন প্যাকেটে মুড়ে ওর কলেজের ক্যাম্পাসের বাইরে একটা শিমুল গাছের কোটরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ও। গতকাল বিকেলে লালবাজার থেকে তিনজন অফিসার আর মানিকতলা থানার অনুজ দাশগুপ্ত প্রিয়াংকা আর ওর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে প্রিয়াংকার কলেজের কাছে গেছেন। ক্যাসেটটা উদ্ধার করে লালবাজারে ডিসি ডিডির কাছে জমা দিয়েছেন। আজ তিনি প্রিয়াংকাকে ডেকেছেন সে-ব্যাপারে কথা বলার জন্য। ওর বাবাও সঙ্গে এসেছেন, কিন্তু ওঁকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

মিস্টার প্রধান এবার কথা বললেন, 'যা আমরা দেখতে চলেছি, শুনতে চলেছি—সবই হাইলি কনফিডেনশিয়াল। এ-ঘরের একটি কথাও যেন বাইরে না যায়। দিস ইজ মাই অর্ডার। কী বলেন, মিস্টার সরকার?'

শেষ প্রশ্নটা চঞ্চল সরকারকে লক্ষ করে।

তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'একদম ঠিক বলেছেন। এই মাইক্রো-ক্যাসেটটা নিয়েই এত গণ্ডগোল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক্সপ্লোসিভ কোনও মেটিরিয়াল আছে। ব্যাপারটা দেখার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব—তার আগে নয়।'

মিস্টার প্রধান বললেন, 'কাল ক্যাসেটটা হাতে পাওয়ার পর আমি ওটা একটা সিডিতে রাইট করিয়ে নিয়েছি। এখন সেই সিডিটাই সুশান্ত চালাবে।' এবার কম্পিউটারের পাশে চেয়ারে বসা ছেলেটির দিকে তাকালেন মিস্টার প্রধান : 'সুশান্ত, স্টার্ট—।'

কম্পিউটার চালু হল। পরদায় আলোছায়া দিয়ে ছবি তৈরি হল।

কিন্তু এ কী! এ কী দেখছে প্রিয়াংকা? কোথায় সেই ভোরবেলার ময়দানে নৃশংস খুনের ছবি? তার বদলে নানান রঙের রঙিন ফুল। কোনও ফুলের প্রদর্শনীতে গিয়ে কেউ যেন হাসিখুশি ফুলের সুন্দর-সুন্দর ছবি তুলেছে।

প্রিয়াংকা উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'এসব কী ব্যাপার, স্যার? আমার ক্যাসেটে তো অন্য ছবি ছিল— একটা রুথলেস মার্ডারের ছবি। সেসব পালটে গেল কেমন করে!'

মিস্টার প্রধান রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। চঞ্চল সরকারের দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সরকার, দিস ইজ আউটরেজিয়াস! ডিপার্টমেন্টে এসব হচ্ছেটা কী!' বিরক্তিতে দু-হাত ছুড়ে বলে উঠলেন, 'এখন কী করে আমরা জানতে পারব ওই ক্যাসেটে কী ছিল? ডিপার্টমেন্টেই আমি তা হলে সিরিয়াস প্রোব চালাব—তাতে সি. এম. যদি আমাকে শো-কজ করেন করবেন। আমি কিন্তু ছাড়ব না...।'

দাশগুপ্ত চুপচাপ বসে সব দেখছিলেন। ওঁর সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। একবার পরদার ফুলের ছবির দিকে, একবার সুন্দরলাল প্রধানের দিকে, আর-একবার প্রিয়াংকার দিকে দেখছিলেন।

প্রিয়াংকার সুন্দর মুখ লালচে দেখাচ্ছিল, ওর কপালে সন্দেহের কয়েকটা ভাঁজ।

হঠাৎই ও সোফা থেকে ওর সাইডব্যাগটা তুলে নিল। ওটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা সিডি বের করে নিল। সেটা হাতে নিয়ে ডিসি ডিডির কাছে এগিয়ে গেল।

'স্যার, আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়ে অনেকদিন আগেই ওই ক্যাসেটটার একটা ব্যাকআপ সিডি তৈরি করে রেখেছিলাম। নিন, এটা চালালেই সব দেখতে পাবেন। মনে হয়, আর কোনও প্রবলেম হবে না...।'

প্রধান বেশ অবাক হয়ে গেলেন। সিডিটা নিয়ে হেসে বললেন, 'স্মার্ট গার্ল। তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। আমার মনে হয়, ক্যাসেট থেকে সিডিতে কনভারশনের সময় আমার ডিপার্টমেন্টের লোকেরা কোনও গণ্ডগোল করেছে। যদি না তোমার ক্যাসেটটাতেই ওরিজিন্যালি কোনও প্রবলেম থেকে থাকে...।'

প্রিয়াংকা কোনও উত্তর দিল না। ফিরে এসে সোফায় বসল।

ক্যাসেটটাতে যে কোনও প্রবলেম ছিল না সেটা সিডিটা চালাতেই বোঝা গেল।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে খুনের 'সিনেমা' দেখতে লাগলেন। এসি মেশিনের ভ্রমর-গুঞ্জন ছাড়া ঘরে আর কোনও শব্দ নেই। অনুজ দাশগুপ্ত ভাবতেই পারেননি মাইক্রো-ক্যাসেটে এরকম মারাত্মক কিছু থাকতে পারে।

মনে-মনে প্রিয়াংকার সাহসের তারিফ করলেন তিনি।

ছবির কথাবার্তাগুলো ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না। তবে '...কৌটোর ভেতরে হিরেগুলো আছে...' এই কথাটা বেশ বোঝা গেল।

মিস্টার প্রধান সোফায় নড়েচড়ে বসলেন—কিন্তু কোনও কথা বললেন না।

ছবি দেখানো শেষ হলে তিনি সুশান্তকে বললেন সিডিটা আবার চালাতে।

দ্বিতীয়বার 'সিনেমা' শেষ হওয়ার পর মিস্টার প্রধান সুশান্তর কাছ থেকে সিডিটা চেয়ে নিলেন। তারপর ওকে ছুটি দিয়ে দিলেন। সুশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

চঞ্চল সরকার চোয়ালে হাতে বোলাচ্ছেন। সুন্দরলাল প্রধান সোফার হাতলে আঙুলের টোকা মারছেন। অনুজ দাশগুপ্ত মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছেন। আর প্রিয়াংকা তিনজন পুলিশকর্তার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে দেখছে।

বেশ কয়েক মিনিট পরে মিস্টার প্রধান বললেন, 'ছবির এই দুটো লোকের ফটোগ্রাফ প্রিন্ট করে আমাদের ডকুমেন্টেশান সেলকে দিতে হবে...যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়। আর হেস্টিংস থানা থেকে এই মার্ডারের ফাইলটা আনাতে হবে। তারপর আমাদের টোটাল ইনভেস্টিগেশানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মনে হচ্ছে, একটা বড়সড় ক্রিমিনাল নেটওয়ার্ক এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

'আমারও তাই ধারণা—' চঞ্চল সরকার বললেন।

মিস্টার প্রধানকে লক্ষ করে অনুজ দাশগুপ্ত বললেন, 'স্যার, আমাদের কী করতে হবে বলবেন। আপনি যেমন-যেমন ইনস্ট্রাকশন দেবেন আমরা ঠিক সেইভাবেই এগোব...।'

'ঠিক আছে। সময়মতো সব জানাব। এবার আপনি যেতে পারেন। প্রিয়াংকা একটু থাকুক। ওর সঙ্গে সিডির কনটেন্ট নিয়ে আমার কিছু কথা আছে। আপনি যাওয়ার সময় ওর বাবাকে বলুন ওয়েট করতে। কথা

হয়ে গেলে আমি স্পেশাল প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করে ওদের বাড়ি পৌঁছে দেব। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। ও. কে.? আর বাইরের পাহারাকে একটু বলুন, আমাদের যেন কেউ ডিসটার্ব না করে...।'

'ও. কে., স্যার—' বলে প্রিয়াংকার দিকে একপলক তাকিয়ে অনুজ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিস্টার প্রধান এবার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে-পায়ে চঞ্চল সরকারের কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। বেশ মোলায়েম গলায় অনুরোধের সুরে বললেন, 'মিস্টার সরকার, যদি কিছু মনে না করেন...মানে, আমি প্রিয়াংকার সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলতে চাই। হোপ য়ু উডন্ট মাইন্ড...।'

চঞ্চল সরকার সঙ্গে-সঙ্গে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আড়চোখে প্রিয়াংকার দিকে একবার দেখলেন। তারপর 'অফ কোর্স আই ডোন্ট মাইন্ড—' বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক সেকেন্ড ওঁর চলে যাওয়া দেখলেন প্রধান। তারপর আপনমনেই বললেন, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।' প্রিয়াংকার দিকে তাকালেন : 'দেখলে তো, ডিপার্টমেন্টের মধ্যেই তোমার মাইক্রো-ক্যাসেটের ডেটা সিডিতে ট্রান্সফার করতে গিয়ে কীরকম হর্টিকালচার শো-র ছবি হয়ে গেল! কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই। সেইজন্যে আর সবাইকেই চলে যেতে বললাম।'

ঘরের দরজার কাছে চলে গেলেন। ছিটকিনি এঁটে দিলেন ভেতর থেকে। তারপর হাতে হাত ঘষে হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে চলে এলেন প্রিয়াংকার কাছে।

'তুমি খুব ইনটেলিজেন্ট বলে একটা ব্যাকআপ সিডি তৈরি করে রেখেছিলে। য়ু আর রিয়েলি স্মার্ট। তোমার মতো শার্প মেয়েরা পুলিশ ফোর্সে জয়েন করলে পুলিশ ফোর্স ইনটেলেকচুয়ালি আরও স্ট্রং হত। সত্যিই তোমাকে পুরস্কার দেওয়া দরকার—।'

প্রিয়াংকা ওঁর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু, স্যার।'

মিস্টার প্রধান এবার কম্পিউটারের কাছে গেলেন। মনিটরের কয়েকটা আইকনে মাউস ক্লিক করে সিডিটা আবার চালালেন। প্রিয়াংকার তোলা সিনেমা আবার শুরু হল।

ছবিটা আবার কেন চালানো হল প্রিয়াংকা ঠিক বুঝতে পারছিল না। চোখে প্রশ্ন নিয়ে মিস্টার প্রধানের দিকে তাকাতেই তিনি স্নেহমাখানো হাসি হেসে বললেন, 'ডোন্ট বি উয়ারিড। এই ছবি নিয়ে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।' পায়ে-পায়ে হেঁটে ছবির পরদার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন : 'ছবির এই লোকদুটোকে তুমি কি চেনো?'

প্রিয়াংকা এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। বলল, 'না—চিনি না।'

'তোমাকে কিডন্যাপ করে যেখানে আটকে রেখেছিল সেখানেও এই দুজনের কাউকে দ্যাখোনি?'

'না, স্যার—দেখিনি।'

'যে-লোকটা ভিকটিম—মানে, যাকে মার্ডার করা হল—তাকে কি তুমি চেনো?'

আবার মাথা নাড়ল প্রিয়াংকা : 'না—চিনি না।'

'তা হলে তোমার কাছ থেকে তো বাড়তি কোনও হেলপ আমরা পাব বলে মনে হয় না।' মিস্টার প্রধানের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

প্রিয়াংকা খুব দ্রুত ভাবছিল, কীভাবে ও পুলিশকে হেলপ করতে পারে। ও কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলে উঠল, 'স্যার, এই সিডি থেকে আমি এই তিনজন লোকের এনলার্জড ফটোগ্রাফ প্রিন্ট করে দিতে পারি। সেগুলো আপনারা খবরের কাগজে, টিভিতে, ইন্টারনেটে সারকুলেট করতে পারেন। তখন কেউ যদি এদের চিনতে পারে তখন তার কাছ থেকে আরও ইনফরমেশান পাওয়া যেতে পারে...।'

'গুড আইডিয়া...।' মিস্টার প্রধানের কপালের ভাঁজগুলো নরম হল কিন্তু পুরোপুরি মিলিয়ে গেল না।

'...তারপর এই ভিডিয়োর সাউন্ড ট্র্যাকটা রেস্টোর করা যেতে পারে। তা হলে কথাগুলোর স্পষ্ট রেকর্ডিং পাওয়া যাবে। তখন সেগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালিসিস করে...মানে, স্যার, টেকনোলজির হেলপ নিয়ে উই

ক্যান ডু আ লট। এই ক্রিমিনালগুলো ভাবতেও পারবে না আমরা কতদূর যেতে পারি।' উৎসাহ আর উদ্দীপনায় একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল প্রিয়াংকা।

নাঃ, এই মেয়ে সহজে থামবার নয়। সুন্দরলাল প্রধান ভাবলেন।

পরদায় ছবি শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রধান ধীরে-ধীরে পা ফেলে প্রিয়াংকার কাছে এলেন। আচমকা ওর পাশে বসে পড়লেন। বললেন, 'রিল্যাক্স, গার্ল। এবারে বলো তো, সেদিন ভোরবেলা তুমি কী দেখেছ, কী শুনেছ। মার্ডারটা ঠিক কীভাবে হল? মোট ক'জন লোক ছিল? তুমি কীভাবে ব্যাপারটা দেখে ফেললে? একেবারে গোড়া থেকে সব ডিটেইলসে বলো...।'

প্রিয়াংকা বলতে শুরু করল। ও মনে-মনে সেই ভয়ংকর ভোরবেলায় ফিরে গেল। সেদিনকার প্রতিটি দৃশ্য প্রতিটি ঘটনা ওর মনে স্থায়ী ছাপ ফেলে গেছে। সুতরাং ওর বর্ণনায় কোনও ফাঁক ছিল না।

শেষে ও বলল, কীভাবে ওর মুখ দিয়ে একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। তাতেই ওই ভয়ংকর লোকদুটো ওকে দেখতে পায়, ওর দিকে ছুটে আসে। তখন ও ছুটে পালায়।

ওর কথার মাঝে-মাঝে মিস্টার প্রধান কথা বলছিলেন, নানান প্রশ্ন করছিলেন। তাতে টেনশন কেটে গিয়ে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছিল প্রিয়াংকা। প্রধানকে ওর ডিসি ডিডি ওয়ান নয়, অভিভাবক বলে মনে হচ্ছিল।

প্রধান বললেন, 'সেদিন তুমি খুব জোর বেঁচে গেছ। আর-একটু হলেই লোকগুলো—।'

'হ্যাঁ, আমি বাপিকে বলছিলাম। যদি অন্য ড্রেস পরে থাকতাম...।'

'ভাগ্যিস তুমি সেদিন জিনস পরেছিলে! নইলে অত জোরে ছুটতে পারতে না।'

সুন্দরলাল প্রধান হেসে এই কথা বলামাত্রই বুলেটের মতো ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিয়াংকা। চোখ গোল-গোল করে প্রধানকে দেখতে-দেখতে পিছিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঘরের দেওয়ালে পিঠ ঠেকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ও বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল।

প্রধানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিস্ময়ে হোঁচট খেয়ে ও বলল, 'আ—আপনি কী করে জানলেন আমি জিনস পরেছিলাম? ক্যাসেটে তো আমার কোনও ছবি নেই! আর—আর একবারও তো সে-কথা আমি বলিনি! কী করে জানলেন আপনি?'

প্রধানের মুখের রক্ত পলকে শুষে নিয়েছিল কেউ। বুঝতে পারছিলেন, বেখেয়ালে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। তির ছুটে বেরিয়ে গেছে হাত থেকে। আর ফেরানোর কোনও উপায় নেই।

কথা বলতে গিয়ে ওঁর কথা আটকে যাচ্ছিল। হাত তুলে প্রিয়াংকাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে কোনওরকমে বললেন, 'প্লিজ, প্রিয়াংকা, প্লিজ। কিপ ইয়োর কুল। ডোন্ট গেট মি রং। আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলছি...লক্ষ্মী মেয়ে...।'

প্রিয়াংকা কোণঠাসা বেড়ালের মতো আক্রমণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানের শেষ কথাটা ওর শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছড়িয়ে দিল। ঠিক এইরকম ভঙ্গিতেই না কথা বলেছিল সেই 'বস'!

প্রিয়াংকা পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, 'তুমি! তুমি! তুমি!'

এবার সুন্দরলাল ওঁর ভদ্রতার পোশাকটা ঝেড়ে ফেললেন। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চট করে পকেট থেকে একটা কালো রঙের রিভলভার বের করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি। সিনেমার ওই টাকমাথা লোকটা আমি। ওই টাক আর গোঁফ হল ডিসগাইজ—ছদ্মবেশ।' তারপর মিহি এবং মোলায়েম গলায় স্নেহ-মাখানো সুরে বলতে শুরু করলেন, 'কী অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়ে! যেমন রূপ তেমনই গুণ। রূপে-গুণে একেবারে নজিরবিহীন মাখামাখি। বড়ই তৃপ্তিদায়ক—এবং বেদনাগম্ভীর। তোমাকে নিয়ে এখন কী করি বলো তো? এই অফিসে তো আর হত্যাকাণ্ড ঘটানো যায় না...তবে তার কাছাকাছি কিছু করা যায়। এই ধরো ক্ষুদ্র একটি ইনজেকশান প্রয়োগ করে তোমাকে ঘুম পাড়ানো যায়। তাতে তোমার জ্ঞান ফিরবে কমপক্ষে চবিবশ ঘণ্টা পর। ততক্ষণে তোমার ''বাপি'' আর সোনম পগার পার— সোজা আকাশে...।'

প্রিয়াংকা বারবার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছিল। আশা করছিল ওর চিৎকার শুনে কেউ-না-কেউ ঘরে আসবে।

সেটা লক্ষ করে প্রধান ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললেন, 'কেউ আসবে না। অর্ডার আছে, কেউ আমাদের ডিসটার্ব করবে না। তাই বলছি, মুখ বুজে থাকো। তোমাকে তার জন্যে পুরস্কার দেব—প্রচুর টাকা...।'

প্রিয়াংকা ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু একইসঙ্গে একটা ভয়ংকর জেদ ওর মধ্যে কাজ করছিল। ও শব্দ করে ঘেন্নার থুতু ফেলল মেঝেতে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তোমার টাকা তোমার থাক। আমার চাই না। আর আমার যদি এখানে কিছু হয় তা হলে ওই সিডির ছবি এম এম এস করে ছড়িয়ে যাবে ইন্টারনেটে আরও হাজার-হাজার লোকের মোবাইলে। তোমার ফটোটা এনলার্জ করলেই ওই নকল টাক ধরা পড়বে। আর বাকি শাগরেদগুলোর কাছ থেকেও প্রচুর ইনফরমেশান পাওয়া যাবে। তুমি কিছুতেই বাঁচবে না—।'

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল প্রিয়াংকা। বোতাম টিপে কল করল মিমোকে।

প্রধানের চোখেমুখে দ্বিধার ছাপ ফুটে উঠেছিল। তিনি ভাবছিলেন, মেয়েটা হয়তো ব্লাফ দিচ্ছে।

প্রিয়াংকা সেটা আন্দাজ করতে পারল কি না কে জানে। ও মোবাইল ফোনের লাউডস্পিকার অন করে দিল। তারপর বলল, 'মিমো, এম এম এস-এর কথাগুলো বলো...।'

মিমোর সঙ্গে আগে থেকে কথা বলাই ছিল। মিমো গড়গড় করে বলে গেল কীভাবে সিডির ছবি আমজনতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কীভাবে ওরা প্রচারে-প্রচারে ছেয়ে দেবে গোটা কলকাতা। কীভাবে ওরা সব ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রিয়াংকা প্রধানকে বলল, 'শুনলে তো! আমি বারবার বলেছি, এই ক্যাসেটটা আমার বেঁচে থাকার লাইসেন্স। ওটা কখনও আমি কপি না রেখে হাতছাড়া করতে পারি!'

এবার সুন্দরলালের চোয়াল ঝুলে পড়ল। ঘরে এসি চলা সত্ত্বেও ওঁর কপালে ঘামের ফোঁটা।

প্রিয়াংকা মোবাইল ফোন পকেটে রেখে বলল, 'তোমার সব খেলা শেষ। চোরাই হিরে, খুন...খোঁজ করলে আরও কত কী বেরোবে। এখন কেঁচোর গর্ত খুঁড়ে সাপ বের করার সময়...।'

ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে গেল প্রিয়াংকা। শব্দ করে ছিটকিনি খুলে দরজাটা হাট করে খুলে দিল। সবাই আসুক—এসে সাপটাকে দেখুক।

তুমি পিশাচ





।।এক।।

আমার চলার কোনও শেষ নেই। আমি সত্যিকারের পথিক—পথই যার জীবন। আমার চলার পথের যেমন কোনও শেষ নেই, তেমন আমারও কোনও শেষ নেই। এমনই আমার জীবন।

মানুষের সঙ্গে আমার মিল অনেক—কিন্তু আবার গরমিলও প্রচুর। আমি মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি। তাই বুঝতে পারি মানুষ কেমন হয়। অর্থাৎ, মানুষের মন আর চেহারা দুই-ই দেখতে পাই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পায় না—শুধু অনুভব করতে পারে।

মানুষ আমার খুব পছন্দের, খুব প্রিয়। তাই মানুষ দেখলে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ি। এক অদ্ভুত টানে দু, তিন, কিংবা চার টুকরো হয়ে নানান মানুষের ভেতরে আশ্রয় নিই। তাই আমার বাসা হল মানুষ—মানুষই আমার ঠিকানা। কারও মধ্যে আমি পঞ্চাশ, ষাট কি একশো বছর ধরে থাকি। আবার কারও শরীরে থাকি পাঁচ, সাত কি দশ দিন। কতদিন কোথায় থাকব সেটা নির্ভর করে আমার মরজির ওপরে।

যে-যে মানুষের মধ্যে আমি আশ্রয় নিই তাদের মধ্যে অনেকগুলো নতুন-নতুন গুণ দেখা যায়। কিন্তু সেই গুণগুলো হয়তো মানুষের চোখে দোষ। তাই আমি খুব চেষ্টা করি গুণগুলো আড়াল করে রাখতে।

কী আশ্চর্য আমার জীবন! মানুষের এত কাছাকাছি আমি বাস করি অথচ তা সত্ত্বেও মানুষ আমাকে ভাবে অমানুষ। আমাকে কিছুতেই আপন করে নিতে পারে না।

আমি জানি, এক ঠান্ডা গভীর অন্ধকার থেকে আমার উৎপত্তি। তারপর পথ চলা। শুধু পথ চলা। আমার বিনাশ বলে কিছু নেই। মানুষ আমাকে কখনও-কখনও ধ্বংস করে বটে, কিন্তু তা নিতান্তই সাময়িক। তখন আমি ফিরে যাই সেই ঠান্ডা অন্ধকার গহ্বরে। শীতঘুমে সময় কাটিয়ে দিই। তারপর...।

তারপর? তারপর যখন আবার খিদে টের পাই, তেষ্টা টের পাই, মানুষের টান টের পাই—তখন আমি জেগে উঠি। শীতঘুম ছেড়ে বেরিয়ে আসি বাইরের আলোর জগতে, লোকালয়ে। যেমন এখন।

ওই তো চোখে পড়ছে একটা বিশাল পাঁচিল ঘেরা এলাকা। তার ভেতরে, অনেকটা দূরে, একটা বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন প্রাসাদ। না, শুধু প্রাসাদও নয়—তার সঙ্গে রয়েছে ছোট-ছোট কয়েকটা বাড়ি আর ঘিরে থাকা বাগান। বাগানে কত বড়-বড় গাছ। গাছে কত পাতা। সেই পাতার ছায়ায় গাছের নীচটা দিনের আলোতেও অন্ধকার-অন্ধকার দেখাচ্ছে। আর সেই অন্ধকারে মাথাচাড়া দিয়েছে অজস্র আগাছা।

প্রকাণ্ড এলাকাটা রং-চটে-যাওয়া পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তারই এক জায়গায় সিং-দরজা। সব কিছু দেখে মনে হয় রাজা-রাজড়াদের ফেলে যাওয়া বাগান আর প্রাসাদ। এককালে তাদের হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আজ সবই পুরোনো স্মৃতি। শুধু রাজবাড়িটা অতীতের সাক্ষী হয়ে চুপচাপ মনের দুঃখে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে ঘিরে বিষণ্ণ গাছগুলো।

কিন্তু তাই কী? এখানে এখন কেউ থাকে না তা তো নয়!

কারণ, আমি মানুষের ঘ্রাণ পাচ্ছি। একটা-আধটা নয়, অনেক মানুষের।

শুধু তাই নয়, এত দূর থেকেও আমি কত মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি ছেলেদের গলা, মেয়েদের গলা।

উঁহু, বাড়িটা পুরোনো জীর্ণ হলেও এখানে অনেক মানুষ থাকে। আমাকে ওরা কোন অদৃশ্য টানে টানছে—কাছে টানছে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম।

আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছিল সকাল থেকেই। তার সঙ্গে দম আটকানো গুমোট। বৃষ্টি যে হবে তার গন্ধ আমি পাচ্ছিলাম। এও বুঝতে পারছিলাম, মেঘ আরও ঘন হবে, আরও কালো হবে। এখন দেখলাম আকাশটা একেবারে ছাই রঙের হয়ে গেছে। আর সেই রং-টা ক্রমশ কালোর দিকে ঢলে পড়ছে।

বৃষ্টির জল আমার ভালো লাগে না। বৃষ্টির জল ওপর থেকে আসে। প্রাকৃতিক পবিত্র জল। ওই জল গায়ে লাগলে আমরা—মানে, আমি আর আমার মতো যারা—নিস্তেজ হয়ে পড়ি। তাই ঠিক করলাম, আপাতত এই বাড়িটায় আমি আশ্রয় নিই। অনেক মানুষে ভরা এই আস্তানাটা আমার মন্দ লাগবে না।

সেদিকে এগোতে গিয়েই সিং-দরজার মাথায় বসানো হোর্ডিং-টা আমার চোখে পড়ল। তাতে বড়-বড় হরফে লেখা রয়েছে :

রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুল

ও, এটা তা হলে স্কুল!

ওঃ, ক'শো বছর আগে যে আমি স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম তা মনে নেই। কিন্তু যুগে-যুগে আমি মানুষের কাছ থেকে শিখেছি। যখনই আমি কোনও মানুষের শরীর আর মন দখল করেছি তখনই তার সব অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান আমার অস্তিত্বে মিশে গেছে। আমি বহু শতকের প্রাচীন হলেও সবসময় নবীনের কাছাকাছি থেকে শিখেছি। তাই প্রাচীন হলেও আমি সবসময় আধুনিক।

এখনও চিনতে পারোনি আমাকে?

আমি একজন পিশাচ—যার মধ্যে রয়েছে অতি প্রাচীন এক অমানুষ প্রেতাত্মা।

আমি একা। তবে ইচ্ছে হলেই অনেক হতে পারি—অ্যামিবার মতো।

আর যদি আমি তোমার ওপরে ভর করি, তোমার মধ্যে বাসা বাঁধি, তা হলে তখন তুমি পিশাচ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি।

আকাশ থেকে বৃষ্টির দু-একটা ফোঁটা পড়ল।

নাঃ, আর দেরি নয়। আমি সিং-দরজার দিকে এগোলাম। তালাবন্ধ দরজার জং ধরা লোহার রডের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দারোয়ানরা কেউ আমাকে দেখতে পেল না—কারণ, আগেই বলেছি, আমাকে দেখা যায় না—শুধু টের পাওয়া যায়।

সুন্দর পিচবাঁধানো রাস্তা আর ঘাসজমির ওপর দিয়ে প্রাচীন বাড়িটার দিকে যাওয়ার সময় আমি হঠাৎই একটা চেনা গন্ধ পেলাম। স্কুলবাড়ির দিক থেকেই আসছে গন্ধটা।

চমকে উঠলাম আমি। এ তো আমার মতোই গন্ধ! আমার একজন বন্ধু তা হলে রয়েছে ওই স্কুলবাড়িতে! আমার আগেই আমার মতো কেউ এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে! অথবা আস্তানা গেড়েছে ওই বাড়ির মানুষজনের ভেতরে! আনন্দ আর খুশিতে মনটা নেচে উঠল।

বৃষ্টির ফোঁটা হঠাৎই জোরে ঝরতে লাগল।

আর আমিও দেরি না করে ঢুকে পড়লাম স্কুলবাড়ির ভেতরে।

।।দুই।।

ইতিহাসের ক্লাস এমনভাবে চলছিল যেন টিভির নিউজ চ্যানেলে কোনও রোবট পরপর দুঃখের খবর পড়ে চলেছে।

রনিতা ম্যাডাম এভাবেই ক্লাস নেন বরাবর। আর সেই জন্যই পড়ার দিকে ইলিনার মন ছিল না। ও অনুষ্কার কথা ভাবছিল। মাত্র সাতদিন হল অনুষ্কা ওদের ক্লাসে ভরতি হয়েছে।

ইলিনার ডেস্কের ওপরে ইতিহাস বইয়ের পাতা খোলা ছিল। তার নীচে একটা রাফ খাতা। সেই খাতার শেষ পাতায় ইলিনা বারবার নিজের নাম লিখছিল। একবার ইংরেজিতে, আর-একবার বাংলায়। বেশ সুন্দর ডিজাইন করে অক্ষরগুলো তৈরি করছিল ও। সেগুলোর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় ওর অলঙ্করণের হাত বেশ ভালো।

ইলিনার খুব শখ ও ট্যাটু আর্টিস্ট হবে। এ পর্যন্ত ও প্রায় চল্লিশটা ট্যাটুর ডিজাইন এঁকেছে—লাল আর নীল কালি দিয়ে। সেগুলো একটা বাঁধানো ড্রইং খাতায় আঁকা আছে। সেটার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ওর নিত্য-নতুন নকশার আইডিয়া মাথায় আসে।

মাঝে-মাঝে ও বন্ধুদের হাতে বা পায়ে বলপয়েন্ট পেন দিয়ে ছোট-ছোট ট্যাটু এঁকে দেয়। অবশ্য বন্ধুদের পারমিশান নিয়ে তবেই। একবার গীতাঞ্জলির কনুইয়ের ওপরদিকটায় একটা বাজপাখির ডিজাইন এঁকে দিয়েছিল। সেটা রনিতা ম্যাডামের চোখে পড়ে গিয়েছিল। গীতাঞ্জলিকে তিনি বেশ বকুনি দিয়েছিলেন। কিন্তু গীতাঞ্জলি ইলিনার নাম বলেনি। বরং ট্যাটু আঁকার দায়টা ওর এক কাল্পনিক ভাইয়ের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল।

ইলিনার নামের অক্ষরের ডিজাইনগুলো অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো দেখাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা সেগুলো বেশ খুঁটিয়ে বিচার করছিল। হঠাৎই ক্লাসরুমের খোলা জানলায় একটা শালিখ এসে বসায় ওর সেদিকে চোখ গেল।

ক্লাসরুমের বাইরের দিকের দেওয়ালে দুটো বড়-বড় জানলা। তাতে ঝিলমিল লাগানো বিশাল পাল্লা। পাল্লার ওপরে ফুটদুয়েক চওড়া ঝিলমিল বসানো কাঠের পাটি। বহু পুরোনো আমলের রাজা-রাজড়াদের বাড়িতে যেমন থাকত। রাজা চন্দ্রভানুও বোধহয় সেরকম কেউকেটা কোনও রাজা কিংবা মহারাজা ছিলেন। তাঁর সেই রাজপ্রাসাদ প্রায় একশো বছর আগে স্কুল হয়ে গেছে।

শালিখ দেখতে গিয়ে ইলিনার চোখ গেল অনুষ্কার দিকে। মনে হল, ইলিনার মতো ওরও ইতিহাসে মন নেই, আর ও-ও যেন আনমনাভাবে খাতায় আঁকিবুকি কেটে চলেছে।

অনুষ্কাকে কেমন অদ্ভুত বলে মনে হয় ইলিনার। মাত্র সাতদিন আগে মেয়েটা ক্লাস টেন-এ ওদের সেকশানে এসে ভরতি হয়েছে। ওর বাবা সরকারি চাকরি করেন। ঝাড়খণ্ড থেকে ট্রান্সফার হয়ে কলকাতায় এসে পড়েছেন। তাই অনুষ্কা এই স্কুলে ভরতি হতে পেরেছে। নইলে ইলিনাদের স্কুলে ক্লাস টেন-এ কাউকে ভরতি নেওয়া হয় না।

অনুষ্কাকে দেখতে খুব সুন্দর। এত সুন্দর যে, অন্য মেয়েরা যখন-তখন ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ইলিনার খুব বিশ্বাস, কোনও ফিল্ম ডিরেক্টর ওকে দেখামাত্র সিনেমা কি টিভি-তে চান্স দিয়ে দেবে।

রনিতা ম্যাডাম আনমনা অনুষ্কাকে খেয়াল করেছিলেন। তাই ওকে 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য ওর দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'অনুষ্কা, তুমি বলো..।'

অনুষ্কা শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। নিষ্পাপ ফুটফুটে মুখে তাকাল ম্যাডামের দিকে।

রনিতা ম্যাডাম ক্লাস নাইন-এর কয়েকটা চ্যাপ্টার রিভাইজ করাচ্ছিলেন। তাই সম্রাট অশোকের ধর্মের বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন।

অনুষ্কাকে রনিতা ম্যাডাম জিগ্যেস করলেন, 'সম্রাট অশোক যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম তফাত কোথায় ছিল?'

রনিতা ম্যাডামের রোগা চেহারা। চশমার পিছনে চোখ দুটো বেশ রাগি। কপালে ভাঁজ। সবসময় ছাত্রীদের হেনস্থা করেন, শাস্তি দেওয়ার ফিকির খোঁজেন।

ইলিনা বুঝল, আজ অনুষ্কার রেহাই নেই। কপালে চূড়ান্ত বকুনি আছে। তারপর, যদি কপাল আরও খারাপ হয়, তা হলে ক্লাস সিক্সের রুমের সামনে গিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

ইলিনার বুকের ভেতরটা অকারণেই টিপটিপ করতে লাগল। ও স্থির চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু কী আশ্চর্য!

অনুষ্কা মিষ্টি গলায় ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'ম্যাডাম, বৌদ্ধধর্মের তুলনায় অশোকের প্রচার করা ধর্ম অনেক বেশি উদার আর মানবতাবাদী ছিল। অশোক তাঁর ধর্মে ব্যক্তিগত জীবন আর সমাজজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি দান, দয়া প্রভৃতি বারোটি গুণের অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচলিত ধর্মে নানা ধর্মের সার কথাগুলো জায়গা পেয়েছিল...।'

রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। শিকার হাতছাড়া হওয়ার দুঃখের চেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটাই বেশি করে ফুটে উঠল ওঁর মুখে। তিনি স্পষ্ট দেখেছেন, মেয়েটা অন্যমনস্ক হয়ে খাতায় কী যেন করছিল। তা হলে কী করে ওঁর এইমাত্র পড়ানো লাইনগুলো হুবহু বলে দিল!

অনুষ্কা কি ওঁর বলা কথাগুলো খাতায় টুকছিল? তারপর প্রশ্নের উত্তরে সেই লেখাগুলোই রিডিং পড়ে দিল?

কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় মেয়েটা তো খাতার দিকে তাকায়নি!

মরিয়া হয়ে ডায়াস থেকে নেমে এলেন রনিতা ম্যাডাম। মেয়েটার খাতাটা একবার দেখা দরকার।

'দেখি, তোমার খাতাটা দেখি—।' চটপটে পায়ে জানলার পাশ দিয়ে হেঁটে অনুষ্কার কাছে চলে এলেন।

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে ডেস্কের ওপরে রাখা খোলা খাতাটা দিদিমণির দিকে এগিয়ে দিল।

রনিতা ম্যাডাম দেখলেন। পাতা দুটোয় কিছু লেখা নেই। শুধু ডানদিকের পাতার নীচের কোনার দিকে কয়েকটা হিজিবিজি দাগ।

খাতাটা ওকে ফেরত দিয়ে সামান্য ধমকের সুরে 'বোসো' বলে ডায়াসের দিকে ফিরে গেলেন। ওঁর ফিরে যাওয়ার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা 'হেরে যাওয়া' ভাব ছিল।

ইলিনার খুব আনন্দ হচ্ছিল। ওর মনে হল অনুষ্কা যেন রনিতা ম্যাডামকে পালটা একটা 'শিক্ষা' দিল। অনুষ্কাকে একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করল ওর। ওর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করতেও ইচ্ছে করল।

কিন্তু সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম দিন থেকেই ইলিনা লক্ষ করেছে, অনুষ্কা ভীষণ একা-একা আর চুপচাপ থাকে—কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। ইলিনা দু-একবার আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথাবার্তা তেমন এগোয়নি।

রনিতা ম্যাডাম মঞ্চে উঠে আবার পড়াতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওঁর যান্ত্রিক আত্মবিশ্বাসে কেমন যেন চিড় ধরে গিয়েছিল। তাই পড়ানোর তাল আর লয় বারবার গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

ইলিনা ভাবছিল, পিরিয়ডটা শেষ হলে বাঁচি। কারণ, তারপরই টিফিন। তখন অন্তত আধঘণ্টা হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

আজ ওর পড়াশোনার মুড নেই। শুধু গল্প করতে ইচ্ছে করছে আর গান শুনতে ইচ্ছে করছে। কে জানে কেন—হয়তো আকাশটা মেঘলা বলেই। আর তার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মনখারাপের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

হঠাৎই টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। টিফিনের ঘণ্টার একটা বিশেষ ঢং আছে। ছুটির ঘণ্টারও তাই। ঠিক ফুটবল খেলায় হাফটাইম আর গোলের বাঁশি বাজানোয় যেমন তফাত থাকে।

ওদের স্কুলের ঘণ্টাটা দারুণ। একতলার বারান্দায় সিলিং থেকে ঝোলানো বড় পিতলের ঘণ্টা—ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের মতো। বৃদ্ধ বলাইদা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সেই ঘণ্টাটা টাইমে-টাইমে বাজিয়ে দেয়।

টিফিন হতেই গোটা ক্লাসটা স্বাধীন এবং এলোমেলো হয়ে গেল। কেউ-কেউ জানলার কাছে চলে গেল। আকাশ, বৃষ্টি আর গাছপালা দেখতে লাগল। বেশ কয়েকজন মেয়ে স্কুলব্যাগ থেকে টিফিনবক্স বের করে

টিফিন খেতে বসল।

আজ বৃষ্টির মধ্যে অন্য দিনের মতো একতলার উঠোনে কিংবা বাগানে গিয়ে ছুটোছুটি করে খেলার উপায় নেই। তাই অনেকে ক্লাসরুমের লাগোয়া করিডরে গিয়ে হইহুল্লোড় করতে লাগল।

ইলিনা টিফিনবক্সটা ব্যাগ থেকে বের করে নিল। তারপর তাকাল অনুষ্কার দিকে।

অনুষ্কা একটা খাতা খুলে তাতে মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছিল। ওর দু-পাশে পারমিতা আর সুচন্দ্রা বসে। এখন ওরা কেউ সিটে নেই। বোধহয় টিফিন খেতে বাইরের করিডরে কোথাও গেছে।

ইলিনার কেমন একটা জেদ চেপে গেল। আজ ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করবেই। গায়ে পড়ে হলেও ওর সঙ্গে আজ আলাপ করতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।

তাই ইচ্ছে আর জেদ সঙ্গী করে ও সরাসরি অনুষ্কার কাছে চলে গেল। ওর ডানপাশের খালি চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে বলল, ‘কী করছ?’

অনুষ্কা চোখ তুলে তাকাল ইলিনার দিকে।

কী সুন্দর গভীর দুটো চোখ! টানা-টানা, ঘন চোখের পাতার সীমানায় ঘেরা। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কাজল পরে এসেছে। ওর চোখের মণির ভেতরে চক্রের মতো অনেকগুলো বৃত্ত। সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় বৃত্তগুলো কোন পাতালে চলে গেছে।

‘একা-একা বসে কী করছ?’ ইলিনা আবার জিগ্যেস করল।

‘কিছু না।’ নীচু গলায় অনুষ্কা বলল।

ওর খাতার দিকে চোখ গেল ইলিনার। সেখানে অদ্ভুত একটা ছবি বারবার আঁকা—ছোট-বড় নানান মাপে। একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

দেখে কোনও একটা প্রতীকচিহ্ন গোছের ছবি বলে মনে হয়। অথবা কোনও ট্যাটুর নকশা।

‘এটা কীসের ছবি?’ ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জানতে চাইল।

‘ও কিছু না...।’

‘দারুণ হয়েছে কিন্তু। অনেকটা ট্যাটুর ডিজাইনের মতো। তুমি তো জানো আমি ট্যাটুর ডিজাইন আঁকি। খাতাটা পরে আমাকে দিয়ো—আমি ডিজাইনটা তুলে নেব।’

কথাটা শুনেই শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল অনুষ্কা। কেমন একটা ভয়ের চোখে তাকাল ইলিনার দিকে : ‘না, না—এটা বাজে ছবি। এটার কোনও মানে হয় না। ওয়ার্থলেস—।’

এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্কা ছবিগুলোর ওপরে এলোমেলো কাটা-কুটি দাগ আঁকতে লাগল। ছবিগুলো নিপুণভাবে নষ্ট করতে লাগল।

‘কী করছ! কী করছ! সুন্দর ছবিগুলো নষ্ট করছ কেন?’

কিন্তু অনুষ্কা ইলিনার কথায় মোটেই কান দিল না। কাটাকুটি দাগ কাটতে-কাটতেই বিড়বিড় করে বলল, ‘সুন্দর নয়, বাজে ছবি...বাজে ছবি...।’

ইলিনা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ওর আলাপের শুরুটা এভাবে ধাক্কা খাবে ও ভাবেনি।

প্রসঙ্গ পালটাতে ও টিফিনবক্স খুলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্টের জিভে-জল-আনা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। মা-মণি টিফিনবক্সে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। একটা খোপে চার পিস ফ্রেঞ্চ টোস্ট। তার পাশের খোপে একটা মিষ্টি। আর একটা ছোট পলিপ্যাকে টমেটো সস।

‘এসো, আমার টিফিন শেয়ার করো...।’

‘টিফিন?’ খানিক যেন দিশেহারা হয়ে ইলিনার দিকে তাকাল অনুষ্কা : ‘টিফিন তো আমার খাওয়া হয়ে গেছে...।’

ইলিনা বেশ অবাক হয়ে গেল। স্কুল বসেছে সকাল এগারোটায়। তারপর, চারটে পিরিয়ড শেষ হলে এই টিফিন ব্রেক। সুতরাং টিফিন ব্রেকের আগে টিফিন খাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাহলে অনুষ্কা এসব কী

বলছে? ওর টিফিন খাওয়া হয়ে গেছে!

'কখন টিফিন খেলে তুমি! আমাকে এত বোকা পেয়েছ!' বন্ধুত্বে ভরা মজার সুরে বলল ইলিনা, 'নাও, ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাও! আমার মা-মণি ভেজে দিয়েছে—।'

'না, মানে...আমার ঠিক খিদে নেই।' নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না...।'

অনুষ্কার মিষ্টি মুখে কাতর এক অনুনয় ফুটে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ইলিনা আর কিছু বলতে পারল না। তবে একইসঙ্গে ওর মনে পড়ল এই ছ'দিনে অনুষ্কাকে ও কোনওদিন টিফিন খেতে দেখেনি। অর্থাৎ, অনুষ্কা টিফিন খাচ্ছে এমন দৃশ্য ওর চোখে পড়েনি।

মুহূর্তের মধ্যে খটকাটা ডিঙিয়ে ও ফ্রেঞ্চ টোস্ট টমেটো সস-এ ছুঁইয়ে কামড় বসাল। খেতে-খেতে প্রসঙ্গ পালটে চলে গেল রনিতা ম্যাডামের দিকে।

'রনিতা ম্যাডামকে তুমি আজ দারুণ টাইট দিয়েছ। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি ওই সাডেন অ্যাটাকের মুখে ওরকম ঠিক-ঠিক আনসার দিতে পারবে...।'

'উঁ।' বলে ছোট্ট একটা শব্দ করল অনুষ্কা।

'কী করে পারলে বলো তো!' ইলিনা বলেই চলল, 'ফ্যানট্যাস্টিক! তুমি যে ক্লাসে এত মনোযোগ দিয়ে শোনো সেটা তোমাকে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না...।'

অনুষ্কা শান্ত চোখে তাকাল ইলিনার দিকে। বলল, 'মনোযোগ দিতে হয় না। আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে...।'

ইলিনা ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় দিতে গিয়ে থমকে গেল।

'আমাদের এমনিতেই সব মনে থাকে' মানে?

সে-কথাই ও জিগ্যেস করল, ' ''আমাদের'' বলছ কেন? আমাদের মানে?'

চমকে উঠল অনুষ্কা। তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'আমাদের মানে আমার। আমার এমনিতেই সব মনে থাকে...।' কথা শেষ করে হাসল।

ইলিনা অবাক চোখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল। একে তো অপরূপ সুন্দরী, তার ওপর এত গুণ! বাব্বাঃ! এমনিতেই সব মনে থাকে!

ভগবানের ওপরে রাগ হল ইলিনার। একজনকে উজাড় করে সবকিছু দেওয়ার কী দরকার ছিল? মনে থাকার ব্যাপারটা তিনি যদি কাইন্ডলি ইলিনাকে দিতেন তা হলে পরীক্ষার রেজাল্টটা অনেক ভালো হতে পারত। বাপি আর মা-মণির কাছ থেকে রেগুলার বকাবকি শুনতে হত না।

জানলার ফ্রেমে বাঁধানো আকাশটা আরও কালো হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুৎ সেই কালোর ওপরে মাঝে-মাঝেই সাদা তরোয়াল ঘোরাচ্ছিল।

ইলিনা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখবে, ছুটির সময় ঠিক বৃষ্টি হবে। তুমি ছাতা এনেছ তো? আমি এনেছি...।'

অনুষ্কা হাসল : 'হ্যাঁ, এনেছি। ছাতা ছাড়া আমি চলতেই পারি না। তা ছাড়া বৃষ্টি আমার একদম ভালো লাগে না...।'

'কেন?'

বৃষ্টি পড়ছিল—তবে তেমন জোরে নয়। সেদিকে অপছন্দের চোখে তাকাল অনুষ্কা। বলল, 'পরিবেশবিদরা বলেন, বৃষ্টির জলে অ্যাসিড থাকে...।'

'যাঃ, সে তো রেয়ার! তোমার এটা ভুল ধারণা—।'

'ভুল ধারণা হোক আর যা-ই হোক, বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না...।'

মেঘের গর্জন শোনা গেল আকাশে।

।।তিন।।

স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান আর বেশি দূরে নেই—মাত্র দু-মাস বাকি। নাচ, গান, আবৃত্তি আর নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের যে-কোনও কালচারাল প্রোগ্রামে শম্পা ম্যাডাম আর কাকলি ম্যাডাম সবসময় দায়িত্ব নেন।

শম্পা ম্যাডাম বেশ লম্বা, খুব সুন্দর নাচতে পারেন। আর সবসময় মুখে হাসি।

কাকলি ম্যাডাম মাথায় খাটো। মোটাসোটা। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন ফাটাফাটি। কিন্তু ওঁর ভীষণ ভূতের ভয়।

ইলিনাদের কালচারাল প্রোগ্রামের রিহার্সাল হয় ফেস্টিভ্যাল হলে। হলটা বিশাল বড়। ওলটানো 'ভি' অক্ষরের মতো টিনের চালে ঢাকা। অনেক সময় ছোটখাটো প্রোগ্রাম হলে এই হলঘরটাতেই সেরে নেওয়া হয়। কিন্তু স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশান মানে ঘ্যাম ব্যাপার। তখন খেলার মাঠে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল বাঁধা হয়।

গত বছর ইলিনারা ফেস্টিভ্যাল হলে সন্ধেবেলা গানের রিহার্সাল দিচ্ছিল। কাকলি ম্যাডাম ওদের 'চিত্রাঙ্গদা'-র গানগুলো তোলাচ্ছিলেন। তখন পাশের বাস্কেটবল গ্রাউন্ড থেকে অদ্ভুত এক শব্দ ভেসে এসেছিল।

স্কুলের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডটা বড় মাপের, কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। তার চারপাশটা লোহার জালের উঁচু রেলিং-এ ঘেরা। যখন খেলা-টেলা থাকে না তখন গ্রাউন্ডে ঢোকার লোহার গেটটায় তালা দেওয়া থাকে। সেদিনও তাই ছিল। তবুও সেখান থেকে ভেসে আসছিল খটখট-খটখট শব্দ। যেন অনেকগুলো টগবগে ঘোড়া বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিটের মেঝেতে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে।

এরপর ওদের গানের রিহার্সাল ভন্ডুল হয়ে গিয়েছিল।

ইলিনা স্কুলের কাজের মাসি আশাদির কাছে শুনেছে, এই স্কুলটা নাকি সাহেবি আমলে সৈন্যদের ছাউনি ছিল। স্কুলের বিশাল এলাকার নানান সব বিল্ডিং-এ সৈন্যরা থাকত। আর মেইন স্কুল বিল্ডিংটা ছিল হেস্টিংস সাহেবের কোয়ার্টার। একসময় হেস্টিংস রাজা চন্দ্রভানুকে এই বিশাল সম্পত্তি নামমাত্র দামে বিক্রি করে দেন।

এই স্কুল ক্যাম্পাসে যে সন্ধেবেলা কখনও-সখনও ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হয় এমন দুর্নাম বরাবরই ছিল।

কখনও মাঠের বড়-বড় গাছপালার ফাঁকে আলোর ফুটকি দেখা যায়। সেগুলো খসে পড়া তারার মতো ছুটোছুটি করে বেড়ায়।

কখনও বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায়।

একবার ক্লাস টেন-এর একটা মেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে আর-একটা মেয়েকে নীচে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল—কিন্তু মেয়েটির পড়ার কোনও শব্দ শোনা যায়নি বা একতলায় ছুটে গিয়ে কোনও বডি পড়ে থাকতে দেখা যায়নি।

কিন্তু এতসব গুজব, রটনা কিংবা দুর্নাম থাকলেও স্কুলটা যে এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ পড়াশোনা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুলের রেজাল্ট বরাবরই ঈর্ষা করার মতো।

আজ অ্যানুয়াল ফাংশানের গানের রিহার্সাল চলছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে একসঙ্গে বসিয়ে একটা গান তোলাচ্ছিলেন। পাশে বসেছিলেন শম্পা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। রবিনা ম্যাডাম খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারেন। ইলিনাদের প্রোগ্রামে সঞ্চালনা আর আবৃত্তির ব্যাপারটা তিনিই দেখাশোনা করেন। ম্যাডামের বয়কাট চুল আর মুখে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে বলে ওঁকে একটু রুক্ষ দেখায়। তবে ওঁর ব্যবহার খুব মিষ্টি আর দারুণ সাহস। একবার নাকি হেডমিসট্রেসের ভূতের ভয় তাড়াতে সন্ধে সাতটার সময় টর্চ ছাড়াই অন্ধকারে গোটা ক্যাম্পাসটা চক্কর দিয়ে এসেছিলেন।

রবিনা ম্যাডাম ইলিনাদের সবসময় বলেন, 'শোন, ভূত বলে কিছু নেই। আসলে তোরাই এক-একটা ভূত।'

তখন ক্লাসের আর-একটি মেয়ে, সজনী, ফোড়ন কেটে বলে উঠেছিল, 'ভূত না, ম্যাডাম—পেতনি...।' তাতে ক্লাসের সবাই হেসে উঠেছিল। আর রবিনা ম্যাডামও হাসি চাপতে পারেননি।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। মেঘও ডাকছিল আপন খেয়ালে। হলের টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ হচ্ছিল। খোলা জানলা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক চোখে পড়ছিল।

হলের মেঝেতে বিশাল মাপের তিনটে শতরঞ্চি পাতা। তার ওপরে সবাই বসেছিল। কাকলি ম্যাডাম ছ'জনকে গান তোলাচ্ছিলেন আর ইলিনারা দশ-বারো জন একটু দূরে বসে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় গল্পগুজব করছিল।

হঠাৎই ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওদের। মনে হল, বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের কংক্রিট বাঁধানো চাতালে যেন অনেকগুলো ঘোড়া এলোমেলোভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ইলিনা চমকে উঠল। ওর মনে পড়ল, প্রায় বছরখানেক এই শব্দটা শোনা যায়নি।

শব্দটা যে কাকলি ম্যাডামও শুনতে পেয়েছেন সেটা বোঝা গেল। কারণ, তিনি গান থামিয়ে দিয়েছেন। আশা-আশঙ্কার চোখে রবিনা ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন ভূত তাড়াতে রবিনা ম্যাডামই একমাত্র ভরসা।

ইলিনার পাশে বসে ছিল সমর্পিতা—সম্পি। ওর দশাসই মোটাসোটা চেহারা, আর ডাকাবুকো বলে স্কুলে বেশ খ্যাতি আছে।

সমর্পিতা এমন লম্বা-চওড়া যে, স্কুল-ইউনিফর্ম পরে থাকলেও ওকে ইলিনাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড় বলে মনে হয়। লেখাপড়া ছাড়া অন্য যে-কোনও কাজে ওর উৎসাহ অনেক বেশি। স্কুলের সবরকম অ্যাক্টিভিটিতে সম্পি সবার আগে হাজির। দিদিমণিদের কোনও ব্যক্তিগত কাজের জন্যেও ওর ডাক পড়ে। দিদিরা সবাই ওকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। আর বন্ধুদের মতো ওর বড় মাপের নামটাকে ছোট করে 'সম্পি' বলে ডাকেন।

ইলিনা সম্পির গায়ে ছোট্ট ঠেলা দিয়ে বলল, 'কী রে, কীসের আওয়াজ?'

সম্পি বলল হাত নেড়ে, 'ছাড় তো, ও কিছু নয়। ওই লাস্ট ইয়ারে যেমন শোনা গিয়েছিল। তারপর খোঁজ নিয়ে দেখবি হয়তো কাকু কিংবা মাসিদের কোয়ার্টারে কোনও ছেলেপিলে মেঝেতে নারকোলের মালা ঠুকে আওয়াজ করে খেলছে...।'

এটা ঠিকই যে, স্কুলের অনেক কর্মী—বলাইদা কিংবা আশাদির মতো—ক্যাম্পাসের মধ্যেই সংসার নিয়ে কোয়ার্টারে থাকে। টিনের চালে ছাওয়া ছোট-ছোট পাকা ঘরগুলোই ওদের কোয়ার্টার। ওদের কোনও ছেলেমেয়ে এই ভূতুড়ে কাণ্ড করতেই পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলিনার তেমন ভরসা হচ্ছিল না।

যেন ওকে সাহস দিতেই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল। তারপর গটগট করে পা ফেলে এগিয়ে গেল খোলা জানলার দিকে।

কাকলি ম্যাডাম ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সম্পি, কী করছ! যেয়ো না, যেয়ো না...।'

ম্যাডামের কথা সমর্পিতা শুনল না। জানলার কাছে পৌঁছে গেল। এবং ওর পিছু-পিছু রওনা হল ইলিনা, সজনী আর অঙ্গনা।

ভয় যে ওদের করছিল না তা নয়—কিন্তু কৌতূহলটাও কিছু কম ম্যাথাচাড়া দিচ্ছিল না।

রবিনা ম্যাডামের ভয়-টয়ের কোনও বালাই নেই। তিনিও কখন যেন ইলিনাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্য মেয়েরা তখন শতরঞ্চিতে বসে ভয় আর কৌতূহলের চোখে ইলিনাদের দিকে দেখছে।

জানলার বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার। আকাশে মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক। তারই মধ্যে নজর চালিয়ে সম্পি ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ আসছে ঠিকই, কিন্তু সাদা আলোর দু-একটা বিন্দুও চোখে পড়ছে যেন। মাপে জোনাকি পোকার মতো, কিন্তু অনেক উজ্জ্বল। বিন্দুগুলো চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক

ছিটকে বেড়াচ্ছে।

আকাশে গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকল। কিন্তু তাতে ঘোড়ার টগবগ শব্দ চাপা পড়ল না।

অঙ্গনা জিগ্যেস করল, 'ওই আলোগুলো কীসের? মনে হচ্ছে কারা যেন মিনি সার্চলাইট জ্বেলেছে।'

একইসঙ্গে ইলিনা টের পেল অঙ্গনা ওর গায়ের কাছে সরে এসেছে।

সমর্পিতা বলল, 'কীসের আলো সেটা গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।'

কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়ামের কাছে বসেছিলেন। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, না—যাওয়ার কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছে দেখছ না!'

রবিনা ম্যাডাম জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। সেদিকে চোখ রেখেই বললেন, 'এমন কিছু বৃষ্টি পড়ছে না—।'

এ-কথা শেষ হতে-না-হতেই সম্পি দৌড়ল হলের দরজার দিকে।

পিছন থেকে কাকলি ম্যাডাম, অঙ্গনা, ইলিনা সবাই 'সম্পি! সম্পি!' বলে ডাকতে লাগল।

কিন্তু সেসব ডাক সম্পির কানে বোধহয় ঢুকল না। ও ততক্ষণে হলের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেছে।

রবিনা ম্যাডাম আর দেরি করলেন না। সম্পির পিছন-পিছন দৌড়লেন। আর ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে ছুট লাগাল ইলিনা আর সজনী।

বাইরেটা অন্ধকার, জলে ভেজা। সামনে পিচের রাস্তা, তারপর ছোট্ট একটা পার্কের মতো। এই পার্কে পতাকা তোলার ফাংশান হয়।

পার্কের চারপাশের রেলিং বেশ খাটো। ওরা দেখল, শর্টকাট করার জন্য সম্পি লাফিয়ে পার্কের রেলিং ডিঙিয়ে ওপারে পৌঁছে গেছে। ইলিনা আর রবিনা ম্যাডামরা পার্কটাকে পাশ কাটিয়ে সম্পিকে ধরার জন্য দৌড়ল।

পার্ক পেরিয়ে একটা সবুজ মাঠ। তারপর বাস্কেটবল গ্রাউন্ড। সম্পি সেখানে পৌঁছে কয়েক লহমা দাঁড়াল। তারপর রেলিং ঘিরে দৌড়তে যাবে তখনই রবিনা ম্যাডাম ওকে ধরে ফেলল। একটু পরেই ইলিনা আর সজনী সেখানে পৌঁছে গেল।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের রেলিং উঁচু, তাই সেটা ডিঙোনোর প্রশ্ন ওঠে না। সেইজন্যই সম্পি বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ভাবছিল এরপর কী করবে। তা ছাড়া ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা এখন আর শোনা যাচ্ছিল না।

কিন্তু সাদা আলোর বিন্দুগুলো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

স্কুল-ক্যাম্পাসের নানা জায়গায় পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। রাস্তার একপাশে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইটপোস্ট। তার ঝিমিয়ে পড়া আলো অন্ধকারের সঙ্গে অসম লড়াই করছে।

ওরা সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভিজছিল আর হাঁপাচ্ছিল। তাকিয়ে ছিল খাঁ-খাঁ বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে। রাস্তার আলো সেখানে ছিটকে এসে পড়েছে। কংক্রিটে বাঁধানো গ্রাউন্ড বৃষ্টির জল পড়ে চকচক করছে।

রবিনা ম্যাডাম বললেন, 'এবার ফিরে চল। ওই ঘোড়ার খুরের শব্দ...ওটা হয়তো ভুল শুনেছি। তা ছাড়া ওটা শুধু শব্দ...ভয়ের কিছু নেই। তোদের কাকলি ম্যাডাম একটুতেই ভয়-টয় পায়। চল...।'

রবিনা ম্যাডামের কথার পিঠে সমর্পিতা বলল, 'সে না হয় বুঝলাম, ম্যাডাম। কিন্তু ওই আলোগুলো কীসের? এখন দেখছেন, ওগুলো কেমন এদিক থেকে ওদিকে লাফাচ্ছে!'

সত্যিই তাই। আলোগুলো এখন লাফিয়ে উঁচু থেকে নীচে নামছে, আবার নীচ থেকে লাফিয়ে ওপরে উঠছে। কখনও ওগুলো আবার দপ করে নিভে যাচ্ছে।

রবিনা ম্যাডাম একটু ইতস্তত করলেন। বোধহয় ভাবলেন, ছাত্রীর কাছে সাহসের পরীক্ষায় তিনি হেরে যেতে চান না। তাই বললেন, 'চল তা হলে, একবার কাছ থেকে দেখে আসি...।'

বাস্কেটবল গ্রাউন্ডকে পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে গেল। সামনে বড়-বড় গাছপালা, আর তার পরেই বিশাল খেলার মাঠ। এই মাঠে খেলাধুলো ছাড়াও স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়। সেই মাঠটার একপাশে প্রায়

তিনতলা সমান উঁচু একটা প্রকাণ্ড গাছ আছে। ওই গাছটা দেখলেই ইলিনার ভয় করে। কারণ, অত বড় গাছটায় একটিও পাতা নেই। শুধু অসংখ্য শুকনো ডালপালা কঙ্কালের মতো আকাশের দিকে ছড়িয়ে গেছে। হঠাৎ করে মনে হয়, কেউ যেন একশো হাতের পাঁচশো আঙুল আকাশের দিকে তুলে ভগবানের কাছে মুক্তি চাইছে।

বাস্কেটবল গ্রাউন্ড পেরিয়ে গাছপালার গাঢ় অন্ধকার এলাকায় ঢুকে পড়ল ওরা। ইলিনার এবার বেশ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ওরা কোনও অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছে।

গাছপালার পাতায় বৃষ্টি আটকালেও পাতা থেকে টপটপ করে জল ঝরে পড়ছিল। সজনী ইলিনার হাত চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল, এইভাবে ওদের শরীরে আর মনে ভরসার আদানপ্রদান হচ্ছিল।

সমর্পিতা রবিনা ম্যাডামকে বলল, ‘ওই দেখুন ম্যাডাম, আলোগুলো আরও কতটা দূরে...।’

‘মনে হয়, ওই মরা গাছটার কাছে...।’ রবিনা ম্যাডাম বললেন।

ওরা জলের ওপরে পায়ের ছপছপ শব্দ তুলে এগোতে লাগল।

আরও অনেকটা এগোতেই ওরা দৃশ্যটা ঠিকঠাক দেখতে পেল। কারণ, সেই মুহূর্তেই আকাশে নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে, আর বাজ পড়ার শব্দ কানে আসার আগেই ওরা শুনতে পেল খিলখিল হাসির শব্দ।

মরা গাছটা ইলিনাদের কাছ থেকে এখন অন্তত তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে। কিন্তু তার জন্য দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

তিনটে প্রাণী ওই মরা গাছটার ডালে নানান উচ্চতায় উবু হয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় ছাতা। আর ছাতার নীচের অন্ধকারে দুটো করে সাদা আলোর চোখ জ্বলছে।

ওরা খিলখিল করে হাসছে আর বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এ-ডাল থেকে সে-ডাল লাফাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে ভিজে মাঠে নেমে আসছে, কখনও-বা মাঠ থেকে সোঁ করে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে ডালে। ওদের হাতে ধরা ছাতাগুলো অনেকটা প্যারাশুটের মতো লাগছে।

সজনী ভয়ে চাপা চিৎকার করে উঠতেই ইলিনা চট করে ওর মুখে হাত চাপা দিল।

রবিনা ম্যাডাম মরা গাছটার দিকে চোখ রেখেই ভয়ের গলায় জিগ্যেস করলেন, ‘ওগুলো কী—মানুষ, না পশু?’

প্রশ্নটা কাকে লক্ষ্য করে সেটা বোঝা যায়নি বটে কিন্তু সমর্পিতা উত্তর দিল, ‘ওগুলো মানুষ নয়, ম্যাডাম। মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু...।’

সেই ‘খারাপ কিছু’-টা যে কী সেটা ওরা চারজন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল।

এমন সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ওদের হাসির শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। তারপরই বাজ পড়ার বিকট শব্দে সেটা কিছুক্ষণের জন্য চাপা পড়ে গেল।

ইলিনারা অন্ধকারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে সেই অলৌকিক সার্কাস দেখতে লাগল।

সজনী কাঁপা গলায় বলল, ‘ম্যাডাম, ফিরে চলুন। আমার...আমার ভয় করছে...।’

‘ফিরে যাব কেন?’ বকুনির সুরে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন রবিনা ম্যাডাম। আঁচলে জড়ানো হাতের মুঠোয় ধরা টর্চটা বের করে মাটির দিকে তাক করে জ্বেলে ধরলেন। টর্চের জোরালো সাদা আলোয় বৃষ্টি-ভেজা ঘাস আর পাতা চোখে পড়ল। রবিনা বললেন, ‘আমরা চারজন আছি—ভয় কীসের! আমরা সবাই মিলে তাড়া করলে ওরা...মানে, ওই অ্যানিম্যালগুলো পালাবে।’

রবিনার কথা শেষ হওয়ামাত্রই একটা চমকে ওঠা ঘটনা ঘটে গেল। সমর্পিতার ভেতরে কেউ যেন আচমকা সাহস এবং অ্যাকশনের সুইচ অন করে দিল। মেয়েটা ‘অ্যাই, তোরা কে রে?’ বলে কান-ফাটানো চিৎকার করে ভেজা মাঠের ওপর দিয়ে মরা গাছটা লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে ‘চোর! চোর!’ বলে চেঁচাতে লাগল।

রবিনা ম্যাডাম 'সম্পি! সম্পি!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে সেটাকে সামনে পিস্তলের মতো বাগিয়ে ধরে সম্পির পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করলেন। অবাক হয়ে ভাবলেন, মেয়েটা চেহারায় দশাসই হলেও বেশ জোরে ছুটতে পারে দেখছি!

রবিনা 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করছিলেন আর ইলিনাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সার যাচ্ছিলেন।

ইলিনা আর সজনী ভয় পেয়ে গেল। কারণ, ওদের দুই সাহসী সদস্য এখন আর ওদের পাশে নেই। তাই ওরাও রবিনা ম্যাডামকে লক্ষ্য করে দৌড়তে শুরু করল। আর একইসঙ্গে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করতে লাগল।

ওদের চারজনের চিৎকারে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার থেকে লোকজন বেরিয়ে এল। কিন্তু অন্ধকার আর বৃষ্টির জন্য ওরা ভালো করে কিছু ঠাহর করতে পারছিল না।

সম্পিদের 'চোর! চোর!' চিৎকারে প্রাণীগুলো কিন্তু মোটেই ভয় পায়নি। বরং ওদের হাসাহাসি আর লাফালাফির খেলা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সম্পি খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই ওরা লাফিয়ে মাটিতে নামল। তারপর হাসি বন্ধ করে মাথার ওপরে ছাতা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রবিনা ম্যাডাম সম্পিকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন। শাড়ি পরে থাকলেও ওঁর অ্যাথলেটিক শরীর ওঁকে দ্রুত দৌড়তে সাহায্য করছিল।

ঘোলাটে অন্ধকারে রবিনা প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

সম্পি রবিনার তুলনায় খানিকটা এগিয়ে ছিল। কিন্তু ও-ও ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু গাঢ় কালচে তিনটে ছাতার নড়াচড়া বুঝতে পারছিল।

যদি ওরা প্রাণীগুলোকে ঠিকমতো দেখতে পেত তাহলে আর এগোত না।

এমন সময় আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরপর দু-বার।

সম্পিরা দেখতে পেল ওদের। সঙ্গে-সঙ্গে ডাকাবুকো সম্পি আর রবিনা ম্যাডাম থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওঁদের চিৎকার থেমে গেল।

ছাতার নীচে তিনটে ফ্যাকাশে সাদা বিকৃত মুখ। চোখগুলো পুরোটা কালো—তাতে সাদা অংশ বলে কিছু নেই। শুধু মাঝখানে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। ওদের ঠোঁট জোড়া টুকটুকে লাল—যেন লিপস্টিকে রাঙানো। তিনজনেরই ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে আছে। আর সেই ফাঁক দিয়ে ওদের দাঁত দেখা যাচ্ছে। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসানো ঝকঝকে ইস্পাতের দাঁত। দাঁতগুলো মাপে ছোট, কিন্তু অসংখ্য।

এরা কারা? কোথা থেকে এল এখানে?

বিদ্যুতের আলো নিভে গেল। চারপাশ আবার ছায়া-অন্ধকার।

রবিনা ম্যাডামের হাত থরথর করে কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতে তিনি টর্চের আলো ছুড়ে দিলেন একজনের মুখে। তারপর আর-একজনের। তারপর...।

আবার দেখা গেল সেই ভয়ংকর মুখ। আরও ভয়ংকর ওদের পোশাক।

একজনের পরনে রঙিন শাড়ি। আর অন্য দুজনের গায়ে স্কুল-ড্রেস। সবুজ স্কার্ট আর সাদা টপ। মাথায় জোড়া বিনুনি করে ফিতে বাঁধা।

টর্চের আলোয় সাদা টপে রক্তের দাগ চোখে পড়ল যেন।

সঙ্গে সঙ্গে সম্পি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

রবিনা ম্যাডামের গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। ওঁর হাতে ধরা টর্চের আলোটা ভীষণ কাঁপছিল। তখনই বিদ্যুৎ চমকে উঠল আবার। তারপর কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বৃষ্টি আরও জোরে শুরু হল।

তিনটে মানুষ—কিংবা অমানুষ—আচমকা শূন্যে লাফ দিল। হাউইবাজির মতো ছিটকে চলে গেল দূরে।

তারপর আবার লাফ। আরও দূরে।

শেষে মিশে গেল অন্ধকারে।

এরকম লাফ মানুষ দিতে পারে না।

একটা অদ্ভুত 'গোঁ-গোঁ' শব্দ করে রবিনা ম্যাডাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। ওঁর হাতের টর্চ ছিটকে পড়ল দূরে।

সম্পি ওঁর শরীরের ওপরে ঝুঁকে পড়ে 'ম্যাডাম! ম্যাডাম!' বলে ডাকতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখল অনেকে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ফেস্টিভ্যাল হলের আলো আর সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের আলোর পটভূমিতে মানুষগুলোর ছায়া দেখা যাচ্ছে।

।।চার।।

পরদিন স্কুলে হইচই যেটা হল সেটার ধরনটা অনেকটা ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো।

মেয়েদের মধ্যে চাপা ফিসফাস, তর্কবিতর্ক চলতে লাগল। আর সমর্পিতাকে ঘিরে যত উত্তেজনা, যত আলোড়ন। ও যেন সাহসের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছে। ওকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি ভিড়। তারপর হালকাভাবে ঘেরাও হয়েছে ইলিনা, সজনী, আর রিহার্সালে হাজির থাকা বাকি মেয়েরা।

ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে কিংবা ক্লাসের মধ্যেই সম্পিকে একই কাহিনি বারবার বলতে হচ্ছে। অন্য মেয়েরা এক-একটা ক্লাসের পর পালা করে বসার জায়গা পালটে সম্পির পাশে গিয়ে বসছে। এইভাবে গতকাল রাতের ভয়ংকর কাহিনি ছড়িয়ে গেল প্রায় সব ক্লাসেই।

স্কুলের হেডমিসট্রেস মিসেস প্রীতি দত্ত বেশ রাশভারী মানুষ। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা। ওঁকে খুব কম সময়েই হাসতে দেখা যায়।

তিনি সকাল থেকে প্রতিটি ক্লাসে ভিজিট করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি গুজব না ছড়ায়।

ইলিনাদের ক্লাসে হেডমিসট্রেস এলেন। তখন কাকলি ম্যাডামের বাংলা ক্লাস চলছিল। ছাত্রীদের লক্ষ করে বড়দি বললেন, 'শোনো, মেয়েরা। কাল রাতে যা হয়েছে সেটা আমার কানে এসেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সিম্পলি একটা...মানে...অ্যাক্সিডেন্ট। একে তো রাত, তার ওপরে মেঘ-বৃষ্টি। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা হ্যালুসিনেশান...মানে, দেখার ভুল হতে পারে। তা ছাড়া রবিনার তো শরীর ভালো নয়—লো প্রেশারে ভোগে। তাই ও হঠাৎ করে সেন্সলেস হয়ে গেছে...।

'যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কারও সঙ্গে আর আলোচনা কোরো না। বরং বেস্ট হবে, যদি তোমরা সবাই এই ইনসিডেন্টটা ভুলে যাও। তা না হলে কথার পিঠে কথা ছড়াবে...তারপর কোন সময় দেখবে পুলিশ আর টিভি চ্যানেলের লোকজন স্কুলে এসে হাজির হবে, আর হাজারটা কোয়েশ্চেন করে আমাদের সবাইকে জ্বালিয়ে খাবে। তা ছাড়া আমাদের স্কুলের একটা নামডাক আছে। সম্মান আছে।

'তা হলে মনে থাকবে তো? ব্যাপারটা আর কিছুই নয়...রাতবিরেতে দেখার ভুল। বুঝলে?'

ক্লাসের সব মেয়ে একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলল, 'মনে থাকবে, বড়দি।'

কাকলি ম্যাডামও কাঁচুমাচু মুখে ঘাড় কাত করলেন।

হঠাৎই সমর্পিতা উঠে দাঁড়াল : 'বড়দি—।'

প্রীতি দত্ত ভুরু কুঁচকে বড়সড় চেহারার ছাত্রীটির দিকে তাকালেন।

ইলিনা আর সজনীর বুক দুরদুর করে উঠল। ওরা আঁচ করতে পারল সম্পি কী বলতে চলেছে। এই বোধহয় ও বড়দির বকুনি খেল!

'বড়দি, আমি কাল রাতে রবিনা ম্যাডামের সঙ্গে ছিলাম।'

'হ্যাঁ। জানি। তো?' ভুরুজোড়া আরও কাছাকাছি চলে এল।

'রবিনা ম্যাডাম...অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হইনি। আমি...সবটা নিজের চোখে দেখেছি—।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। রবিনা বলেছে। কিন্তু এখন আর কোনও কথা শুনতে চাই না। তুমি, ইলিনা আর সজনী বরং টিফিনের সময় আমার রুমে এসো—তখন সব শুনব, আর আমার যা বলার বলব।' চোখের চশমাটা ঠিকঠাক করে নাকের ওপরে বসালেন প্রীতি দত্ত : 'মোট কথা, এ-ব্যাপারে যেন একটা শব্দও বাইরে না যায়। আমাদের স্কুলের সুনামই হচ্ছে প্রথম এবং শেষ কথা। বুঝেছে?' শেষ শব্দটায় ধমকের সুর আরও স্পষ্ট শোনাল।

সমর্পিতা বেশ দমে গেল। ওর মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল। আর কোনও কথা না বলে ও গুম হয়ে বসে পড়ল। কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে একটা রাগ তৈরি হল। সবকিছু ও নিজের চোখে দেখেছে। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা ওকে 'দেখার ভুল' বলে মানতে হবে!

এটা ঠিকই যে, আকাশে মেঘ ছিল, বৃষ্টি ছিল, অন্ধকার ছিল। কিন্তু বিদ্যুতের আলোও তো ছিল! তার সঙ্গে টর্চের আলো। তা ছাড়া ওদের চোখগুলো জ্বলছিল!

বড়দি ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সজনী আর ইলিনা ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে সম্পির দু-পাশে এসে বসে পড়ল। তারপর চাপা গলায় ফুসুর-ফুসুর শুরু করল। টিফিনের সময় বড়দির মুখোমুখি হওয়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কাকলি ম্যাডামের ক্লাসের দিকে ওদের আর মন রইল না।

সম্পি চাপা গলায় ইলিনাকে বলল, 'আমি স্পষ্ট দেখেছি, দুজনের গায়ে আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস ছিল। আর-একজনের ছিল শাড়ি।'

সম্পিদের কাছ থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও স্কুল-ড্রেস-এর ব্যাপারটা ইলিনা আর সজনীরও নজরে পড়েছিল। তাই 'হুঁ' বলে ওরা দুজনে ঘাড় নাড়ল।

সম্পি বলল, 'তার মানে, দুজন আমাদের স্কুলেরই স্টুডেন্ট—নাইন অথবা টেন-এর...।'

ওর এ-কথা বলার কারণ, সিনিয়ার স্কুলের ক্লাস নাইন আর টেন-এর স্টুডেন্টদের ড্রেস সাদা টপ আর সবুজ স্কার্ট। ফাইভ থেকে এইট পর্যন্ত স্কুল-ড্রেসটা অন্যরকম—সাদা ফ্রক, সবুজ টিউনিক। আর জুনিয়ার স্কুলের বিল্ডিংও আলাদা, ড্রেসও আলাদা : সবুজ পাড় আর পাইপিং লাগানো সাদা ফ্রক।

সম্পি আবার বলল, 'আর শাড়িটা দেখেছিলি? ওটার রং ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি, তবে পাড়ের চওড়া ডিজাইনটা আমার মনে আছে...।'

'তাতে কী হয়েছে?' ইলিনা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সম্পি ফিসফিস করে বলল, 'কাল ওই ডিজাইনের শাড়ি পরে আমাদের একজন ম্যাডাম স্কুলে এসেছিল...।'

ইলিনা আর সজনীর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল।

কাল ওদের একজন ম্যাডাম সেই একই ডিজাইনের শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন? তারপর সেই ম্যাডাম অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে খেলার মাঠের ওই মরা গাছটার ডাল থেকে ডালে ছাতা মাথায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছিলেন? এ কী সর্বনেশে ব্যাপার!

'তুই জানিস কে সেই ম্যাডাম?' উত্তেজনায় কেঁপে যাওয়া গলায় জানতে চাইল সজনী।

'হ্যাঁ, জানি।' দুষ্টুমির চোখে একে-একে ইলিনা আর সজনীকে দেখল সম্পি। তারপর : 'কিন্তু নামটা তোদের এখন বলব না। আমি চুপচাপ থেকে ক'টা দিন ওই ম্যাডামের ওপরে নজর রেখে দেখি। তারপর...।'

ইলিনা সম্পির দিকে তাকাল।

সম্পির ফোলা-ফোলা গাল, অথচ তা সত্ত্বেও চোয়ালের শক্ত রেখা বেশ স্পষ্ট। ক্লাসরুমের পাখা বনবন করে ঘুরছে, কিন্তু সম্পির গালে, কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম।

দেখে মনে হচ্ছিল, সম্পি ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো ছানবিন করবে বলে শপথ নিয়েছে।

ইলিনার ভয়-ভয় করে উঠল। কারণ, কাল রাতের তিনটে প্রেতিনীর মড়ার মতো মুখ ও অস্পষ্টভাবে হলেও দেখতে পেয়েছে। তা ছাড়া ওই খিলখিল হাসি!

ইলিনা আমতা-আমতা করে জিগ্যেস করল, 'বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবি?'

'এসব কিচ্ছু বলব না। বলব আমি যা দেখেছি...।'

কথাটা সম্পি আর শেষ করল না। কারণ, ঠিক তখনই বাংলার ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

টিফিনের স্বতঃস্ফূর্ত হইচই আজ বেশ কম মনে হল। কারণ, গতকালের অদ্ভুত খবরটা ফিসফিসে প্রচারে অনেকটাই ছড়িয়ে গেছে।

অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চোখ গেল ইলিনার। ও আজ আসেনি। সকাল থেকেই ইলিনার চোখ বারবার অনুষ্কার ডেস্কের দিকে চলে যাচ্ছে। কেন কে জানে!

ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা তাড়াহুড়ো করে টিফিন খাওয়া শেষ করল। বড়দির ঘরে ডাক পড়েছে বলে তিনজনের বুক দুরদুর করছিল। ইলিনা ক্লাসরুমের বড় জানলা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল। আকাশ মেঘলা। তার সঙ্গে সকাল থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

বড়দির কাছে গিয়ে কী বলবে সেটা সম্পি, ইলিনা আর সজনী বেশ কয়েকবার চাপা গলায় রিহার্সাল দিল। সম্পি বারবার বলছিল, 'আমি যা দেখেছি সেটাই স্ট্রেটকাট বড়দিকে বলব। যা সত্যি, তাই। লুকোনোর কী আছে?'

ইলিনা আর সজনী ওকে বোঝাতে লাগল।

এ নিয়ে অনেক সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনে প্রায় হাতে হাত ধরে বড়দির ঘরের দিকে রওনা হল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল।

একতলায় প্রীতি দত্তর বিশাল ঘর। ঘরের দু-পাশে দুটো করে জানলা। তাদের মাপ এত বড় যে, সাধারণ বাড়ির দরজাকেও হার মানায়। ডানদিকের খোলা জানলা দিয়ে স্কুলের লাগোয়া ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে। বাগান পেরোলেই চোখে পড়ছে খাটো পাঁচিল ঘেরা এলাকা—তার ভেতরে ছোট-ছোট সার্ভেন্টস কোয়ার্টার।

সময়ের আঁচড়ে ময়লা হয়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড মাপের সেক্রেটারিয়াট টেবিল। তার পিছনে বড়দি মুখ ভার করে বসে আছেন। টেবিলের ওপরে পেন স্ট্যান্ড, রাইটিং প্যাড, একটা মোবাইল ফোন, আর রাজ্যের খাতাপত্র ছড়ানো। টেবিলের একপাশে একটা পুরোনো মডেলের কম্পিউটার। আর বড়দির সামনে একটা গোলাপি রঙের কোঁচকানো রুমাল, তার পাশে একটা প্লাস্টিকের চাকতি দিয়ে ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাসে আধগ্লাস জল।

বড়দির মুখোমুখি চারটে হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ার। চারটেই খালি। চেয়ারের পিঠ ধরে ইলিনারা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বড়দির কথার অপেক্ষা করতে লাগল।

মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা ঢাউস সিলিং ফ্যান 'ক্যাঁচক্যাঁচ' শব্দে ঘুরছিল। সেই বাতাসের ঝাপটায় ট্যালকাম পাউডারের হালকা গন্ধ ওদের নাকে আসছিল। আর বড়দির গলায় পাউডারের ছোপ চোখে পড়ছিল।

প্রীতি দত্ত ঠান্ডা চোখে সম্পির দিকে তাকালেন। অন্তত দশ সেকেন্ড স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন—যেন ওকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করছেন।

তারপর অতিরিক্ত মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সমর্পিতা...তাই তো নাম তোমার?'

সম্পি চুপচাপ মাথা নাড়ল। যার মানে, হ্যাঁ।

'...এবার বলো তো, কাল রাতে তুমি ঠিক কী দেখেছ?'

ইলিনা বড়দির শাড়িটা লক্ষ করছিল। আজ বড়দি একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে এসেছেন। চওড়া পাড়ে গাঢ় সবুজ রঙের নকশা তোলা। হালকা সবুজ জমির ওপরে গাঢ় সবুজের কলকা বোনা।

'মনে হয়...মনে হয়...' মেঝের দিকে তাকিয়ে আঙুল খুঁটতে লাগল সম্পি। বারকয়েক হোঁচট খেয়ে বলল, 'মনে হয়...মনে হয় আমি...ভুল দেখেছি, বড়দি। ওই অন্ধকার, মেঘ, তার ওপরে বৃষ্টি...।'

ইলিনা আর সজনী অবাক চোখে সমর্পিতার দিকে তাকাল।

এসব কী বলছে সম্পি? একটু আগেই না বলছিল, একজনের শাড়ির পাড়ের ডিজাইনটা ও লক্ষ করেছে! গতকাল একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে স্কুলে এসেছিলেন। সেই ম্যাডামের ওপরে ও নজর রাখছে। এবং যা সত্যি তাই বলবে বড়দিকে।

তা হলে?

ইলিনা আর সজনীকে আরও অবাক করে দিয়ে সম্পি বড়দিকে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, বড়দি। কাল রাতে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল। মানে, ব্যাপারটা মনে হয় আমার দেখার ভুল। মানে...ওই যে আপনি বললেন না...হ্যালু...।'

'হ্যালুসিনেশান।' একগাল হেসে ওকে কথাটা ধরিয়ে দিলেন প্রীতি দত্ত, 'এই তো ভালো মেয়ের মতো কথা। গুড গার্ল।' এবার তিনি ইলিনা আর সজনীর দিকে তাকালেন : 'তোমরা কিছু বলবে?'

অবাক ভাবটা কাটিয়ে ইলিনা আর সজনী একইসঙ্গে মাথা নাড়ল : 'না, বড়দি, আমরা কিছুই দেখতে পাইনি—।' ওরা তখনও আড়চোখে বারবার সম্পিকে দেখছিল।

'গুড।' খুশির গলায় বললেন প্রীতি। তারপর স্নেহমাখা মোলায়েম গলায় আরও বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়েছ। স্কুলের ভালোমন্দ অনেকটাই বুঝবে। জানো, সুনাম তৈরি করতে বহু বছর লেগে যায়! কিন্তু দুর্নাম?' একটু থামলেন। তারপর : 'দুর্নাম হওয়ার জন্যে একটা দিনই যথেষ্ট। আসলে...।'

বড়দির বক্তব্যের স্রোতে বাধা পড়ল। কারণ, মলিনাদি ঘরে এসে ঢুকল।

মলিনাদি বড়দির খাসবেয়ারা। তা ছাড়া ক্লাসে-ক্লাসে নোটিস নিয়ে যায়।

মলিনাদি বেশ মোটাসোটা। রং কালো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা—তার একটা ডাঁটিতে তাপ্পি লাগানো।

ইলিনারা লক্ষ করল মলিনাদি বেশ হাঁপাচ্ছে, আর চোখগুলো গোল-গোল।

'কী হয়েছে, মলি?' কথা থামিয়ে প্রীতি দত্ত প্রশ্ন করলেন।

বড়-বড় শ্বাস টেনে-টেনে মলিনা বলল, 'বলাইদার ছেলে...বলাইদার ছেলে...পরান...পরান...।'

'কী হয়েছে পরানের? কী হয়েছে?' বড়দি প্রশ্ন করতে-করতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'পরান...পরান মারা গেছে গো, দিদি, মারা গেছে!' এ-কথা বলেই মলিনা চাকরিজীবনে কখনও যা করেনি তাই করে বসল। বড়দির সামনেই ধপাস করে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল এবং বুকে দু-হাত চেপে উত্তেজনাটাকে সামাল দিতে চেষ্টা করল।

মলিনার অসংলগ্ন কথা থেকে প্রীতি দত্ত অনেক কষ্টে গোটা গল্পটা উদ্ধার করলেন।

স্কুলের ঘণ্টা বাজায় যে-বলাইদা, সে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে।

তার বয়েস অনেক। মাথার মাঝখানে টাক। তার চারদিকে সাদা ঝালরের মতো চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি। খানিকটা কুঁজো হয়ে থাকা বৃদ্ধ শরীর। ধীরে-ধীরে হাঁটা-চলা করে। কিন্তু বলাইদার ঘণ্টা বাজানোর জোর অবাক করে দেওয়ার মতো।

সেই বলাইদার জোয়ান ছেলে পরান কাছাকাছি একটা রেশন-দোকানে চাকরি করে। অনেক সময় হিসেবনিকেশের চাপে পরান রাতে সেই দোকানেই থেকে যায়। কাল রাতেও সেরকম কিছু একটা হয়েছে বলে বলাইদারা ভেবেছিল। কিন্তু আজ সকালে পরান না ফেরায় বলাইদারা অপেক্ষা করে-করে শেষ পর্যন্ত বেলায় পরানের খোঁজ করতে সেই দোকানে যায়। গিয়ে শোনে, গতকাল রাতে পরান বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি রওনা হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য ও দোকান থেকে শুধু একটা পলিথিনের প্যাকেট নিয়েছিল।

তখন বলাইদারা পাগলের মতো পরানের খোঁজ করতে থাকে। হাসপাতালে, থানায়, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে—সব জায়গায়।

কিন্তু পরানকে পাওয়া যায়নি।

তারপর, একটু আগে, কোয়ার্টারের একটা বাচ্চা ছেলে স্কুলের পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে 'ছোট বাইরে' করতে গিয়ে পরানের ডেডবডি দেখতে পায়।

চারটে বড়-বড় আমগাছ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের মাঝে বৃষ্টির জলে ভেজা আগাছা আর ঘাস-পাতার ওপরে পরানের দেহটা পড়ে ছিল। ওর মাথাটা ছিল একটা পলিথিনের প্যাকেটে ঢাকা।

বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে না পেরে 'পরানদা, পরানদা—' বলে পলিথিনের প্যাকেটটা ধরে টান মারে। জলে ভেজা প্যাকেটটা খুলে আসতেই পরানের ফ্যাকাশে মুখটা দেখা যায়।

পরানের গায়ের রং শ্যামলা হলেও দেখা গেল, ওর সারাটা শরীর সাদাটে, রক্তশূন্য। চোখ দুটো বড়-বড়, যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। আর ঘাড়ে-গলায় চার-পাঁচ জায়গায় গভীর ক্ষতের দাগ। সেখানে কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

এসব কথা শুনে প্রীতি দত্তের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর মলিনাদি বলল, সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের কারা যেন বড়দির পারমিশান না নিয়ে এর মধ্যেই পুলিশে খবর দিয়ে দিয়েছে।

ইলিনা, সম্পি আর সজনী ভয়ে রীতিমতো কাঁপছিল। পরানের মৃতদেহের যে-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মলিনাদি দিয়েছে তাতেই ওরা রক্তশূন্য ছাইরঙা ডেডবডিটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল।

প্রীতি দত্ত টেবিল থেকে গ্লাস তুলে নিয়ে দু-ঢোঁক জল খেলেন। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নেওয়ার পর কিছুটা সামলে উঠলেন। তারপর তড়িঘড়ি সম্পিদের বিদায় দিলেন। আপনমনেই বললেন, 'কী-সর্বনাশ! মনে হচ্ছে, স্কুল ক'দিন ছুটি দিতে হবে...।'

মলিনা ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'আমি বডিটা স্বচক্ষে দেখে এলুম, দিদি। এ একেবারে অপঘাতে মিত্যু। নিঘঘাৎ ডাকিনি-পিশাচের কাজ। সারা শরীরটায় রক্ত নেই। একেবারে সাদা। এবারে কী হবে, দিদি?'

মলিনার আর্ত আবেদন বড়দির কানে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না। তিনি তখন টেবিল থেকে মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিয়েছেন। কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে মলিনার উচচারণ করা মারাত্মক দুটো শব্দ নিয়ে ভাবছেন।

এই স্কুলে ডাকিনি আর পিশাচ এল কোথা থেকে?

।।পাঁচ।।

তিন দিন স্কুল ছুটি দেওয়া হল। তার সঙ্গে রবিবার জুড়ে গিয়ে চার দিন। সেই চারদিনে পুলিশি তদন্ত মোটামুটি একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু পরানের দেহের রক্তশূন্যতার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। পুলিশের রিপোর্টে হায়েনা, গোসাপ কিংবা বড়সড় কোনও বেজির আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বলা হল—যদিও পুলিশের লোকজনের কাছে প্রচুর প্রশ্নচিহ্ন থেকে গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা যাতে কম হয় সেইজন্য প্রীতি দত্ত পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে শুধু রবিনা ম্যাডামের কথা বলেছেন। বলেছেন, সেই রাতে ওইসব আজগুবি কাণ্ডকারখানা রবিনা ম্যাডাম একা দেখেছেন—ছাত্রীরা কেউ দেখেনি। তাই ইলিনারা পুলিশের জেরা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

সোমবার স্কুলে গিয়ে স্কুলটাকে নতুন চোখে দেখতে চাইল ইলিনা।

আজ বৃষ্টি নেই। আকাশে মেঘের চেহারা অনেক ফিকে। কিন্তু সেই রাতের ঘটনাটা চোখের সামনে থেকে কিছুতেই সরে যাচ্ছে না।

কালো মেঘ। লিকলিকে শাখা-প্রশাখা ছড়ানো মরা গাছ। অন্ধকার রাত। আর সেই উজ্জ্বল আলোর চোখ।

ঘটনার পরদিন সকালে স্কুলের দিকে আসার সময় মরা গাছটার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল ইলিনা। ওটার চারপাশে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নজর বুলিয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতের ওই ঘটনার কোনও চিহ্ন খুঁজে

পায়নি। তা সত্ত্বেও ওর গা ছমছম করছিল।

তারপর, পরানের অপঘাতে মারা যাওয়ার খবরটা পাওয়ার পর, ওর মনে হয়েছে, ওই 'খারাপ' প্রাণীগুলো কখনও চিহ্ন রেখে যায় না।

আজ সকালেও স্কুলে আসার সময় দূর থেকে ওই মরা গাছটার দিকে ইলিনা তাকিয়ে থেকেছে। আর তখনই এক অদ্ভুত শিরশিরানি টের পেয়েছে শরীরে।

আজ ক্লাসে ঢুকে অনুষ্কাকে দেখতে পেয়ে ওর খুব ভালো লাগল। সুন্দর টলটলে মুখটি নিয়ে চুপচাপ নিজের ডেস্কে বসে আছে। ওর মুখের ডানপাশে জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় ওকে কেমন যেন স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে। নিজের চিন্তায় ডুবে থাকা এক রূপসী।

অনুষ্কার দু-পাশে রেখা আর সঞ্চিতা বসে। দুজনের মধ্যে রেখার সঙ্গে ইলিনার রিলেশানটা বেটার। তাই ও রেখাকে বলে বসার জায়গা অদলবদল করল। পিঠের ব্যাগ হাতে নিয়ে অনুষ্কার পাশের ডেস্কে বসে পড়ল।

'অনেকদিন তোমাকে দেখিনি।' ইলিনা হেসে বলল।

'স্কুল তো ছুটি ছিল। তা ছাড়া সেই বাজে দিনটায় আমি তো আসিনি...তার পরের দিনও আসিনি।'

না এলেও অনুষ্কা ফোনে-ফোনে সব ঘটনাই জেনে গেছে। বড়দি যতই বারণ করে থাকুন, এই ভয়ংকর বিচিত্র ব্যাপারটা নিয়ে চাপা কথাচালাচালি মোটেই বন্ধ হয়নি।

ইলিনাও এই ছুটির মধ্যে অনুষ্কাকে ফোন করেছিল। ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলে ইলিনার মনে হয়েছিল অনুষ্কা যেন কিছু বলতে চায় কিন্তু বলতে পারছে না।

ক্লাস শুরু হতে এখনও সাতমিনিট বাকি। তাই গোটা ক্লাসে ভোমরার গুনগুন চলছিল। ইলিনা অনুষ্কার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'জানো, আমার না এখন স্কুলে আসতে ভয় করে...।'

'কেন?' অনুষ্কা ভুরু তুলে তাকাল।

'ওই রাতটার কথা বারবার মনে পড়ে...।'

অনুষ্কা একটা হাত রাখল ইলিনার হাতে। ওর ছোঁয়া ইলিনার ভালো লাগল। সেই ছোঁয়ায় কেমন যেন একটা ভরসা ছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, 'আজ ছুটির পর তুমি বরং আমার বাড়িতে চলো। বাপি গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে আসবে। তারপর বাড়িতে গিয়ে আমরা অনেক গল্প করব। সময়টা দারুণ কাটবে। তুমি—।'

'তোমার কোনও প্রবলেম হবে না তো!' ইলিনা কথাটা বলল বটে, কিন্তু ওর ভেতরে-ভেতরে খুব আনন্দ হচ্ছিল। সেই প্রথম দিন থেকেই ও অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে, বন্ধুত্ব করতে চেয়েছে। আর আজ অনুষ্কা নিজে থেকেই ওকে ওর বাড়িতে যেতে বলছে! এই প্রথম।

'না, না, প্রবলেম কীসের!' অনুষ্কা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমিই তো তোমাকে আসার জন্যে রিকোয়েস্ট করছি।'

'কিন্তু বাড়িতে ফোন করে একটু বলতে হবে—নইলে মা ভীষণ টেনশান করবে।'

স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা শুধু নয়, সঙ্গে করে নিয়ে আসাটাই বারণ। এ নিয়ে গত বছরে একটা বড়সড় গোলমাল হয়েছিল। সুতরাং ইলিনার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। ওদের কারও কাছে সেলফোন নেই। মা-কে ফোন করে খবরটা দেবে কেমন করে!

ওর মনের কথা অনুষ্কা বোধহয় টের পেল। বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই। বাপির সঙ্গে মোবাইল থাকে। ছুটির পর বাপির ফোন থেকে তুমি আন্টিকে ফোন করে দিয়ো। তার সঙ্গে বোলো, আন্টি যেন তোমার ফেরার চিন্তা না করেন। বাপি তোমাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসবে—অবশ্য বাপির সঙ্গে আমিও থাকব।' হেসে কথাটা শেষ করল অনুষ্কা। কিন্তু তারপরই হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'আমার বাড়িতে যাচ্ছ এ-কথাটা কাউকে এখন বোলো না...প্লিজ...।'

'বলব না।' মাথা হেলিয়ে বলল ইলিনা। ভাবল, অনুষ্কাটা এত মুখচোরা কেন কে জানে! তা ছাড়া ওর বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা গোপন করারই বা কী আছে?

ইলিনার একটু অবাক লাগছিল। যে-অনুষ্কা সবার সঙ্গে আলাপ-টালাপ করার ব্যাপারটা সবসময় এড়িয়ে চলে সে হঠাৎ ইলিনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করছে! এ-ক'দিনে ও হঠাৎ পালটে গেল কেন?

সে যাই হোক, ইলিনার মনটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। আর তখনই স্কুলের প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ল।

একটার পর একটা ক্লাস পেরিয়ে সময়টা ক্রমশ বিকেলের দিকে গড়াতে লাগল, আর ইলিনার উৎফুল্লতা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়তে লাগল।

টিফিনের সময় অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ইলিনা বুঝল, এমনিতে সবাই চুপচাপ থাকলেও পরানের ব্যাপারটা নিয়ে ভালোরকম ফিসফাস কানাকানি হচ্ছে।

খবরটা কোনও নিউজ চ্যানেলে দেখায়নি কিংবা কাগজেও ছাপেনি। হয়তো প্রীতি দত্তের অনুরোধে কিংবা প্রভাবে পুলিশ মুখে কুলুপ এঁটেছে আর মিডিয়া হাত গুটিয়ে বসে থেকেছে। কিন্তু 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' বসে থাকেনি।

টিফিনের সময় ইলিনা একা-একাই টিফিন খেল। ওর শত অনুরোধেও অনুষ্কা ওর টিফিন শেয়ার করল না। বারবার সুন্দর করে হেসে বলল, 'আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া আমার চট করে খিদে পায় না।'

ইলিনার বেশ খটকা লাগলেও কিছু বলল না।

ছুটির সময় যতই এগিয়ে এল আকাশ ততই কালো হয়ে উঠল। মেঘও ডেকে উঠল দু-চারবার। অনুষ্কা অপছন্দের মুখে জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বর্ষাকালটা খুব বিচ্ছিরি। আমার ভাল্লাগে না।'

ইলিনা ওর দিকে তাকাল শুধু—কিছু বলল না।

সাড়ে চারটের সময় ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ওরা সিঁড়ি নেমে চলে এল একতলায়। গাড়িবারান্দার বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে একবার তাকাল। মেঘের যা চেহারা তাতে মনে হচ্ছে জলকণার ভারে মেঘের দল কাবু হয়ে পড়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে মেঘের চাদর ফুঁড়ে জলের ধারা নীচে নামবে, পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে।

অনুষ্কা ইলিনার হাত ধরে টান মারল : 'শিগগির চলো। বাপি গাড়িটাকে ওপাশটায় দাঁড় করায়—।'

পিচের রাস্তা ধরে ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি পা চালাল। অন্য মেয়েরাও চটপট এগিয়ে চলেছে মেন গেটের দিকে। কেউ-কেউ আবার ছুটছে। নিউ কাটের খটখট শব্দে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের ভূতুড়ে ঘোড়সওয়ারদের কথা মনে পড়ে গেল ইলিনার।

পিচের রাস্তার বাঁ-দিকটা বলতে গেলে জঙ্গলে ঢাকা। আগাছার জংলা ঝোপ, আর তার মাঝে-মাঝে কয়েকটা বড়-বড় গাছ। গাছের পাতার আড়াল থেকে কোকিল ডাকছে। দুটো ফিঙে ঘূর্ণি নাচের ভঙ্গিতে উড়ছে। বোধহয় উড়ন্ত পোকামাকড় ধরছে। একটা কাঠবিড়ালি একটা বড় গাছের ডালে বসে ইলিনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তবে সামান্য ছুতোয় ছুটে পালানোর জন্য সে বেশ তৈরি বলেই মনে হল। মেঘলার জন্য ঘোলাটে ছায়া থাকলেও কাঠবিড়ালিটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অনুষ্কা কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ওর চোখে আকাঙ্ক্ষার আলতো ছোঁয়া দেখতে পেল ইলিনা। জিগ্যেস করল, 'কাঠবিড়ালি তুমি ভালোবাসো?'

অনুষ্কা চমকে ঘুরে তাকাল : 'দারুণ ভালোবাসি।'

'তা হলে ধরে নিয়ে চলো—পুষবে।'

কথাটা ইলিনা খুব হালকাভাবেই বলেছিল। কিন্তু ওর কথা শেষ হতে না হতেই অনুষ্কা একটা আজব কাণ্ড করে বসল।

রাস্তা ছেড়ে পলকে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে। এবং কাঠবিড়ালিটাকে লক্ষ্য করে শূন্যে লাফ দিল।

কাঠবিড়ালিটা আর দেরি করেনি। অনুষ্কা তাকে তাক করে লাফানোমাত্রই সে গাছের ডাল বেয়ে সড়সড় করে আরও ভেতরদিকে ছুটে গেল।

কিন্তু অনুষ্কাও হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। ও-ও তৎপর ভঙ্গিতে লাফের পর লাফ মেরে আগাছা আর গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

ইলিনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিঠে স্কুল-ব্যাগের বোঝা চাপানো অবস্থায় অনুষ্কা যে-স্পিডে কাঠবিড়ালিটাকে তাড়া করল তাতে ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে হল, অনুষ্কা যেন লং জাম্প আর ট্রিপল জাম্পে তুখোড় কোনও অ্যাথলিট।

অনুষ্কার ব্যাপারটা আরও দু-চারজন মেয়ের চোখে পড়েছিল। তারাও মজা দেখার লোভে ইলিনার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আগাছার ঝোপ আর গাছের পাতা নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু মেঘলা ছায়াতে অনুষ্কাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর সাদা টপের ঝলক দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরেই অনুষ্কা গাছপালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল। ওর স্কার্ট আর টপের এখানে-সেখানে গাছের পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর ডানহাতের মুঠোয় ধরা একটা কাঠবিড়ালি। চিঁ-চিঁ করে ডাকছে।

ইলিনা তো অবাক। ছুটে গিয়ে কেউ কাঠবিড়ালি ধরেছে এমনটা ও কখনও শোনেনি। আর অনুষ্কার ক্ষিপ্রতা কোনও শিকারি চিতাকেও হার মানাবে!

অবাক হল বাকি সব মেয়েরাও। ওরা অনুষ্কাকে ঘিরে কাঠবিড়ালি দেখতে লাগল।

অনুষ্কা বাঁ-হাতে স্কার্ট ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, 'কী কিউট, না? এটা আমি পুষব।'

ইলিনা বলল, 'বাব্বা, তোমার কী স্পিড! স্পোর্টসে নাম দিলে তুমি অনেক প্রাইজ পাবে।'

অনুষ্কা হাসল শুধু—কোনও কথা বলল না।

এমন সময় মেঘ ডাকল আবার। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে অনুষ্কা যেন শক খেয়ে চমকে উঠল। 'শিগগির চলো—বৃষ্টি পড়ছে' বলে পিচের রাস্তা ধরে ছুট লাগাল।

অন্য মেয়েগুলো একটু অবাক হয়ে গেল। এ-বৃষ্টি ভেজার মতন কিছু নয়। তাই অনুষ্কার দৌড়টা ওদের বেখাপ্পা মনে হল। আর ইলিনার মনে পড়ে গেল প্রথম দিন আলাপের সময় অনুষ্কা বলেছিল, '...বৃষ্টি আমার ভাল্লাগে না...।'

ইলিনা একটুও দেরি না করে অনুষ্কার পিছন-পিছন দৌড়ল।

দূরে মরা গাছটা দেখা যাচ্ছে। সেই রাতের দৌড়টার কথা ওর মনে পড়ে গেল।

পিচের রাস্তা ধরে বাঁ-দিকে বাঁক নিতেই সার বেঁধে পার্ক করা কয়েকটা প্রাইভেট কার চোখে পড়ল। তার পাশে হলদে রঙের তিনটে স্কুলবাস।

একটা সাদা গাড়ির সামনে বড় একটা ছাতা মাথায় দিয়ে সুপুরুষ একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোকের মাথায় কুচকুচে কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, আর মুখে একগাল হাসি। ওঁকে দেখতে এত সুন্দর যে, স্রেফ দেখেই বোঝা যায় উনি অনুষ্কার বাবা।

ছুটন্ত অনুষ্কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর একইসঙ্গে গাড়ির সামনের প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে ধরলেন। ইলিনা লক্ষ করল, গাড়ির জানলায় টিন্টেড গ্লাস লাগানো।

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অনুষ্কা বলল, 'বাপি, ও ইলিনা—আমার ক্লাসমেট...আমার খুব বন্ধু। ও আমাদের সঙ্গে এখন যাবে—।'

'তাই?' চওড়া করে হাসলেন অনুষ্কার বাপি : 'গুড—ভেরি গুড। এসো, এসো—উঠে পড়ো গাড়িতে। বৃষ্টিতে ভিজো না।' পিছনের একটা দরজা খুলে ইলিনাকে গাড়িতে ওঠার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ইলিনা গাড়িতে উঠে পিঠের স্কুল-ব্যাগটা খুলে সিটের ওপরে রাখতেই বাপি দরজাটা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসলেন। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময় ছোট্ট কাঠবিড়ালিটা বাপিকে দেখাল অনুষ্কা।

'এই দ্যাখো, বাপি, এই কাঠবিড়ালিটা স্কুলের বাগান থেকে ধরেছি। এটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুষব...।'

কাঠবিড়ালিটা তখন কিচকিচ করে শব্দ করছে, ওর কালো চোখের তারা চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক দেখছে।

কাঠবিড়ালিটার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বাপি। তারপর জোরে হেসে বললেন, 'ওটা আগেই আমি দেখেছি। বাঃ, গুড—ভেরি গুড। কিন্তু কত কিছুই তো তুমি পুষবে বলে ধরে আনো। তারপর কতটুকু কী পোষা হয় তা তুমি ভালোই জানো!' মেয়ের দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে কী এক গোপন রসিকতায় হেসে উঠলেন। তারপর একপলক ইলিনাকে দেখে নিলেন।

কাঠবিড়ালিটার গায়ে একবার আদরের হাত বুলিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করলেন বাপি।

অনুষ্কা বলল, 'বাপি, তোমার ফোনটা দাও। ইলিনা ওর বাড়িতে একটা ফোন করবে—নইলে ওর মা-বাবা চিন্তা করবে...।'

'ওহ শিয়োর—এই নাও।' জামার বুকপকেট থেকে রুপোলি রঙের একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন বের করে মেয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন।

অনুষ্কা আর ইলিনা চটপট বোতাম টিপে ফোনের কাজটা সেরে নিল।

গাড়ির ভেতরে একটা অদ্ভুত পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল ইলিনা। মনে হচ্ছিল, মিহি দারচিনি গুঁড়ো কেউ বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে।

এই গন্ধটা ও অনুষ্কার কাছে কখনও পায়নি। তা হলে কি ওর বাপি এরকম অফবিট পারফিউম লাগিয়েছেন? নাকি এটা স্পেশাল টাইপের কোনও কার পারফিউম?

অনুষ্কার বাপি গাড়ি চালাতে-চালাতে নানান বিষয়ে বকবক করছিলেন আর মাঝে মাঝেই হেসে উঠছিলেন। তবে ওঁর বেশি আগ্রহের বিষয় যে সিনেমা আর নাটক সেটা বোঝা যাচ্ছিল। গল্প করার ফাঁকে তিনি থেকে-থেকেই বলছিলেন, 'এই তো, এসে গেলাম...।'

গাড়ি নানান রাস্তা ধরে চলছিল। ইলিনা কোনও রাস্তাই চিনতে পারছিল না। অবশ্য ওর চেনার কথাও নয়। ওর শুধু মনে হচ্ছিল, অনুষ্কা ওর 'বেস্ট ফ্রেন্ড' হতে চলেছে। আর সেই চিন্তাটা ওর মনে খুশির বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

একটু পরেই গাড়ি যে-বাড়িতে এসে ঢুকল সেটা মাপে ছোট হলেও অনায়াসে তাকে বাগানবাড়ি বলা যায়। কারণ, অবহেলায় ফেলে রাখা বাগানের একপাশে একটা ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ি আর বাগান জং ধরা রেলিঙে ঘেরা। তার কোথাও-কোথাও এমনভাবে ভাঙা যে, কুকুর-বেড়াল কি অন্যান্য ছোট প্রাণী সহজেই ঢুকে পড়তে পারে।

বাড়িটা পুরোনো ধাঁচের, তবে সদ্য রং করা হয়েছে। সেই রংটা গরিব পথশিশুর গায়ে ঝকঝকে নতুন জামা-প্যান্টের মতো দেখাচ্ছে।

বাড়ির ছাদের কার্নিশে অনেক গোলাপায়রা বসে আছে। মাঝে-মাঝে পায়রাগুলো এদিকে-ওদিকে উড়ে যাচ্ছে।

আকাশ মেঘে-মেঘে কালো। বৃষ্টি এখন নেই, কিন্তু যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে।

গাড়ি বাড়ির কাছে গিয়ে থামল। ওরা তিনজনে নেমে বাড়িতে ঢুকল। অনুষ্কার হাতে ধরা কাঠবিড়ালিটা তখনও কিচকিচ করে শব্দ করছে।

বাড়িতে ঢোকার সময় অনুষ্কার বাপি ইলিনাকে বললেন, 'ওয়েলকাম, ইলিনা—ওয়েলকাম টু আওয়ার লিটল হাউস। যাও, অনুষ্কার সঙ্গে ওপরে যাও। ওর ঘরে বসে গল্প করো, টিভি দ্যাখো, চুটিয়ে আড্ডা মারো

—এনজয় করো...।' একটু থেমে অনুষ্কার দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা গলায় বললেন, 'দাও, ওটা আমাকে দাও। জায়গামতো রেখে দিই...।'

অনুষ্কা কোনও কথা না বলে কাঠবিড়ালিটা বাপির হাতে দিল। ওটার মাথায় ছোট্ট করে হাত বুলিয়ে বাপি বললেন, 'সুইট স্কুইরেল...।'

এই কথা বলে বাপি একতলার একটা ঘরে ঢুকে গেলেন। আর ওরা দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল।

বাড়িটা নতুন রং করা হয়েছে বলে ইলিনা রঙের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে দারচিনির মিষ্টি গন্ধটাও ওর নাকে আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাড়িটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল ইলিনা। ছিমছাম সাজগোজে বাড়িটাকে যথেষ্ট আধুনিক করার চেষ্টা হয়েছে।

দরজা-জানলায় ভারী পরদা, দেওয়ালে ওয়াল হ্যাঙার, সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ পেইন্টেড পট।

এসব দেখতে-দেখতে অনুষ্কার ঘরে পৌঁছে গেল ইলিনা।

অনুষ্কা আলো জ্বালতেই ঘরটা চোখের সামনে প্রকাশিত হল।

একটা আলমারি, বুককেস, এল. সি. ডি টিভি আর পড়াশোনার টেবিল। তার পাশে কম্পিউটার টেবিল। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে পাতা সিঙ্গল খাট। তার বিছানার রঙিন চাদর এলোমেলো। তার ওপরে পড়ে আছে একটা বড়সড় হেডফোন।

বিছানার একটু ওপরে দেওয়ালে জন আব্রাহাম আর মাইকেল জ্যাকসনের বিশাল পোস্টার। তার পাশেই একটা অন্যরকম ডিজিটাল প্রিন্ট।

এই অন্যরকম ছবিটায় দেখা যাচ্ছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্না ধোওয়া প্রান্তরে একটা বিশাল প্রাসাদ অতিকায় ডাইনোসরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাসাদের একটা ঘরে শুধু আলো জ্বলছে—বাকিটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

সেই ছবিটার পাশে একটা ছোট কাগজ দেওয়ালে সেলোটেপ দিয়ে লাগানো। তাতে লাল কালিতে একটা প্রতীক চিহ্ন আঁকা : একটা ফুলকে ঘিরে দুটো সাপ, তাদের লেজের ডগা দুটো জড়াজড়ি করে আছে। এই ছবিটা ইলিনা আগে অনুষ্কার খাতায় দেখেছে।

হেডফোনটা ছুড়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে অনুষ্কা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানার কোণে রাখল। তারপর ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল, ইলিনাকেও বসতে বলল।

ইলিনা স্কুল-ব্যাগটা খুলে বিছানায় নামিয়ে রাখল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। কিন্তু বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছিল ফুল আর সাপের ছবিটার দিকে।

ইলিনা স্বপ্নেও ভাবেনি হঠাৎ করে এরকমভাবে অনুষ্কা ওকে এত কাছে টেনে নেবে। তাই একটা অপ্রত্যাশিত খুশির ঢেউ ওকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। অনুষ্কার 'আহা মরি' মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা ওর কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওরা দুজনে প্রাণখোলা গল্পে মেতে উঠল। আর তারই মধ্যে কখন যেন ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ওদের গল্প আর হাসাহাসির ঢেউয়ের মাঝে হঠাৎ করেই পরানের ডেডবডির কথা ভেসে উঠল।

অনুষ্কা টেলিফোনে ব্যাপারটা জেনেছে ঠিকই, কিন্তু মনে হল তাতে ওর কৌতূহল মেটেনি। কারণ, ও ইলিনাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগল।

সেই রাতের ঘটনা খুব ধীরে-ধীরে স্লো-মোশান সিনেমার মতো পরপর দু-বার বলতে হল ইলিনাকে।

কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ সরু করে গভীর মনোযোগে ইলিনার কথামালা শুনল অনুষ্কা।

'তোমরা ঠিক দেখেছ, দুজন টপ আর স্কার্ট পরে ছিল? মানে, আমাদের স্কুল-ড্রেস?'

‘হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি।’

‘আর-একজন শাড়ি?’

‘হ্যাঁ। আমাদের একজন ম্যাডাম ওইরকম শাড়ি পরে সেদিন স্কুলে এসেছিল। পাড়ের ডিজাইনটা দেখে সম্পি চিনতে পেরেছে।’

‘কোন ম্যাডাম?’

‘সম্পি জানে। ও আমাদের এখনও বলেনি। লাস্ট দিন যখন ওর সঙ্গে কথা হয় তখন ও বলেছিল, ম্যাডামের নামটা এখন ও কাউকে বলবে না। কয়েকটা দিন ও ম্যাডামের ওপরে নজর রাখতে চায়...।’

এ-কথা শুনে অনুষ্কা বেশ চিন্তায় পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আনমনাভাবে বলল, ‘এতে তো সম্পির বিপদ হতে পারে! যদি সেই ম্যাডাম সম্পির ব্যাপারটা জানতে পেরে যায় তা হলে...।’

ইলিনা হাত নেড়ে বলল, ‘জানলে জানবে! সম্পির গায়ে অনেক জোর—ও কাউকে ভয় পায় না...।’

ইলিনার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল অনুষ্কা। মলিন হেসে বলল, ‘সম্পি ওদের সঙ্গে পারবে না। ওদের গায়ে অমানুষিক শক্তি। ওরা লোহা চিবিয়ে গুঁড়ো করে দিতে পারে—।’

ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল : ‘তুমি জানলে কী করে?’

অনুষ্কা চুপ করে রইল। ওরা দুজনে বৃষ্টির ধারাপাত শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ইলিনা আবার জিগ্যেস করল, ‘তুমি জানলে কী করে?’

‘আমি জানি। সব জানি—।’

‘কী জানো, বলো—।’ অনুষ্কার আরও কাছে সরে এল ইলিনা।

‘পরান ছেলেটা কীভাবে মারা গেছে আমি জানি।’

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। পড়ল ইলিনার বুকের ভেতরেও। উত্তেজিত হৃৎপিণ্ডের ধকধক আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল ও।

ফ্যালফেলে মুখে অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে ছিল ইলিনা। হোঁচট খাওয়া গলায় কোনওরকমে প্রশ্ন করল, ‘কী-কীভাবে ম-মারা গেছে পরান?’

‘ওর সব রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ...।’

ইলিনার শীত-শীত করে উঠল।

ঘরের দুটো জানলাতেই কাচের শার্সি লাগানো। বৃষ্টির ফোঁটা কাচের ওপরে আছড়ে পড়ছিল। তারপর কাচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। ল্যাম্পপোস্টের ছিটকে আসা আলোয় মনে হচ্ছিল কাচ বেয়ে কতকগুলো স্বচ্ছ ব্যাঙাচি সাঁতরে নামছে।

ইলিনা শুধু যে অনুষ্কার কথায় ভয় পেয়েছে তা নয়। অনুষ্কা কী করে এসব জানল সে-কথা ভেবেও ওর ভয় করছে। অথচ অনুষ্কার প্রতি ওর টানটাও তো মিথ্যে নয়! তাই ভয় পেলেও ইলিনা এক অদ্ভুত টানে অনুষ্কার কাছে বসে রইল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর নানান কথা ভাবতে লাগল।

তা হলে সেই ছাতাওয়ালা প্রাণীগুলো পিশাচ? ওরাই কি পরানের রক্ত শুষে নিয়েছে? কিন্তু ওদের স্কুলের দুজন ছাত্রী আর একজন ম্যাডাম ওরকম পিশাচ হয়ে গেল কী করে?

ইলিনার চিন্তাগুলো দিশেহারাভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল আর বারবার অদৃশ্য এক পাথরের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

অনুষ্কা বলল, ‘ইলিনা, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি! শুধু সম্পিকে বোলো খুব কেয়ারফুল থাকতে। ও যেন বেশি রিসক না নেয়।’

ইলিনা কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। দারচিনির মিষ্টি গন্ধটা ওর নাকে এল আবার।

অনুষ্কা প্রসঙ্গ পালটানোর জন্য জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বৃষ্টিটা যে কখন থামবে কে জানে! রেইনি সিজনটা খুব বিচ্ছিরি।’ মুখ ফিরিয়ে ইলিনার দিকে তাকাল : ‘আমার মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ

হল না। মা বিকেলে কীসব কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে—মনে হয়, বৃষ্টিতে আটকে গেছে। একটু পরে বাপি মা-কে ফোন করে দেখবে। যদি মায়ের ফিরতে প্রবলেম হয় তা হলে তোমাকে বাড়িতে ড্রপ করে বাপি মা-কে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তোমার মা একা বেরিয়েছেন? রাত হয়ে গেলে যদি কোনও বিপদ-আপদ হয়! তার চেয়ে আমি এখনই চলে যাই—তোমার মা তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন...।'

'তুমি শুধু-শুধু চিন্তা করছ—' মিষ্টি করে হাসল অনুষ্কা : 'বিপদ-আপদকে আমরা ভয় পাই না। তা ছাড়া বাপি এখুনি তোমার জন্যে স্ন্যাক্স-ট্যাক্স কিছু নিয়ে আসবে। আর বাড়িটাও তো তোমাকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়নি—চলো।' অনুষ্কা ওর হাত ধরে টানল। তারপর ঘর ছেড়ে ওরা চলে এল বাইরে, অলিন্দে।

বাড়ির সব জায়গাতেই উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। সাদা টিউবলাইট অথবা নানান চেহারার সি. এফ. এল.। দোতলার ঘরগুলো দেখাতে- দেখাতে অনুষ্কা বলল, 'আমাদের বাড়ির দুটো ফ্লোর একই প্যাটার্নে তৈরি। একতলার দুটো ঘরে উলটোপালটা জিনিস বোঝাই করা আছে, আর থার্ড ঘরটায় আমার...পোষা...মানে, পেটসরা থাকে। কাঠবিড়ালি, পায়রা, শালিখ, চড়াই এসব।'

দোতলার তিনটে ঘর শেষ হতেই অনুষ্কা বলল, 'ওপাশে ওই যে দুটো ছোট-ছোট ঘর—ওগুলো টয়লেট আর কিচেন—দেখানোর কিছু নেই।'

ইলিনা জিগ্যেস করল, 'তুমি রান্না জানো?'

'ওরে বাবা!' ভয় পাওয়ার কপট ভঙ্গি করল অনুষ্কা : 'রান্না-টান্না আমি একটুও জানি না।'

'তোমার মা—মানে, আন্টি নিশ্চয়ই ভালো রান্না জানেন?'

'উহুঁ—' অনুষ্কা মাথা নাড়ল : 'মা রান্না-টান্না তেমন জানে না...।'

'সে কী? তা হলে রোজ রান্না করে দেয় কে? তোমার স্কুলের টিফিন কে তৈরি করে? রান্নার মাসি?'

অনুষ্কাকে দেখে মনে হল, ও কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেছে। কী বলবে ভাবছে।

'না, মানে...রান্নার মাসি...আমাদের রান্নার মাটি-টাসি কেউ নেই।'

অনুষ্কার কথাটা শেষ হওয়ার আগেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখেছে ইলিনা। এবং বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

রান্নাঘর একেবারে পরিষ্কার। কয়েকটা থালা-বাসন ছুরি-চামচ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। তাকে মশলাপাতির কোনও কৌটো নেই। এমনকী কোনও উনুন, স্টোভ, গ্যাস আভেন, গ্যাস সিলিন্ডার, বা মাইক্রোওয়েভ আভেন—কিচ্ছু নেই।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ইলিনা ঘুরে তাকাল বন্ধুর দিকে।

দুজনেই চুপচাপ। যেন ক্যামেরার ফ্রিজ শটে দুজনে ধরা পড়েছে। ওদের মুখে কোনও কথা নেই। শুধু বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো বাজছিল।

'আমাদের রান্নাবান্নার কোনও ব্যাপার নেই। আমরা সবসময় কেনা খাবার খাই—।'

অনুষ্কা এ-কথা বলতে না বলতেই ওর বাপির গলা পাওয়া গেল।

'ইলিনা, এই কেনা খাবারগুলো খেয়ে দ্যাখো—দারুণ লাগবে। খুব ফেমাস দোকান থেকে কেনা...।'

কথার দিকে লক্ষ করে চোখ ফেরাল ইলিনা। এবং সরাসরি অনুষ্কার বাবাকে দেখতে পেল।

অনুষ্কার ঘরের দরজায় বাপি দাঁড়িয়ে। হাতে একটা খাবারের প্লেট।

ওরা বাপির কাছে এগিয়ে গেল। বাপি খাবারের প্লেটটা অনুষ্কার হাতে দিলেন : 'নাও, বন্ধুকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াও।' ইলিনার দিকে তাকালেন : 'লজ্জা কোরো না, ইলিনা—পেট ভরে খাবে। তা কেমন লাগছে বলো। এনজয় করছ তো?'

ইলিনা সামান্য হেসে ঘাড় নাড়ল। নীচু গলায় বলল, 'করছি—এনজয় করছি।'

‘গুড—ভেরি গুড।’ জোরে হেসে উঠলেন বাপি। তারপর চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন : ‘হ্যাঁ, ভালো কথা। তুমি ফেরার সময় হলে বোলো। তোমাকে বাড়িতে ড্রপ পরে দেব...।’

বাপি সিঁড়ি ধরে নামতে শুরু করলেন।

ঘরে ঢুকে ইলিনার সামনে প্লেটটা এগিয়ে দিল অনুষ্কা : ‘নাও—খেয়ে নাও।’

ইলিনা প্লেটটা নিয়ে বিছানায় বসল। ওর খুব খিদে পাচ্ছিল। খাবারগুলো সামনে পেয়ে খিদেটা যেন অনেক বেড়ে গেল। মনজিনিসের ফিশ এনভেলাপ, চিকেন বার্গার—তার পাশে দুটো বড় সন্দেশ।

খাওয়া শুরু করার আগে ও অনুষ্কাকে জিগ্যেস করল, ‘তুমি খাবে না?’

ইলিনা জানত অনুষ্কা কী বলবে। কারণ, স্কুলে টিফিন শেয়ার না করার ব্যাপারটা ওর মনে ছিল।

অনুষ্কা ঠিক তাই বলল, ‘নাঃ, আমার খিদে নেই—।’

ইলিনা চিকেন বার্গারে কামড় বসিয়ে হাসল : ‘তোমার দেখছি কখনও খিদে-টিদে পায় না।’

অনুষ্কা অস্বস্তি পেয়ে হাসল, বলল, ‘বোধহয় তাই। ডাক্তার দেখাব ভাবছি—।’

এরপর ওদের গল্প ঘুরে গেল গানের দিকে। বাইরে বৃষ্টির শব্দ তখন অনেকটা কমে এসেছে।

অনুষ্কা যে মাইকেল জ্যাকসনের ভক্ত সেটা দেওয়ালের পোস্টারটা দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তার সঙ্গে জানা গেল ও নিজেও হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের চর্চা করে।

ইলিনার গানের ‘চর্চা’ বলতে শুধু গান শোনা। ওর প্রিয় বিষয় হল ছবি আঁকা আর ট্যাটুর ডিজাইন। দেওয়ালে লাগানো পূর্ণিমার রাতের ছবিটা অনেকক্ষণ ধরেই ওর চোখ টানছিল। তাই ও হঠাৎই জিগ্যেস করল, ‘এই ছবিটা এখানে কী জন্যে লাগিয়েছ? এটার কি স্পেশাল কোনও ব্যাপার আছে?’

অনুষ্কা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল, ‘না, মানে... স্পেশাল কোনও ব্যাপার নেই। ছবিটা আমার ভালো লাগে, তাই—।’

‘ওরে বাবা, আমার তো ওটার দিকে তাকালেই গা-টা কেমন শিরশির করছে! ভয়-ভয় করছে। ওই বাড়িটা যেন কেমন।’

হাসল অনুষ্কা : ‘আমার ভয়-টয় একটু কম...।’

অনুষ্কার দিকে তাকিয়ে রইল ইলিনা। হঠাৎই ওর মনে একটা প্রশ্ন উঠে এল।

অনুষ্কা ওকে আজ হঠাৎ বাড়িতে ‘নেমন্তন্ন’ করল কেন? আগে ও যখন গায়ে পড়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেছে তখন অনুষ্কা এতটুকুও আগ্রহ দেখায়নি। অথচ আজ হঠাৎ উলটো ব্যাপার।

তা হলে কি অনুষ্কা স্কুলের ওই ভয়ানক কাণ্ডটা ইলিনার কাছ থেকে সামনাসামনি বসে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শুনতে চেয়েছিল? সব শোনার পর সেটা নিয়ে গোয়েন্দার মতো অনেক প্রশ্নও করেছে ও। ওর কথাবার্তায় ইলিনার মনে হয়েছে অনুষ্কা যেন এই রহস্যের গভীর পর্যন্ত জানে। কারণ, ও বলেছে, ‘আমি জানি। সব জানি—।’

খাওয়া শেষ করে ইলিনা উঠে দাঁড়াল। পড়ার টেবিলে রাখা একটা জলের বোতল ওর দিকে এগিয়ে দিল অনুষ্কা। আলতো গলায় বলল, ‘তুমি খুব সাবধানে থেকো।’

ঢকঢক করে জল খেল ইলিনা। তারপর বিছানা থেকে ওর স্কুল-ব্যাগটা তুলে নিল : ‘রাত হয়ে যাচ্ছে—এবার আমি যাই...।’

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা দুজনে সিঁড়ির দিকে এগোল।

।।ছয়।।

অনুষ্কাকে ঘিরে ইলিনার মনে কিছু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা আর রহস্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ওর প্রতি অলৌকিক এক টান এইসব দ্বিধা আর সংশয়কে ফিকে করে দিয়েছিল। শুধু একটা কথা ওর কানে বারবার বেজে উঠছিল : ‘আমি জানি। সব জানি—।’

ক্লাসের পড়ায় ইলিনার মন বসছিল না। ও একটা খাতার শেষ পাতায় একটা ট্যাটুর ডিজাইন আঁকছিল : একটা ফুল—তাকে ঘিরে দুটো সাপ। এই নকশাটার মধ্যে কী আছে কে জানে! এটা অনুষ্কার এত প্রিয় কেন?

ইলিনা আজ সমর্পিতা আর সজনীর মাঝে বসেছে। ক'দিন ধরেই তাই বসছে। সমর্পিতার পাশে বসলে ও কেমন যেন ভরসা পায়। ওর মনে হয়, কোনও বিপদ-আপদ হলে দশাসই সম্পি সেটা ঠিক রুখে দেবে। কিন্তু ঠিক কীরকম বিপদ-আপদ সেটা ইলিনা জানে না।

অরুণিমা ম্যাডাম বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছিলেন। ওঁর ভীষণ রোগা চেহারা, মাথায় অনেক সাদা চুল। খুব শিগগিরই রিটায়ার করে যাবেন। ক্লাসে শুধু হাই তোলেন আর চেয়ারে বসে মাঝে-মাঝেই ঘুমিয়ে পড়েন।

অরুণিমা ম্যাডাম খুব ঠান্ডা আর ভালোমানুষ টাইপের। পড়া না পারলে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা বকাবকিও করেন না। শুধু ক্লাসে গোলমাল না করলেই হল।

সেই 'নিয়ম' মেনে ইলিনারা চাপা গলায় কথা বলছিল।

ইলিনা ট্যাটু আঁকা থামিয়ে হঠাৎ বলল, 'সম্পি, তোর সেই শাড়ির পাড়ের ডিজাইনের গল্পটা তো দেখলাম অনেকেই জেনে গেছে। বড়দিকে তুই কী বলেছিলি মনে নেই—যে সবটাই তোর দেখার ভুল?'

সম্পি বাঁকাভাবে হাসল। বলল, 'সবাই যা বলে তাই করে নাকি? আমি ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা একটু রটিয়ে দিয়েছি।'

সজনী জিগ্যেস করল, 'কেন রে?'

'যাতে কথাটা সেই শয়তান ম্যাডামের কানে যায়। তা হলে সেই ম্যাডাম একটু চাপে থাকবে।'

'চাপে থাকলে কী হবে?'

'দেখাই যাক না কী হয়।' ঠোঁট টিপে বলল সম্পি, 'হয়তো শয়তান ম্যাডামটা চালে কোনও ভুল করে ফেলতে পারে...।'

হঠাৎই সম্পি প্রসঙ্গ পালটে ইলিনাকে জিগ্যেস করল, 'সেদিন দেখলাম তুই ছুটির সময় অনুষ্কার গাড়িতে উঠলি...।'

ইলিনা অপ্রস্তুতভাবে বলল, 'আমার শরীরটা ভালো লাগছিল না। ওকে বলেছিলাম—তাই ও আমাকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়েছে।'

'ওরা খুব বড়লোক, না রে?' সজনী গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল।

'কী জানি!' ঠোঁট ওলটাল ইলিনা : 'তবে অনুষ্কা বলছিল, ও সব জানে। ও তোকে—' সম্পির দিকে তাকাল ইলিনা : 'খুব কেয়ারফুল থাকতে বলেছে, কোনও রিসক নিতে বারণ করেছে।'

সম্পি এ-কথায় ভয় তো পেলই না, উলটে 'ডোন্ট কেয়ার' হাসি হাসল। তারপর কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করল, 'অনুষ্কা সব জানে মানে?'

'কী জানি! সেসব ক্লিয়ার করে বলেনি।'

'তোরা চিন্তা করিস না। ব্যাপারটার পেছনে আমি লেগে আছি।'

'তুই কিন্তু কেয়ারফুল থাকিস...।' ইলিনা ফিসফিস করে সম্পিকে আবার বলল।

সম্পি কোনও কথা বলল না। শুধু চোখের ইশারায় বোঝাল, ও কেয়ারফুল থাকবে।

বাংলা ব্যাকরণের পর আরও দুটো ক্লাস পার হয়ে গেল। সম্পি কেমন যেন ছটফট করছিল। কোনও কিছুতেই ঠিকমতো মন বসাতে পারছিল না।

ইলিনা খেয়াল করেছে, সম্পি ক'দিন ধরেই স্কুল ক্যাম্পাসের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মরা গাছটার কাছে গিয়ে তার আশপাশটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। গত পরশু স্কুল ছুটি হওয়ার পর ও সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বলাইদার সঙ্গে কীসব যেন কথাবার্তা বলছিল। তারপর গতকাল টিফিনের সময় আগাছার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এদিক-ওদিক চষে বেড়াচ্ছিল।

ব্যাপারস্যাপার দেখে ইলিনার মনে হচ্ছিল, সমর্পিতা যেন শখের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছে। এটা যেমন ইলিনাদের চোখে পড়ছে তেমন অন্যদেরও নিশ্চয়ই চোখে পড়ছে। তা হলে সেই রাতের ওই ভয়ংকর তিনজন...তারাও নিশ্চয়ই সমর্পিতার পাগলামো দেখছে। তারপর যদি...।

ইলিনা আর ভাবতে পারছিল না। অনুষ্কার রহস্যময় কথাগুলো ওর মাথার ভেতরে ঝড় তুলছিল।

টিফিনের পরের পিরিয়ডটায় রনিতা ম্যাডামের ইতিহাস। তিনি ক্লাসে এসে নিজস্ব বিরক্তিকর স্টাইলে পড়াতে লাগলেন। তারপর আজকের 'বলির পাঁঠা' হিসেবে সম্পিকে বেছে নিলেন। যত কঠিন-কঠিন প্রশ্ন ওর দিকে ছুড়ে দিলেন।

সম্পি প্রায় কোনও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারছিল না। ফলে ওকে হেনস্থা করার সাফল্যে রনিতা ম্যাডামের চোখ চকচক করছিল।

সমর্পিতাকে বাঁচানোর জন্য অনুষ্কা বারবার উত্তর দিতে চেয়ে হাত তুলছিল, কিন্তু রনিতা ম্যাডাম সেটা যেন দেখেও দেখছিলেন না।

একসময় তিনি ঠান্ডা চোখে অনুষ্কার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধারালো গলায় কেটে-কেটে বললেন, 'আমি জানি তুমি সব জানো। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি কিছু জানতে চাইছি না।'

সম্পিকে যাচ্ছেতাইভাবে নাস্তানাবুদ করার পর ওকে ভালোরকম বকাবকি করলেন রনিতা ম্যাডাম। তারপর বললেন, 'তুমি ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাকে ঠিক পথে আনা দরকার...।'

সম্পি উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে ঘাড় নাড়ল।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পির মুখচোখ লাল। প্রায় কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

রনিতা ম্যাডাম চলে যাওয়ার পর সম্পি ইলিনাকে বলল, 'সবাই জানে আমি পড়াশোনায় বাজে...তাও কেন যে আমাকে রনিতা ম্যাডাম হ্যারাস করলেন কে জানে! আমার কপালে নির্ঘাত গার্জেন কল ঝুলছে।'

ইলিনা আর সজনী ওকে ভরসা দিতে লাগল।

আকাশে কালো-কালো মেঘের ছানা ভেসে বেড়াচ্ছিল। বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি—তবে যে-কোনও সময় শুরু হতে পারে। জানলা দিয়ে বড়-বড় গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছিল। এলোমেলো বাতাসে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে।

সম্পিকে দেখে মনে হল, ও যেন একটু দমে গেছে। চুপচাপ কী যেন ভাবছে।

ইলিনা বারবার ওকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, কী হয়েছে?'

সমর্পিতা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল, বলল, 'না, কিছু না...।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ইলিনা। ওর মনে হল, ডাকাবুকো সম্পি ভয় পেয়েছে।

শেষ পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে সম্পি একবার টয়লেটে যাওয়ার নাম করে বেরোল।

ইলিনার কী মনে হল, সম্পির পিছন-পিছন ও-ও বেরিয়ে এল বারান্দায়। দেখল, সম্পি বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে ক্লাস নাইন-বি-র একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

মেয়েটার নাম নিনা। সম্পিদের পাড়ায় থাকে—ওর বন্ধুও। আর সম্পির মতো নিনারও একটু ভয়ডর কম।

ইলিনা চটপট ক্লাসে ফিরে এল আবার। একটু পরে সম্পি ফিরে এসে ওর পাশে বসল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শম্পা ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকে পড়েছেন।

শম্পা ভূগোল পড়ান এবং খুব ভালো পড়ান। কিন্তু শেষ পিরিয়ডে ইলিনার হাই উঠছিল। ভাবছিল কখন ছুটি হবে, স্কুল বাসে করে বাড়ি যাবে।

ও সম্পিকে বলল, 'নিনার সঙ্গে কী কথা বলছিলি?'

সম্পি কী যেন চিন্তা করছিল, চটকা ভেঙে বলল, 'রনিতা ম্যাডামের কাছে যাওয়ার সময় ওকে সঙ্গে নেব ভেবেছিলাম। তাই ওকে বলছিলাম। কিন্তু ওর কাজ আছে—বাড়ি ফেরার তাড়া আছে...।'

'ওকে সঙ্গে নিবি কেন?'

'না, মানে...যদি কোনও প্রবলেম হয়...।'

'কী প্রবলেম?'

'যদি বকাবকি করে, মারধর করে.........তারপর গার্জেন কল......।' একটু থেমে সম্পি আবার বলল, 'যাকগে, যা হয় হবে।'

'আমি তোর সঙ্গে যাব?' ইলিনা জিগ্যেস করল।

সমর্পিতা একলহমা কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'নাঃ, থাক—দরকার নেই। দেখি না কী হয়!'

এরপর ও আর কোনও কথা বলল না। অন্যমনস্কভাবে শম্পা ম্যাডামের ভূগোল পড়ানো শুনতে লাগল।

ইলিনা বুঝতে পারছিল, সম্পি কেমন একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। কী করবে ভেবে উঠতে পারছে না।

কিন্তু কোনও টিচার পড়া না পারার জন্য সম্পিকে টিচার্স রুমে ডেকে পাঠাচ্ছেন এটা তো সম্পির কাছে নতুন নয়! তা হলে ও এরকম ঘাবড়ে যাচ্ছে কেন?

এসব ভাবতে-ভাবতে ইলিনা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশের কালো-কালো মেঘের ছানাগুলো কখন যেন একজোট হয়ে পড়েছে। এখন ওদের কালো দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। ওদের ঘন কালো শরীর ভেদ করে বিদ্যুতের রুপোলি তরোয়াল মাঝে-মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আর তারপরই গম্ভীর চাপা গর্জন।

কখন যেন ছুটির ঘণ্টা পড়ল। গোটা ক্লাস সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। কথার ফুলঝুরি ছিটকে পড়তে লাগল চারিদিকে।

বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাড়ি রওনা হতে হবে এই চিন্তায় সবাই তাড়াহুড়ো শুরু করে দিল। কিন্তু সম্পি চুপচাপ বসে রইল। ধীর স্থির গম্ভীর।

ইলিনা আর সজনী ক্লাস ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সম্পির দিকে একবার তাকাল। ইলিনা জিগ্যেস করল, 'কী রে, তোর সঙ্গে থাকব?'

'না, না—তুই বাড়ি যা।' চটপট বলল সম্পি, 'আমি একা ম্যানেজ করে নেব।'

ইলিনার মনে হল, সমর্পিতা চায় না ওকে কেউ ভিতু বলুক।

ও এখন মনের ভেতরে বাড়তি সাহস তৈরি করছে।

ক্লাসরুম যখন ফাঁকা হয়ে গেল তখন সম্পি উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে চলে এল বাইরের অলিন্দে। অলিন্দ ধরে খানিকটা এগোলেই একটা বড় চৌকো চাতাল। তাকে ঘিরে কাস্ট আয়রনের ঢালাই করা নকশা কাটা রেলিং।

দোতলার এই চাতালটাকে অনেকটা ছাদের মতো দেখায়। চাতালের গা ছুঁয়ে একটা কৃষ্ণচূড়া আর একটা কাঁঠাল গাছ উঠেছে।

চাতালের একপাশে বেশ বড়সড় টিচার্স রুম। সম্পি কোনাকুনিভাবে চাতালটা পেরিয়ে টিচার্স রুমের কাছে গেল। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

রুমের চওড়া দরজায় বাদামি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ঘরটা একচিলতে দেখা যাচ্ছে। আর ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল সমর্পিতা। নিজেকে সাহস জোগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল। রনিতা ম্যাডাম আর যা-ই করুন নিশ্চয়ই মারধোর করবেন না!

বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সম্পি। ওর হাত সামান্য কাঁপছে নাকি?

দূর! যা হয় হবে!

এক হাতে ভারী পরদা সরাল ও। তারপর জুতোয় শব্দ তুলেই ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ঘরে মাত্র দুজন টিচার : রনিতা ম্যাডাম আর রবিনা ম্যাডাম। ওঁরা পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে হোম লোন আর ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট নিয়ে কীসব আলোচনা করছিলেন। সমর্পিতাকে দেখেই ওঁরা চুপ করে গেলেন। তারপর রনিতা বললেন, 'এসো, সমর্পিতা, এসো...।'

রবিনা ম্যাডাম উঠে দাঁড়ালেন। ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে সমর্পিতা ছোট্ট করে হাসল। কিন্তু ম্যাডাম ওর দিকে তাকালেন শুধু—হাসলেন না। টেবিলে রাখা নস্যি রঙের কাঁধব্যাগটা তুলে নিয়ে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ওঁর হাবভাব দেখে মনে হল তিনি যেন সমর্পিতার ঘরে ঢোকার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। নিশ্চয়ই রনিতা ম্যাডাম ওঁকে বলে রেখেছিলেন যে, সম্পিকে তিনি কথা বলার জন্য টিচার্স রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন।

টিচার্স রুমে ঢুকে সবচেয়ে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে সেটা হল প্রকাণ্ড একটা টেবিল। টেবিলটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া। মেহগনি কাঠের তৈরি, ঝকঝকে পালিশ। টেবিলের আটটা পায়া আটটা সিংহের থাবা। টেবিলের নানান নকশা আর কারুকাজ দেখে বোঝা যায় এ টেবিল ব্রিটিশ আমলের কনফারেন্স টেবল।

ঘরের একপাশে চারটে কাঠের আলমারি, আর তার পাশে একটা স্টিলের আলমারি।

তার ঠিক বিপরীতে একটা কাঠের র‍্যাক—তাতে অনেকগুলো ক্লাস রেজিস্টার, চকের বাক্স আর ডাস্টার। র‍্যাকের পাশে বড়-বড় তারিখওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার।

ঘরে তিনটে চার ব্লেডের সিলিং ফ্যান—তবে এখন একটা চলছে। তার হাওয়ায় রনিতা ম্যাডামের কানের পাশে চুল উড়ছে।

আকাশ মেঘলা থাকায় ঘরে দুটো টিউবলাইট জ্বলছে। রনিতা ম্যাডামের পিছনে তিনটে বিশাল-বিশাল জানলা—সম্পিদের ক্লাসরুমের মতো। খোলা জানলা দিয়ে আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে বাতাসে মাথা ঝাঁকানো পাগল গাছপালা।

কোকিলের ডাক শুনতে পেল সম্পি। এই ডাকটা ওকে যেন ভরসা জোগাল।

সম্পি টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বসেনি। কারণ, ম্যাডাম ওকে বসতে বলেননি।

টেবিলের এপার থেকে ও রনিতা ম্যাডামকে দেখছিল।

রনিতা ম্যাডামের সামনে তিন-চার ভাগে ভাগ করে রাখা ক্লাস টেস্টের খাতা। খাতার ওপরে লোহার পেপার-ওয়েট চাপানো। খাতার পাতার কোনাগুলো পাখার হাওয়ায় উড়ছে।

খাতাগুলোর পাশে রনিতার কাঁধ-ব্যাগ। গাঢ় নীল রঙের ব্যাগ—ব্যাগের খোলা মুখ দিয়ে ছাতার রঙিন বাঁট দেখা যাচ্ছে।

'এদিকে এসো, সমর্পিতা—এপাশটায় এসো...।' হাতের ইশারায় ওকে নিজের কাছে ডাকলেন ম্যাডাম।

'না, ম্যাডাম—এখানেই ঠিক আছি।' কথা বলতে-বলতে হাতে ঝোলানো স্কুল-ব্যাগটা টেবিলের ওপরে রাখল সম্পি।

হাসলেন রনিতা ম্যাডাম। বললেন, 'কোনও ভয় নেই, সমর্পিতা— এপাশটায় এসো, আমার কাছে এসো। তোমাকে আমি কানও মুলব না, মারধোরও করব না। তবে হ্যাঁ—' চওড়া করে হাসলেন রনিতা : 'একটু বকাবকি হয়তো করব। এসো...এপাশটায় এসো—।'

এরপর আর আপত্তি করা যায় না।

টেবিলের পরিসীমা ধরে ধীরে-ধীরে এগোতে শুরু করল সমর্পিতা। ম্যাডাম মুখে বলছেন বটে 'কোনও ভয় নেই', কিন্তু যদি রাগের মাথায় কান-টান মুলে দেন! তা হলে কিন্তু বড় প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে।

'আজকাল তোমার পড়াশোনায় একটুও মন নেই কেন বলতে পারো?' বকুনির পালা শুরু করে দিলেন রনিতা : 'ক্লাসে সবসময় দেখি অন্যমনস্ক। এরকম করলে তো তোমার রেজাল্ট অনেক নীচে নেমে যাবে!'

সমর্পিতা ততক্ষণে ম্যাডামের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে—তবে মোটেই হাতের নাগালের মধ্যে নয়। কাঁচমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে ও ম্যাডামের ভর্ৎসনা গায়ে মাখছিল।

‘আজও ক্লাসে দেখলাম তুমি কোনও পড়া বলতে পারছ না। ইতিহাস বলে যে একটা সাবজেক্ট আছে সেটাই বোধহয় তুমি ভুলে গেছ।’ কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ালেন রনিতা : ‘সত্যি করে বলো তো, তোমার কী প্রবলেম হয়েছে? লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এখন কী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ?’

সমর্পিতা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। মিনমিনে গলায় বলল, ‘কিছু নিয়ে তো মাথা ঘামাচ্ছি না, ম্যাডাম—পড়ছি...।’

‘ছাই পড়ছ!’ ধমকে উঠলেন রনিতা, ‘আসলে তুমি স্কুলের ওই অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে বড্ড বেশি ইনভলভড হয়ে পড়েছ, তাই না?’

সমর্পিতা চুপ করে রইল।

জানলার বাইরে মেঘ ডাকল। বৃষ্টিও জোরে শুরু হল। রনিতা বৃষ্টির শব্দে জানলার দিকে একবার তাকালেন। তারপরই ব্যাগ থেকে ছাতাটা টেনে বের করে নিজের হাতের কাছে রাখলেন।

সম্পিকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যাডামের ধৈর্য কয়েক ডিগ্রি কমে গেল।

‘চুপ করে আছ কেন? বলো। পরানের অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথটা নিয়ে তুমি একটু বাড়াবাড়ি রকমের ইনভলভড হয়ে পড়েছ না?’

সমর্পিতা আর চুপ করে থাকতে পারল না। আলতো গলায় বলল, ‘ম্যাডাম, ওটা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ নয়—মার্ডার।’

‘তোমাকে কে বলেছে মার্ডার?’ ধৈর্য আরও কমে গেল : ‘পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে যা রিপোর্ট দেওয়ার দিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া সবাই জানে এই স্কুলটা একটু ইয়ে...মানে, ভূতুড়ে...একটু দোষ আছে। আর সেদিন রাতে তুমি বা রবিনা যা দেখেছ সবটাই—।’

‘হ্যালুসিনেশান। আমাদের দেখার ভুল—তাই তো?’ ম্যাডামের কথার খেই ধরে সমর্পিতা বলল।

সম্পির কথার সুরে ব্যঙ্গ আর বিদ্রোহের ছোঁয়া পেয়ে রনিতা খেপে উঠলেন : ‘তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! শিক্ষা-দীক্ষা পাওনি? বাজে নোংরা মেয়ে!’

সম্পির মাথায় আগুন জ্বলে গেল। ও ভুলে গেল কাকে কী বলছে। ক্ষিপ্ত গলায় ও চেঁচিয়ে উঠল, ‘আমি বাজে নোংরা মেয়ে! তুই কী? তোর সেই শাড়িটা কোথায়? ওই যে, পাড়ের কাছে শঙ্খের ডিজাইন করা। যেটা পরে সেদিন অন্ধকারে ছাতা মাথায় দিয়ে ওই মরা গাছটায় হনুমানের মতো লাফাচ্ছিলি। শাড়িটা আছে, না পুড়িয়ে ফেলেছিস?’

ঘরের ভেতরে যেন বাজ পড়ল। সম্পির কথাগুলো বুলেটের মতো বিঁধে গেল রনিতা ম্যাডামের গায়ে।

।।সাত।।

ওঁর মুখটা অলৌকিকভাবে পালটে যেতে লাগল। গাল দুটো বসে গেল। রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল! ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গিয়ে দুটো কালো অন্ধকার গর্ত তৈরি হল। সেই গর্তের কেন্দ্রবিন্দুতে দুটো উজ্জ্বল সাদা ফুটকি—হাই পাওয়ারের জোনাকির মতো জ্বলছে।

রনিতা ম্যাডাম অদ্ভুত এক কর্কশ গলায় বললেন, ‘তোর লপচপানি বড্ড বেড়েছে। তোকে ঠিক পথে আনা দরকার। আমাদের যে কতটা শক্তি তুই জানিস না...।’

সম্পি ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। গল্পে পড়া কিংবা সিনেমায় দেখা আজগুবি ব্যাপারটা যে ওর চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে সেটা কিছুতেই ও বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওর ভেতর থেকে সমস্ত বেপরোয়া ভাব আর সাহস চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ভয়ে ওর জিভ শুকিয়ে গেছে, পা দুটো মেঝেতে এঁটে বসেছে।

খপ করে হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা একটা পেপারওয়েট তুলে নিলেন রনিতা। ওঁর হাতের আঙুলগুলো কেমন কালো-কালো হাড্ডিসার হয়ে গেছে। আর আঙুলের নখগুলো এখন কেমন লম্বা আর বাঁকানো।

রনিতা খলখল করে হাসলেন। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, ‘এটা খুব ছোঁয়াচে রোগ। কী করে কখন যে হয়ে গেছে একটুও টের পাইনি। তোর গায়ে একটা কামড় বসালে তুইও একপলকে আমাদের মতন হয়ে

যাবি। তখন তেষ্টায় পাগল হয়ে ঘুরবি...আর যদি মরণকামড় দিই তা হলে তুই পরানের মতো শেষ হয়ে যাবি। সে-রাতে পরানকে শুষে শেষ করে আমরা আনন্দে ওই মরা গাছটায় নাচানাচি করছিলাম। তুই কি চাস আরও একবার তাই করি?'

আকাশে এমনভাবে বিদ্যুৎ চমকাল যেন মেটাল হ্যালোজেন বাতি ঝলসে উঠল। সমর্পিতা আর রনিতা ম্যাডামের মুখে-গায়ে সাদা আলো ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে গেল।

সমর্পিতা অনেক কিছুই করার কথা ভাবছিল, কিন্তু কোন এক অলৌকিক অভিশাপ ওকে যেন পায়ে পেরেক ঠুকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

ও একবার খোলা দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, আর-একবার জানলার দিকে। ও কি একছুটে বাইরের চাতালে চলে যেতে পারবে? তারপর চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারবে না? কিন্তু এখন কি ম্যাডামরা কেউ আছেন? বড়দিও হয়তো বাড়ি চলে গেছেন। এখন শুধু সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের লোকজনই যা ভরসা। কিন্তু এখান থেকে চিৎকার করলে সেই আওয়াজ কি সার্ভেন্টস কোয়ার্টার পর্যন্ত পৌঁছবে? এই বৃষ্টিতে কেউ কি আসবে?

সম্পি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। ওই তো, রনিতা পিশাচটা খলখল করে হাসছে। ওকে ঠেকাতে কিছু একটা করতে হবে, করতেই হবে।

সম্পি হঠাৎ কোথা থেকে শক্তি খুঁজে পেল কে জানে! ও দু-হাতের দুটো প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলে। ভয়ংকর শব্দ হল। বিশাল টেবিলটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

আর রনিতা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন। তারপর বড় করে হাঁ করলেন।

টিউবলাইটের আলোয় পিশাচের দাঁতগুলো ঝিকিয়ে উঠল। সম্পির দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

রনিতার দু-পাটিতেই হাঙরের মতো কয়েক সারি করে ইস্পাতের দাঁত। ঝকঝকে এবং ছুঁচলো।

পপকর্ন খাওয়ার ভঙ্গিতে লোহার পেপারওয়েটটা হাঁ করা মুখের ভেতরে ছুড়ে দিলেন। তাপর কড়মড়-কড়মড় করে ওটা চিবোতে লাগলেন। ঠিক যেন তালমিছরির ডেলা চিবিয়ে গুঁড়ো করছেন।

একটু পরেই লোহার গুঁড়ো থু-থু করে টেবিলে উগরে দিলেন রনিতা। তারপর পাতলা ঠোঁটের ওপরে কয়েকবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে সম্পিকে লক্ষ করে হাসলেন।

সম্পির শিরদাঁড়া বেয়ে বরফজলের স্রোত নেমে গেল। এই পিশাচের সঙ্গে শক্তিতে পেরে ওঠা অসম্ভব। সম্পি একমাত্র পালানোর চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পা দুটো যে কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

টেবিলে ঘুসি মারার পর থেকেই সম্পির দু-হাতের মুঠো ব্যথা করছিল। ও হাত কচলে ব্যথা তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ভয়...ভয়টা তাড়ানো যায় কেমন করে?

রনিতা ঘষা-ঘষা গলায় বললেন, 'শোন মেয়ে, এই মুহূর্তে তুই যা-যা দেখছিস সবই তোর দেখার ভুল। এ-কথা মনে থাকে যেন! সব হ্যালুসিনেশান।' তারপর একটু রাগি কর্কশ স্বরে বললেন, 'তোর সাহস তো কম নয়! আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আসিস! এই দেখ...।'

সমর্পিতাকে দিশেহারা কাবু অবস্থায় পেয়ে রনিতা যেন বেশ মজা পেয়ে গেছেন। ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে টিউবলাইটগুলোর দিকে একবার তাকালেন। তারপর ক্ষণপ্রভার গতিতে চোখের পলকে পৌঁছে গেলেন দেওয়ালে গাঁথা ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-এর কাছে। তারগুলোর ওপরে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

আলোর ফুলকি ছিটকে বেরোল। 'ফট' করে একটা শব্দ হল। এবং ঘরের আলো নিভে গেল। ঘুরন্ত পাখার গতি কমতে লাগল।

ঘরটা কেমন অদ্ভুত আঁধারে ছেয়ে গেল। জানলার বাইরে মেঘ আর বৃষ্টি যেন অকালসন্ধ্যা তৈরি করে দিয়েছে। সম্পির চোখের সামনে রনিতা ম্যাডামের অপচ্ছায়া। তাঁর চোখের অন্ধকার কোটরে দুটো সাদা আলোর বিন্দু ধকধক করে জ্বলছে। আর একইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে চাপা খিলখিল হাসি।

কর্কশ গলায় পিশাচটা বলল, 'এবার বুঝেছিস, আমাদের কী শক্তি! আজকের এসব ব্যাপার কাউকে বলবি না। কাউকে না। যদি বলিস, তা হলে—যা বললাম—তুইও পরানের মতো হয়ে যাবি...।'

এমন সময় তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল।

সেই কানফাটানো আওয়াজে সম্পির আতঙ্কের ঘোরটা হঠাৎই কেটে গেল। ও 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করতে শুরু করল এবং কোন এক শক্তিতে খোলা দরজার দিকে মরণপণ ছুট লাগাল।

পিশাচটা ছুটন্ত সম্পিকে লক্ষ করে লাফ দিল। দু-লাফে পৌঁছে গেল দরজার কাছে।

কিন্তু সম্পি ততক্ষণে বাইরের চাতালে এসে পড়েছে। ঝুপুস বৃষ্টি ওকে যেন হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিল। ও ফিরে তাকাল টিচার্স রুমের দরজার দিকে।

রনিতা ম্যাডাম সম্পিকে তাড়া করার ঝোঁকে টিচার্স রুম ছেড়ে চাতালে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই আঁতকে উঠলেন। এমনভাবে কাতরে উঠলেন যেন বৃষ্টির ফোঁটায় গায়ে ফোসকা পড়ছে।

যন্ত্রণার 'উঃ! আঃ!' শব্দ করে রনিতা একলাফে টিচার্স রুমে আবার ঢুকে গেলেন।

সম্পি সেটা দেখে অবাক হয়ে অঝোর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল। বৃষ্টির জলে কী এমন শক্তি আছে যে, এই পিশাচগুলো বৃষ্টির জলের 'জ্বালা' সইতে পারে না?

টিচার্স রুম এখন বেশ অন্ধকার। তাই রনিতা ম্যাডামকে সম্পি ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ম্যাডাম ঘরে ঢুকে পড়ার আগে সম্পি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। ওঁর শরীরে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ামাত্রই সেখান থেকে সাদা ধোঁয়া বেরিয়েছে। গরম লোহার শিক আচমকা জলে ডোবালে যেমনটা হয়।

তা হলে কি সত্যি-সত্যিই বৃষ্টির ফোঁটায় এই পিশাচগুলোর ছ্যাঁকা লাগে? সেইজন্যই কি সেই ভয়ংকর রাতে এদের মাথায় ছাতা ছিল?

সম্পি তখনও চিৎকার করছিল : 'কে কোথায় আছ, শিগগির এসো! দোতলায় আগুন লেগেছে—আগুন!'

কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটার ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর ওর হারানো সাহস খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। তা ছাড়া ও লোকজনের ছুটে আসার শব্দ পাচ্ছিল।

সম্পি আঁজলা করে বৃষ্টির জল ধরতে লাগল। এবং এগোতে লাগল টিচার্স রুমের দিকে। ওর ভেতরে এখন একটা রাগ টগবগ করে ফুটছিল।

রনিতা ইলেকট্রিকের তারে কামড় বসানোমাত্রই শর্ট সার্কিট হয়ে স্কুল বিল্ডিং-এর অনেকটা অংশের আলো নিভে গেছে। সেই সময় দুজন দারোয়ান রোজকার মতো একতলার ঘরগুলোর জানলা-দরজা বন্ধ করে দরজায়-দরজায় তালা দিচ্ছিল। আচমকা অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ওরা হকচকিয়ে যায়। আর তারপরই সম্পির চিৎকার ওদের কানে এল।

সম্পির চিৎকার সার্ভেন্টস কোয়ার্টারেও পৌঁছেছিল। সেখান থেকে বলাইদা আর মলিনাদি হন্তদন্ত হয়ে এসে দারোয়ানদের সঙ্গে জড়ো হল। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল। বুঝতে পারল, চিৎকারটা দোতলার চাতাল থেকে আসছে।

তা হলে কি দোতলাতেই আগুন লেগেছে?

কিন্তু ওরা চারজনে চাতালে এসে কাউকে দেখতে পেল না। আর আগুনও দেখতে পেল না।

কারণ, সম্পি তখন বৃষ্টির জল আঁজলা করে নিয়ে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গা সপসপে ভেজা। মাথার চুল থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। চুলের গোছা কপালের ওপরে নেমে এসেছে। আর সেই ভেজা চুলের ফাঁক দিয়ে ওর দুটো রাগি চোখ দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় গেলি? আয়, সামনে আয়—' পিশাচকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ডাকাবুকো মেয়েটা।

রনিতা তখন একটা আলমারির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লুকোতে চেষ্টা করছেন। ওঁর অন্ধকার গর্তের মতো চোখ দুটো সম্পির দিকে তাকিয়ে স্থির। আসলে ওরা তখন সম্পির আঙুলের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টির জলের

দিকে লক্ষ রাখছিল। অপেক্ষা করছিল, কখন সেই চুঁইয়ে পড়া বন্ধ হবে। অর্থাৎ মেয়েটার এক আঁজলা জল কখন শেষ হবে।

জল শেষ হয়ে যাবে বলে সমর্পিতার মনে কিন্তু ভয় ছিল না। ও জানে ওর পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজে সপসপে। এই অবস্থায় ওর পিশাচটাকে জড়িয়ে ধরার খুব সাধ জাগছিল।

সম্পি হঠাৎই খেয়াল করল, আলমারির পাশে দাঁড়ানো রনিতার চেহারা ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে—স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে আবার। একইসঙ্গে দোতলার চাতালে অনেকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—কথা বলতে-বলতে কারা যেন টিচার্স রুমের দিকে এগিয়ে আসছে।

সম্পির হাতের জল শেষ হয়ে গিয়েছিল। রনিতাকে ও এখন আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

রনিতা হিসহিস করে চাপা গলায় বললেন, 'আজকে যা কিছু দেখলি কাউকে বলবি না। তা হলে তোর সর্বনাশ হবে। মনে রাখিস, আমি একা নই—আমরা সবাই মিলে তোকে অনায়াসে খতম করে দেব...।'

রনিতা ম্যাডাম স্বাভাবিক চেহারায় ফিরে এলেন। ঠোঁটে আঙুল তুলে ইশারায় সমর্পিতাকে চুপচাপ থাকতে বললেন।

'কই, কোথায় আগুন লেগেছে?' পুরুষের গলা : 'ঘর অন্ধকার কেন?'

'কে অমন চিৎকার করছিল গো?' মহিলার কণ্ঠস্বর : 'কী-করে আগুন লাগল বলো দেখি...।'

সমর্পিতা পিছন ফিরে চারজনকে দেখতে পেল। ওরা তখন বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হুড়মুড় করে টিচার্স রুমে ঢুকে পড়েছে।

সমর্পিতা কিছু বলে ওঠার আগেই মানুষের ছদ্মবেশে থাকা পিশাচটা বলে উঠল, 'এই তো, এই তারটা শর্ট সার্কিট হয়ে আর-একটু হলেই আগুন লেগে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি এই ডাস্টারটা দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চেপে ধরেছি—।'

টেবিল থেকে একটা ডাস্টার তুলে নিয়ে দেখালেন রনিতা।

সম্পি স্থির চোখে ওঁকে দেখছিল। পিশাচরা তা হলে অভিনয়টা ভালোই জানে!

রনিতা বললেন, 'সমর্পিতা থাকায় একটা বড় হেলপ হয়েছে। ও সঙ্গে-সঙ্গে ওরকম না চেঁচালে তোমরা কি এত চটপট আসতে?' সমর্পিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন : 'থ্যাংক য়ু, সমর্পিতা। তোমাকে আমি কাল একটা রিওয়ার্ড দেব...।'

ঠিক তখনই সাদা আলোর ঝলকানি, আর তারপরই কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও।

।।আট।।

সমর্পিতা স্কুল বিল্ডিং-এর বাইরে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির তেজ খানিকটা কমে এসেছে। মেঘলা আকাশের সঙ্গে সন্ধের অন্ধকার মিশে গিয়ে ছাই রং অনেক গাঢ় হয়েছে।

সমর্পিতার ব্যাগে ছাতা আছে কিন্তু ও ছাতা বের করল না। একে তো ওর সর্বাঙ্গ চুপচুপে ভেজা—ছাতা ওকে নতুন কোনও নিরাপত্তা দিতে পারবে না। বরং বৃষ্টির জল ওকে রনিতা ম্যাডামের মতো ভয়ংকর প্রাণীগুলোর হাত থেকে বাঁচাবে।

সমর্পিতা বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিল, থরথর করে কাঁপছিল। ওর বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করে শব্দ হচ্ছিল। তার সঙ্গে বেশ শীত করছিল।

ও কালো আকাশের দিকে তাকাল। বৃষ্টি উপহার দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানাল।

স্কুল বিল্ডিং-এর কাছ থেকে পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেন গেটের দিকে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল সম্পি। হেঁটে যাওয়ার সময় ও বারবার বাঁ-দিকের ঝোপঝাড় আর গাছপালার দিকে তাকাচ্ছিল। এই গাছপালার আড়ালে রনিতা ম্যাডামের মতো কেউ লুকিয়ে নেই তো?

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই ওর মনে হল, যেরকম জোরে বৃষ্টি পড়ছে তাতে খোলা জায়গায় ওরা থাকতে সাহস পাবে না। বৃষ্টিতে গায়ে ফোসকা পড়ে যাবে। আর যদি সেদিনের মতো ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোরাঘুরির কথা

ভাবে তাতেও লাভ নেই। কারণ, এ-বৃষ্টি ছাতায় তেমন মানবে না।

সম্পি তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। স্কুল থেকে বেরিয়েই বাস কিংবা অটো পেলে হয়।

ভেজা পিচের রাস্তায় বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে। রাস্তার ধারে লাগানো সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলো রাস্তায় পড়ে কমলা রঙের আলোর ফুলকি তৈরি করছে। স্কুলের দু-চারজন মেয়ে তাদের গার্জেনের সঙ্গে ফিরছে। এ ছাড়া রাস্তাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। আর দূরের খেলার মাঠটা বৃষ্টিতে ঝাপসা।

'এই, সম্পি—।'

সমর্পিতা চমকে উঠল। বুক ধড়াস করে উঠল। ডাক লক্ষ্য করে ফিরে তাকাল।

ও খেয়ালই করেনি, একটা বড় নিমগাছের নীচে দুটো মেয়ে ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ইলিনা আর সজনী।

ওরা দুজনে সম্পির কাছে এগিয়ে এল।

'তোর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল। তাই বাড়ি যাইনি—ওয়েট করছি।' ইলিনা বলল, 'রনিতা ম্যাডাম কী শাস্তি দেয় না দেয়। আমি ওয়েট করব শুনে সজনীও থেকে গেল।'

'তুই ভিজছিস কেন? ছাতা নেই?' সজনী জিগ্যেস করল।

'তুই এরকম কাঁপছিস কেন?' ইলিনা।

সমর্পিতা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইলিনাকে জাপটে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

ইলিনা হকচকিয়ে গেল। কোনও-রকমে ছাতা সামলে সম্পির ভেজা পিঠে হাত বোলাতে লাগল আর বারবার বলতে লাগল, 'কী হয়েছে রে, সম্পি—কী হয়েছে?'

সম্পি কাঁদতেই থাকল। ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আর একইসঙ্গে পাগলের মতো মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।'

ইলিনা আর সজনী কিছুতেই ওকে শান্ত করতে পারছিল না।

একটু পরে দু-পাশ থেকে সম্পিকে জাপটে ধরে ওরা মেন গেটের দিকে এগিয়ে চলল। ইলিনার মনে হল, রনিতা ম্যাডাম নিশ্চয়ই সম্পিকে সাংঘাতিক অপমান করেছেন, কিংবা চড়-থাপ্পড় মেরেছেন বা কান মূলে দিয়েছেন।

ওরা যখন স্কুলের গেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন একটা গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো ওদের চোখে-মুখে এসে পড়ল।

আলোর দিকে তাকিয়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেল। কিন্তু আলোর পিছনে সব অন্ধকার—কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটা ওদের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

সেটা দেখে ইলিনারা পিচের রাস্তার পাশে ঘাসজমির দিকে সরে গেল। কিন্তু গাড়িটা গতিপথ বদলে ওদের মুখোমুখি এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

ইলিনা একটু ভয় পেয়ে গেল। সজনীও। গাড়িটা ওদের পথ আগলে দাঁড়াল কেন?

ঠিক তখনই গাড়ি থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'ইলিনা, এসো—সবাই গাড়িতে উঠে এসো...।'

অনুষ্কার গলা।

অনুষ্কা এখনও বাড়ি যায়নি? ছুটির পর এতক্ষণ ধরে ও কী করছে?

ওরা তিনজনে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল সামনের জানলার কাচটা সামান্য নামানো। সেখানে আবছাভাবে অনুষ্কার মুখ দেখা যাচ্ছে। ওর পাশেই স্টিয়ারিং-এ ওর বাবা।

'তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে এসো—।' অনুষ্কা তাড়া দিল। গাড়ির পিছনের দরজাটা খুলে গেল।

সম্পিকে গাড়িতে উঠতে বলল ইলিনা। তারপর ছাতা বন্ধ করে নিজে উঠল।

সজনী ইতস্তত করছিল। বলল, 'আমি বাড়ি যাব—।'

অনুষ্কা বলল, 'চিন্তা কোরো না—আমি সবাইকে বাড়িতে ড্রপ করে দেব।'

ওরা তিনজনে পিছনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনুষ্কা ওর বাবার সঙ্গে সম্পি আর সজনীর পরিচয় করিয়ে দিল। ওর বাবা গাড়িটা ইউ টার্ন নিয়ে ঘুরিয়ে বললেন, 'কী বাজে বৃষ্টি! তোমরা সব একেবারে ভিজে গেছ দেখছি!'

ইলিনা সৌজন্যের ঢঙে বলল, 'ও কিছু না, কাকু—বাড়িতে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নেব।'

সমর্পিতার গা ঘেঁষে বসেছিল ইলিনা। তাই টের পাচ্ছিল সম্পি তখনও তিরতির করে কাঁপছে।

ও চাপা গলায়, প্রায় ফিসফিস করে, জিগ্যেস করল, 'সম্পি তোর কী হয়েছে রে? এবার শান্ত হ।'

সমর্পিতা অস্পষ্টভাবে বলল, 'কিচ্ছু না—।'

অনুষ্কা ওদের কথা শুনতে পেয়েছিল। ও নরম সুরে বলল, 'এখন ওকে ডিসটার্ব কোরো না। আমি সব জানি। পরে কখনও ওর সঙ্গে কথা বলব...।'

সমর্পিতা অবাক হয়ে অনুষ্কার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না।

ভিজে রাস্তায় গাড়ি চলতে লাগল।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল সম্পি। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। সেই বৃষ্টির ফোঁটার ঝিলিমিলির আড়ালে রনিতা ম্যাডামের পালটে যাওয়া মুখটা ও দেখতে পাচ্ছিল।

আজ বৃষ্টি নেই। খোলা জানলার বাইরে অন্ধকার। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অনুষ্কা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী দেখছিল কে জানে!

হঠাৎ করে ও ঘুরে দাঁড়াল। বিছানায় বসে থাকা ইলিনার দিকে সরাসরি তাকাল।

বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর গায়ের সবুজ রঙের টপটা কোমরের কাছ থেকে ইঞ্চিচারেক ওপরে তুলে ধরল ও।

ওর নাভির ঠিক ওপরে কালো রঙে আঁকা একটা ছবি : একটা ফুলকে ঘিরে আছে দুটো সাপ—তাদের লেজের কাছটা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো।

ঠিক এই ছবিটাই লাগানো রয়েছে ওর ঘরের দেওয়ালে। এই ছবিটাই ওকে খাতার পাতায় আঁকতে দেখেছিল ইলিনা। তখন ওর ছবিটা ভালো লেগেছিল। ও তা থেকে ট্যাটুর ডিজাইন করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনুষ্কা তাতে সায় দেয়নি। বাজে ওয়ার্থলেস ছবি বলে কাটাকুটি দাগ দিয়ে ছবিটা নষ্ট করে দিয়েছিল।

অথচ সেই ছবিটাকেই বডি ট্যাটু করে বসে আছে ও!

'এই ছবিটাকে তুমি বাজে ওয়ার্থলেস বলেছিলে—' অভিযোগের সুরে বলে উঠল ইলিনা, 'আর সেই ছবিটাকেই ট্যাটু করে বসে আছ! আশ্চর্য!'

অনুষ্কা অল্প হাসল। টপটা তুলে ধরা অবস্থায় কয়েকটা পা ফেলে ইলিনার খুব কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'তুমি ভুল করছ, ইলিনা—এটা মোটেই ট্যাটু নয়। হাত দিয়ে দ্যাখো...।'

সত্যিই ইলিনা আঙুল ছোঁয়াল ছবিটায়। ছবিটা যে উল্কি নয় সেটা বুঝতে চাইল : 'ট্যাটু নয় তো এটা তা হলে কী?'

'এটা জন্মদাগ। মানে, জন্মচিহ্ন। আমাদের সবার পেটে আছে।'

'জন্মচিহ্ন মানে?'

'জন্মচিহ্ন মানে জন্মের সময় থেকেই এই দাগটা আমাদের সবার পেটে থাকে...।'

'আমাদের সবার মানে কারা?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ইলিনা।

'আমি, বাপি, মা—আমাদের সবার পেটে এই ছবি আছে—জন্মদাগ।'

‘কেন? এ কী পিকিউলিয়ার ব্যাপার!’

টপটা ছেড়ে দিল অনুষ্কা। ওটা টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ইলিনার চিবুকে হাত দিয়ে বলল, ‘পিকিউলিয়ার নয়, ইলিনা। ভ্যাম্পায়ারদের এটাই নিয়ম...।’

‘ভ্যাম্পায়ার?’ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল ইলিনা। অনুষ্কার হাতটা সরিয়ে দিল : ‘কী বলছ তুমি!’

‘হ্যাঁ, ইলিনা—’ নীচু গলায় বলল, ‘ভ্যাম্পায়ারদের চেনার এটাই সবচেয়ে বড় চিহ্ন। তা ছাড়া এই সিম্বলটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র...’ দেওয়ালে লাগানো সাপ আর ফুলের ছবিটার দিকে দেখাল : ‘এটা আমাদের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাই আমাদের দেখে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয়...। অবশ্য এটা দেখতে পেলেও সবাই ট্যাটু ভাববে।’

ইলিনা কাঁপছিল। ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল। ও ভয়ের চোখে সহপাঠীকে দেখছিল।

অনুষ্কা ভ্যাম্পায়ার!

‘ইলিনা, প্লিজ...ভয় পেয়ো না। মানুষের মতো...আমাদের মধ্যেও... ভালো-খারাপ আছে। আমরা ভালো, ইলিনা, বিশ্বাস করো—।’

ইলিনার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখে ঝাপসা দেখছিল। ও মাথা পিছনে হেলিয়ে বিছানায় দু-হাতে ভর দিল।

ওর চোখ গেল দেওয়ালে টাঙানো রাতের ছবিটার দিকে। জ্যোৎস্না ধোওয়া রাত। বিশাল প্রাসাদ। পূর্ণিমার চাঁদ।

আগের দিন ছবিটা যেমন দেখেছিল আজ যেন একটু বদলে গেছে। প্রাসাদের ছায়ার পাশ থেকে চাঁদটা যেন অনেকটা দূরে সরে গেছে। আর আগের দিন, যতদূর ইলিনার মনে পড়ছে, বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।

আজ আলো জ্বলছে দুটো জানলায়!

নিজেকে সামলে নিল ইলিনা। মাথা ঝিমঝিম করলে চলবে না। চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না।

ও তাকাল অনুষ্কার মুখের দিকে।

এই অপরূপ রূপসী মেয়েটা ভ্যাম্পায়ার!

আজ টিফিনের সময় অনুষ্কা ইলিনাকে ডেকেছিল।

ইলিনা ওর কাছে যেতেই ও বলেছে, ‘তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। ভীষণ ইমপরট্যান্ট কথা। তুমি আজ ছুটির পর আমাদের বাড়ি চলো—প্লিজ।’

অনুষ্কার মুখে আকুতির ভাব ফুটে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এমন সব কথা ও ইলিনাকে বলতে চায় যেগুলো না বলতে পারলে ও কষ্ট পাবে।

ইলিনা রাজি হয়েছিল। একইসঙ্গে ওর মনে হয়েছিল, রনিতা ম্যাডামের সমস্যাটা যদি সমাধান করতে হয় তা হলে অনুষ্কার সাহায্য দরকার। কারণ, সমর্পিতার ব্যাপারটা যে ইলিনা জানতে পেরেছে সেটা শুধু অনুষ্কার জন্য।

ওই ঘটনার পর সমর্পিতা এক সপ্তাহ স্কুলে আসেনি। ওর বাড়িতে ফোন করে ইলিনা জেনেছে, পরদিন ভোরবেলা থেকে সম্পির খুব জ্বর। সেই জ্বর এতটাই খামখেয়ালিভাবে ওঠানামা করছিল যে, সম্পির মা-বাবা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া সম্পি জ্বরের মধ্যে ভুল বকছিল। সবকিছু মিলিয়ে ওর মা-বাবা ভাবছিলেন ব্যাপারটা ভাইরাল ফিভার নয়—অন্য কিছু।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা একদিন স্কুলের পর সম্পিকে দেখতে গিয়েছিল। তখন ও অনেকটা সামলে উঠেছে।

ইলিনা আর সজনী ওকে সেদিন টিচার্স রুমের ব্যাপার নিয়ে অনেক প্রশ্ন করল, কিন্তু সম্পি গোঁজ হয়ে বসে রইল। ঠিকঠাক কোনও জবাব দিল না।

ওর মা নানান কথা বলছিলেন।

'দ্যাখো না, যে-মেয়ে সবসময় সাহসের বড়াই করে সে কেমন ভয়ে চুপসে গেছে। এই তো, গত পরশু —যখন জ্বরটা খুব বেড়েছিল—তখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। বারবার বলছিল, "বৃষ্টির জল। বৃষ্টির জল দিয়েই খতম করতে হবে...বৃষ্টির জল চাই...বৃষ্টি চাই।"

'আমি ওকে মাথায় জলপটি দিয়ে, ধাক্কা দিয়ে সাড় ফেরাতেই কেমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। অনেকবার জিগ্যেস করলাম, "বৃষ্টির জল দিয়ে কী করবি বলছিলি?" তো ও হাঁ করে তাকিয়ে রইল—কোনও জবাব দিল না। বলো দেখি, কী মুশকিল!

'তা ছাড়া ক'দিন ধরে খাবারদাবার কিছু মুখে তুলছে না। শুধু বলছে খিদে নেই। তোমরা ওকে একটু বুঝিয়ে বলো তো। ঠিকঠাক না খেলে শরীরে জোর পাবে কেমন করে?'

সম্পির মা একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। আর অনুষ্কা শান্ত চোখে সম্পির দিকে তাকিয়ে ওকে দেখছিল।

'ও, হ্যাঁ। তোমাদের একজন দিদিমণি বাড়িতে ফোন করেছিলেন। সম্পি কেমন আছে সে-খবর নিচ্ছিলেন। বললেন, সম্পি ওঁর খুব প্রিয় স্টুডেন্ট...।' মেয়ের দিকে ঘুরে তাকালেন : 'অ্যাই, কী নাম যেন ওই দিদিমণির? তোকে যে সেদিন বললাম...।'

সম্পি নিষ্প্রাণ স্বরে বলল, 'রনিতা ম্যাডাম।'

ইলিনা আর সজনী মুখচাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু কোনও কথা বলল না।

একটু পরে সম্পির মা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই অনুষ্কা বলল, 'সম্পি, রনিতা ম্যাডাম তোমাকে থ্রেট করেছেন?'

সম্পি চুপ করে রইল। বিছানার চাদরের দিকে তাকিয়ে রইল। আঙুল খুঁটতে লাগল।

'আমি সব জানি, সম্পি। রনিতা ম্যাডাম এখন আর মানুষ নেই— অন্য কিছু হয়ে গেছেন। পরানের মার্ডারে রনিতা ম্যাডাম ইনভলভড...।'

সমপির্তা চমকে মুখ তুলে তাকাল। ইলিনা আর সজনীও তাকাল অনুষ্কার দিকে।

'তুমি কেমন করে জানলে?' সম্পি অস্পষ্ট গলায় জিগ্যেস করল।

'আমি জানি—' আত্মবিশ্বাসের জোর ফুটে বেরোল অনুষ্কার উত্তরে : 'সেদিন ঠিক কী হয়েছিল আমাকে খুলে বলো।' অনুষ্কা সম্পির কাঁধে একটা হাত রাখল : 'কোনও ভয় নেই। আমরা তোমাকে হেলপ করতে চাই...।'

তিনজনে মিলে আরও খানিকক্ষণ বোঝাতেই সম্পি নরম হল। ও দুর্বল গলায় ধীরে-ধীরে সেদিনকার সব ঘটনা খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে ইলিনা আর সজনীর ভেতরে ভয়ের হিমেল স্রোত ছড়িয়ে পড়ল। এসব কী বলছে সম্পি!

ওর কাহিনি শুনতে-শুনতে অনুষ্কা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ওর ফরসা গালে গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ল।

একসময় ওরা তিনজন উঠে পড়ল। বাড়ি ফিরতে হবে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে।

ক'দিন ধরেই রোজ ভালো বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে।

আজ সম্পির বাড়ি আসার ব্যাপারে অনুষ্কা একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল। বলেছিল, যদি সম্পির বাড়ির রাস্তায় জল জমে যায় তা হলে কিছুতেই ও গাড়ি থেকে নামতে পারবে না।

শেষ পর্যন্ত সেরকম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুষ্কা রেনকোট এবং ছাতা দুটোই নিয়ে বেরিয়েছে। এ নিয়ে ইলিনা আর সজনী ওকে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি। কিন্তু অনুষ্কা সেই পুরোনো কথাই বলেছে : বৃষ্টি ওর ভালো লাগে না।

সম্পির বাড়ি থেকে ফেরার পর তিনটে দিন অনুষ্কা কীরকম যেন আনমনা ছিল। তারপর আজ ইলিনাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসেছে।

ইলিনা অন্ধকার প্রাসাদের ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। না, ও মোটেই ভুল দেখছে না। আজ সত্যি-সত্যিই দুটো জানলায় আলো জ্বলছে!

'এই ছবিটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও মিস্ট্রি আছে।' প্রাসাদের ছবিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইলিনা বলল, 'আজ দেখছি দুটো জানলায় আলো জ্বলছে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম যেদিন তোমার বাড়িতে এসেছিলাম সেদিন...।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে অনুষ্কা বলল, 'বাড়িটার একটা জানলায় আলো জ্বলছিল।' তারপর ইলিনার পাশে বসে পড়ল : 'সেদিন তোমাকে বলিনি—আজ বলছি। এই বাড়িটা আমাদের পূর্বপুরুষের—তিনহাজার বছরের পুরোনো। আমাদের মতন যারা...মানে, ইয়ে...তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে এই ছবিটা লাগানো আছে। এই ছবিটার একটা সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে। ওটা নিজে-নিজে অনেক কিছু করতে পারে—।'

কথা বলতে-বলতে অনুষ্কা লক্ষ করল ইলিনার মুখে ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে। ও বিছানায় ঘষটে অনুষ্কার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে চাইছে।

অনুষ্কা ওর হাত চেপে ধরল। অনুনয়ের গলায় বলল, 'ইলিনা, প্লিজ... বিলিভ মি। আমি তোমার বন্ধু—বেস্ট ফ্রেন্ড। এটা ঠিকই যে, আমাদের লাইফ আর লাইফ স্টাইল তোমাদের চেয়ে আলাদা। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমরা কখনও মানুষের ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারি না। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আমরা প্রায় চারশো বছর ধরে মানুষের রক্তের তেষ্টা ভুলে গেছি! তার বদলে আমরা ইঁদুর, কাঠবিড়ালি, চড়াই, পায়রা এসব দিয়ে খিদে-তেষ্টা মেটাই! আমার বাপি আর মা কী বলেন জানো? বলেন, আমাদের অবজেকটিভ হল রেগুলার চেষ্টা করে-করে ফাইনালি ভেজিটারিয়ান হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের চরম মুক্তি।'

অনুষ্কার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বড়-বড় শ্বাস নিয়ে ও বলল, 'আমাদের প্রবলেম একটাই : আমরা সেদ্ধ, ভাজা, পোড়ানো—মানে, রান্না করা খাবার একদম খেতে পারি না। আমাদের সিস্টেম নেয় না। তাই আমরা সবকিছু কাঁচা খাই।

'কিন্তু তা বলে আমরা হাল ছাড়িনি। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি। মানুষের বন্ধু হতে চেষ্টা করছি। মানুষের মতো হতে চাইছি। বিশ্বাস করো, প্লিজ...।'

অনুষ্কার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। যেন হিরের কুচি ওর ফরসা গালের ওপরে চিকচিক করছিল।

ওর দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ইলিনার মনে হল, এ চোখের জল মিথ্যে হতে পারে না। এর মধ্যে কোথায় যেন সত্যের ঝিলিক আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ইলিনার মনে এক আশ্চর্য আবেগ তৈরি হয়ে গেল। ও সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুষ্কাকে জাপটে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর চোখেও জল এসে গেল। কান্না জড়ানো গলায় ও বারবার বলতে লাগল, 'তুমি আমার বন্ধু, অনুষ্কা। তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড...বেস্ট ফ্রেন্ড...।'

।**নয়**।।

সমর্পিতা যখন স্কুলে আবার এল তখন ওর জ্বর সেরে গেছে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল। আগের চেয়ে রোগা দেখাচ্ছে ওকে। পিঠের স্কুল-ব্যাগটা প্রকাণ্ড আর বেঢপ মনে হচ্ছে।

সমর্পিতা এখন অনুষ্কার পাশে বসে। ফাঁক পেলেই ওর সঙ্গে গল্প করে। আর রনিতা ম্যাডামের ভয়ের কথা আলোচনা করে।

অনুষ্কার অন্যপাশে বসে ইলিনা। অনুষ্কার পাশে বসতে ওর ভালো লাগে তাই।

অনুষ্কার সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সমর্পিতা বুঝতে পেরেছে, অনুষ্কার বুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ এবং গভীর।

অনুষ্কার পরামর্শেই এখন ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা মোবাইল ফোন সঙ্গে নিয়ে স্কুলে আসে। সেটা হয় সাইলেন্ট মোডে রাখে অথবা অফ করে রাখে। কারণ দিদিমণিরা টের পেলেই শাস্তি পেতে হবে।

সেদিন অনুষ্কার বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর ইলিনা রাতে ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারে জেগে থেকে শুধু ওই অদ্ভুত মেয়েটার কথা ভেবেছে।

ভ্যাম্পায়ারের গল্প ইলিনা বইয়ে পড়েছে, দু-একটা সিনেমাতেও দেখেছে। কিন্তু বাস্তবে ভ্যাম্পায়ার হয় বলে কখনও ভাবেনি। তা ছাড়া ভ্যাম্পায়াররাও যে খারাপ এবং ভালো দু-রকমের হতে পারে সেটাও কখনও ভেবে দেখেনি।

অনুষ্কা ওকে বলেছে, 'আমরা কখনও কারও ক্ষতি করি না। আমাদের ধর্মে অকারণে শক্তি ব্যবহার করা বারণ। আমাদের অনেকরকম সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার আছে। কিন্তু সেগুলো খুব জরুরি সিচুয়েশান না হলে আমরা ইউজ করি না। আমরা সবসময় চুপচাপ থাকি, কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। কারণ, আমরা...আমরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখতে চাই।'

অনুষ্কার গোপন কথা ইলিনা কাউকে বলেনি। এমনকী মা-বাবাকেও নয়।

স্কুলে অনুষ্কার পাশে রোজ বসতে পেরে ইলিনার নিজেকে অনেক বেশি সাহসী, শক্তিশালী আর বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, রনিতা ম্যাডাম—কিংবা ওইরকম কোনও পিশাচ—ওর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

ইলিনা পরানের কথা ভাবছিল।

পরান মারা যাওয়ার পর যে-ঢেউ উঠেছিল সপ্তাহদুয়েকের মধ্যে সেটা থিতিয়ে গেল। রাজা চন্দ্রভানু মালটিপারপাস গার্লস স্কুল আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এল। এবং স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হয়ে গেল। হেডমিসট্রেস প্রীতি দত্ত নোটিশ জারি করে সে-কথা সব ক্লাসে জানিয়ে দিলেন।

সমর্পিতা মাঝে-মাঝে রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করে। বন্ধুদের বলে ইতিহাস পড়া বুঝতে যাচ্ছে। আসলে ও এ-কথাই বলতে যায় যে, ও সেদিনকার কথা কাউকে বলেনি।

রনিতা ম্যাডামকে দেখে ও অবাক হয়ে যায়। এত স্বাভাবিক, এত স্নেহ-মাখানো ব্যবহার! সেদিন কর্কশ-স্বরে-কথা-বলা ভয়ংকর চেহারার যে-পিশাচকে সমর্পিতা দেখেছিল সেটা মনে হয় যেন সত্যি-সত্যি দেখার ভুল, হ্যালুসিনেশান।

রনিতা ম্যাডামের ওপর নজরদারির কাজটা ইলিনা, সজনী আর সমর্পিতা—তিনজনে মিলে করতে লাগল। ওরা চোখ-কান খোলা রেখে খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগল। আর অনুষ্কাকে সব খবর জানাতে লাগল।

স্কুলের পিছনদিকে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে অনেক বড়-বড় গাছ আছে। সেখানে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অনেক পুরোনো টিন, অ্যাসবেস্টস শিট, ভাঙা কাঠ, আর শ্যাওলা ধরা কয়েকশো ইট ডাঁই করে রাখা আছে।

একদিন টিফিনের সময় বাইরের মাঠে অনুষ্কা আর ইলিনা গল্প করছিল। হঠাৎ কোকিলের মিষ্টি ডাক শোনা গেল।

স্কুলের বাগানে সবসময়েই কোকিলের ডাক শোনা যায়। শুনে মনে হয় কোকিলরা শুধু বসন্তকাল নয়, বর্ষাকালেরও ইজারা নিয়ে নিয়েছে। ইলিনার খুব ইচ্ছে যে, ও 'ডাকন্ত' কোকিল দেখবে। ওর চোখ প্রায়ই সেই দৃশ্যটা খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু সেই 'দুর্লভ' দৃশ্যটা ও আজও খুঁজে পায়নি।

তাই টিফিনের সময় কোকিলের ডাক শুনেই ইলিনা একেবারে লাফিয়ে উঠল। ও অনুষ্কার হাত ধরে টানতে-টানতে ডাকের উৎস লক্ষ করে ছুট লাগাল।

আন্দাজে ভর করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত ওরা চলে এল স্কুলের পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে। গাছপালার অঞ্চলে ঢুকে ওপরদিকে মুখ তুলে গাছের ডালপালা আর পাতার ফাঁকে কোকিলটা খুঁজতে লাগল।

অনুষ্কাই প্রথম দেখতে পেল পাখিটাকে। কুচকুচে কালো রং। একটা লম্বা গাছের ওপরদিকে একটা ডালের একেবারে গোড়ায় বসে আছে পাখিটা। 'কু-উ, কু-উ' করে ডাকছে।

ইলিনা কোকিলটাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছে আজ ফুলফিলড হল—।'

একটু পরেই পাখিটা উড়ে চলে গেল অন্যান্য গাছের আড়ালে।

ওরা যখন ফিরে আসছে তখনই ইলিনার চোখে পড়ল, ইট-কাঠের স্তূপের পাশে দুটো লোমশ প্রাণী পড়ে আছে।

দেখে চেনা গেল। একটা কাঠবিড়ালি, আর একটা বেজি। দুটো প্রাণী যেন পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে।

ওরা চট করে সেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে পড়ে কাঠবিড়ালির দেহটা হাতে তুলে নিল অনুষ্কা।

হালকা। ফাঁপা। বোঝাই যাচ্ছে, ভেতরে সারবস্তু কিছু নেই। গলার কাছটায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

ইলিনা বেজির দেহটা একবার তুলেই ফেলে দিল। সেটাও চরিত্রে কাঠবিড়ালিটার মতো।

অনুষ্কা বলল, 'বুঝতে পারছ, ডেডবডিগুলো অন্যরকম?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি—পরানের মতন।'

'এগুলো বেশি পুরোনো নয়। গন্ধ থেকে বুঝতে পারছি...' কাঠবিড়ালিটা ফেলে দিল : 'কিছু একটা করা দরকার...।'

ইলিনা ঘড়ি দেখল। এখুনি টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়বে। রবিনা ম্যাডামের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। তাই ওরা স্কুল বিল্ডিং-এর দিকে প্রায় ছুট লাগাল।

ওদের এই কয়েকদিনের গোয়েন্দাগিরিতে একটা ব্যাপার ওরা লক্ষ করেছে। ক্লাস নাইনের 'এ' সেকশানের একজন ছাত্রী আর ক্লাস টেন 'সি' সেকশানের একজন ছাত্রী প্রায়ই রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

ইলিনা, সজনী, সমর্পিতা আর অনুষ্কা ওরা যে যখন যা জানতে পারে সেটা এস-এম-এস করে বা ফোন করে বাকিদের জানিয়ে দেয়।

পরানের মৃত্যুর ঘটনার পর স্কুলের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের সামনে অনেকগুলো বাড়তি আলো লাগানো হয়েছে। স্কুল ক্যাম্পাসের রাস্তায় যেসব ল্যাম্পপোস্টের আলো খারাপ ছিল সেগুলো পালটানো হয়েছে। এ ছাড়া বড়দি উদ্যোগ নিয়ে জঙ্গলের কিনারায়, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আর ফেস্টিভ্যাল হলের চারপাশে অনেকগুলো নতুন আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

এই চেষ্টা দেখে রনিতা ম্যাডাম একদিন ব্যঙ্গ করে সম্পিকে বলেছেন, 'আলো দিয়ে ভূত তাড়ানোর কনসেপ্ট বহুকাল হল বাতিল হয়ে গেছে। আলোয় আমাদের কোনও প্রবলেম নেই।' হাসলেন ম্যাডাম। তারপর : 'যখন আমাদের তেষ্টা পায় তখন কীসের আলো আর কীসের অন্ধকার! তুই-ই বল...।'

সম্পি কোনও জবাব না দিয়ে চলে এসেছিল। তারপর স্কুল ছুটির সময় বাকি তিনজন বন্ধুকে খবরটা জানিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'ওর কথার টোনে আমার মনে হয়েছে খুব শিগগিরই ওরা আর-একটা বড় কুকীর্তি করতে চলেছে...।'

ইলিনা ঠোঁট কামড়ে বলল, 'রিহার্সাল আবার শুরু হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, ওই পিশাচটা যতই বলুক, রাতের আলোতেই ওদের অ্যাক্টিভিটি বেশি...।'

এই দুশ্চিন্তাটা ইলিনার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিল। চিন্তায়-চিন্তায় বহুক্ষণ একা-একা ছটফট করার পর ও অনুষ্কাকে ফোন করেছে।

অনুষ্কা ফোন ধরতেই ইলিনা বলেছে, 'শোনো, তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব—।'

'বলো।'

'কাল থেকে অ্যানুয়াল ফাংশানের রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তুমি কাল থেকে রিহার্সালে চলো...।'

অনুষ্কা ইতস্তত করল : 'কী করে যাই বলো তো! একে তো কোনও প্রোগ্রামে আমি নাম দিইনি, তার ওপর আমি—মানে, আমরা—মানুষদের এড়িয়ে চলি। নইলে ধরা পড়ে যেতে হয়। যেমন তোমার কাছে

ধরা পড়ে গেলাম।'

'কিন্তু তুমি যদি হেলপ না করো তা হলে কেমন করে হয়! তুমিই তো বলেছ, তুমি সব জানো। তুমি ভরসা দিয়ে বলেছ ''আমি তো আছি!'' ফাংশানের রিহার্সাল রোজ সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলবে। যদি কারও কোনও বিপদ হয়! যদি সম্পির আবার কোনও বিপদ হয়! ও তো রনিতা ম্যাডামের টার্গেট হয়ে আছে...।'

অনুষ্কা চুপ করে ভাবছিল।

ইলিনা আবার বলল, 'ওসব জানি না, তুমি কাল রিহার্সালে যাবে। আর কিছু না পারো অন্তত একটা আবৃত্তি করবে। রবিনা ম্যাডামকে বলবে। তুমি রিহার্সালে থাকলে আমরা সবাই ভরসা পাব...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনুষ্কা বলেছে, 'ঠিক আছে—কাল থেকে আমি রিহার্সালে যাব।'

আনন্দে ফুলঝুরি হয়ে গেল ইলিনা। বলল, 'থ্যাংক য়ু, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড।'

পরদিন অনুষ্কাকে রিহার্সালে দেখে অনেকেই অবাক হল। এই মুখচোরা ইনট্রোভার্ট মেয়েটা অ্যানুয়াল ফাংশানে পার্টিসিপেট করবে! কিন্তু ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারল না।

ইলিনা জানে, অনুষ্কার মধ্যে এমন অনেক নাম-না-জানা গুণ আছে যার জন্য ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারে না।

অনেকদিন পর ফেস্টিভ্যাল হলটা জমজমাট হয়ে ওঠায় ইলিনাদের খুব ভালো লাগছিল। ওরা সবাই মিলে কলকল করে এমন গল্পে মেতে উঠল যে, ওদের চুপ করানোর জন্য শম্পা ম্যাডাম, রবিনা ম্যাডাম, কাকলি ম্যাডামকে বেশ কয়েকবার বকুনি দিতে হল। তাতে গুঞ্জনের আওয়াজ কমল বটে কিন্তু থামল না।

রিহার্সালের তদারকিতে সমর্পিতা, অঙ্গনা, সজনী, রবিনা ম্যাডাম সবাই এদিক-ওদিক ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছিলেন। কাকলি ম্যাডাম হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান তোলানো শুরু করে দিয়েছেন। শম্পা ম্যাডাম ক্লাস টেনের মধুরিমা আর শ্রাবন্তীকে নাচের একটা মুদ্রা বোঝাচ্ছেন।

সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা হচ্ছে বটে!

একটা অশুভ ঘটনার পর রিহার্সাল আবার শুরু হচ্ছে। তাই বড়দি বলেছেন তিনি রিহার্সালে আজ আসবেন—তা হলে সবাই উৎসাহ পাবে। তা ছাড়া আগে রিহার্সালে শুধু চা-বিস্কুট খাওয়ানো হত—আজ থেকে বড়দি টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। বলেছেন, রিহার্সাল অনেকদিন বন্ধ থাকায় হাতে সময় অনেক কমে গেছে। তাই রোজ একটু বেশিক্ষণ ধরে রিহার্সাল করতে হবে আর সেইজন্যই 'স্পেশাল' টিফিন।

রিহার্সাল পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। প্রীতি দত্ত এখনও আসেননি। অফিসে কী যেন কাজ করছেন—সেটা সেরেই আসবেন। বড়দি যেহেতু রিহার্সালে কখনও আসেন না তাই ওঁর আসাটা একটা বড় ঘটনা।

ইলিনারা বলাবলি করতে লাগল যে, এবার হয়তো রাশভারী বড়দিকে একটু-আধটু হাসতে দেখা যাবে। এ নিয়ে সজনী আর সমর্পিতা বাজিও ধরে ফেলল।

আজকের সন্ধেটা খুব সুন্দর। কোনও বৃষ্টি নেই। সূর্য ডোবার পর হালকা ছাই রঙের আকাশ। তার ওপরে গাঢ় স্লেট রঙের লম্বা-লম্বা আঁচড়। বাতাসে গাছপালার পাতা নড়ছে।

রিহার্সাল দিতে-দিতে বাইরেটা কখন যেন আঁধার হয়ে গেল।

ইলিনা অনুষ্কার সঙ্গে গল্প করছিল। গত বছরের অ্যানুয়াল ফাংশানের কথা বলছিল। কে আবৃত্তি করতে গিয়ে কবিতার লাইন ভুলে গেছে, কে গানে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, কাকলি ম্যাডামের গলা কী মিষ্টি—এই সব গল্প করছিল।

এর মধ্যে আশাদিকে সঙ্গে করে প্রীতি দত্ত চলে এলেন। তিনি এসে পড়ায় অনেকেই তটস্থ হল, আবার খুশিও হল। তারপর টিফিনের প্যাকেট আর চা সবাইকে বিলি করা হল। সকলেই আনন্দ আর ফুর্তির মেজাজে টগবগ করছিল।

ইলিনার বেশ ভালো লাগছিল। অনুষ্কাও জমজমাট ব্যাপারটা এনজয় করছিল। ও কখনও ভাবেনি এত মানুষের মাঝে ও এরকম অস্বস্তিহীনভাবে বসে থাকতে পারবে।

ইলিনা লক্ষ করল, সম্পি ওর ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে ফেস্টিভ্যাল হলের জানলার কাছে চলে যাচ্ছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখছে। হয়তো সেই বিপজ্জনক সন্ধেটার কথা ও কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

হলের টিনের চালে থেকে-থেকেই খড়মড় আওয়াজ হচ্ছিল। ইলিনা জানে, ওগুলো গাছের শুকনো পাতা আর সরু ডালপালার শব্দ। হল ঘিরে যেসব বড়-বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো থেকে প্রায়ই ডালপাতা খসে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই আওয়াজগুলো ইলিনাকে অল্প-অল্প ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

প্রথমদিন বলে বড়দি সাতটা নাগাদ রিহার্সাল শেষ করে দিতে বললেন। ভয় এড়াতে সবাই দলবেঁধে হল থেকে বেরিয়ে মেন গেটের পথ ধরল।

ইলিনার সঙ্গে পিচের রাস্তা ধরে এগোতে-এগোতে অনুষ্কা বলল, 'মনে হয়, ভয় কেটে গেছে। ওই পিশাচরা ঘুমিয়ে পড়েছে...।'

'কী করে বুঝলে?' ইলিনা অবাক হয়ে তাকাল বেস্ট ফ্রেন্ড-এর দিকে।

অনুষ্কা বলল, 'ওদের কেউ হয়তো আমাকে ফেস্টিভ্যাল হলে চিনে ফেলেছে। ওরা জানে, আমাদের মতো ভ্যাম্পায়াররা কখনও মানুষের প্রবলেমে ইনভলভড হয় না। কিন্তু আমাকে দেখে নিশ্চয়ই ওদের কেউ একজন বুঝেছে আমি তোমাদের প্রবলেমে জড়িয়ে পড়েছি—তোমাদের পাশে দাঁড়িয়েছি...।'

'তোমাকে ওরা এত ভয় পায়!' অবাক হয়ে বলল ইলিনা।

অনুষ্কা হাসল : 'খারাপ ভ্যাম্পায়াররা ভালোদের সবসময় ভয় পায়। ওরা আমাদের ক্ষমতার কথা জানে। তবে এটাও জানে, আমরা সবসময় নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে চাই।'

'ওরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চায় না?'

'চায়—কিন্তু পারে না। রক্তের তেষ্টা ওদের পাগল করে দেয়। মানুষের গন্ধ ওদের মাথা খারাপ করে দেয়। তা ছাড়া পূর্ণিমার সময় ওদের এই পাগলামিটা মারাত্মক বেড়ে ওঠে। তখন ওরা পশু কিংবা মানুষ মেরে তেষ্টা মিটিয়ে উল্লাসে নেচে বেড়ায়—কোনও জ্ঞান থাকে না।'

'যেদিন রাতে আমি ওরকম তিনটে পিশাচকে গাছে নাচানাচি করতে দেখেছিলাম সেদিন কি তা হলে পূর্ণিমা ছিল?'

'বোধহয় ছিল। সেদিন মেঘ-বৃষ্টি ছিল—তাই হয়তো বুঝতে পারোনি।'

ইলিনা কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল। তারপর ভয়ে-ভয়ে আকাশের দিকে তাকাল।

দূরে খেলার মাঠের কিনারায় শুকনো মরা গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালার আড়ালে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। প্রায় গোল হয়ে এসেছে। কয়েকদিন পরেই শুক্লপক্ষের শেষ—তারপর পূর্ণিমা।

চাঁদটা অনুষ্কাকে দেখাল ইলিনা : 'ওই দ্যাখো—ক'দিন পরেই পূর্ণিমা।'

'কী করে বুঝলে?' চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কা জানতে চাইল।

'খুব সোজা।' ইলিনা বলল, 'চাঁদের ওপরদিকটা যদি ডানদিকে হেলে থাকে, তা হলে শুক্লপক্ষ চলছে। আর যদি বাঁ-দিকে হেলে থাকে তা হলে কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদের নীচের দিকের বাঁকটা সেই অনুযায়ী কৃষ্ণপক্ষের 'ঋ'-ফলা আর শুক্লপক্ষের হ্রস্ব 'উ'-কারের বাঁকের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। এটা আমাকে মা শিখিয়ে দিয়েছে—।' ইলিনা হাসল। কিন্তু তারপরই আসন্ন পূর্ণিমার কথা ভেবে ভয়ের গলায় বলল, 'পূর্ণিমার সময় ওরা কিছু করতে পারে...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুষ্কা বলল, ‘শুধু পূর্ণিমা কেন? ভয় তো এমনিতেই আছে, কিন্তু পূর্ণিমার সময় ভয়টা আরও বেশি—’

হঠাৎই একটা ব্যাপার মনে পড়ে যাওয়ায় ইলিনা জিগ্যেস করল, ‘তুমি যে বললে তোমাকে ওরা চিনে ফেলেছে—কী করে চিনতে পারল?’

অনুষ্কা আলতো গলায় বলল, ‘আজ রিহার্সালে আমি টিফিন খাইনি—চা-ও খাইনি। সেটা হয়তো ওদের কেউ লক্ষ করেছে। তা ছাড়া আমাদের দেখতে খুউব সুন্দর হয়। আর আমাদের গা থেকে একটা গন্ধ বেরোয় অনেকটা দারচিনির গন্ধের মতো...।’

চেনার চিহ্নগুলো মনে-মনে খতিয়ে দেখল ইলিনা। তারপর গন্ধটার কথা ওর মনে পড়ল। ও অনুষ্কার গাড়িতে আর বাড়িতে এইরকম গন্ধ পেয়েছিল। কিন্তু গা থেকে ওরকম গন্ধ বেরোলে তো এখনও সেই গন্ধ ইলিনার নাকে আসার কথা!

ওর মনের কথা কী করে যেন টের পেয়ে গেল অনুষ্কা। বলল, ‘ইলিনা, তোমার সঙ্গে আমার একটা মেন্টাল ম্যাচিং হয়ে গেছে। অনেকটা যেন রেডিয়ো স্টেশান ধরার টিউনিং-এর মতো। তাই তুমি হয়তো দু-একবার আচমকা ওই স্মেলটা পেয়ে গেছ। আসলে ওই গন্ধটা কুকুরের নাকে ধরা পড়ে—আর ওই পিশাচদের নাকেও। কুকুর প্রায় ন’হাজার রকম গন্ধ চিনতে পারে, মনে রাখতে পারে। আমরা প্রায় পাঁচশো রকম গন্ধ চিনতে পারি। রনিতা ম্যাডামের মতো পিশাচরাও তাই। তবে...।’

‘আর আমরা? আমরা কতরকম গন্ধ চিনতে পারি?’

হাসল অনুষ্কা : ‘কিছু মনে কোরো না। তোমাদের বেলায় সংখ্যাটা মাত্র সত্তর থেকে আশি। আর তার মধ্যে এই দারচিনির মতো গন্ধটা পড়ে না। যেমন, তুমি এখন এই গন্ধটা পাচ্ছ না, তাই না?’

বিহ্বলভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল ইলিনা। সত্যিই ওই গন্ধটা ও এখন পাচ্ছে না। ওই দু-বার ছাড়া কখনও পায়নি।

হঠাৎই অনুষ্কার জন্য ভয় পেল ইলিনা। যদি ওই পিশাচগুলো অনুষ্কার কোনও ক্ষতি করে?

সে-কথাই জিগ্যেস করল ওকে।

অনুষ্কা ছোট্ট করে হেসে বলল, ‘ভয় পেয়ো না। সেটা কিছুতেই পারবে না।’

ওরা গাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। অনুষ্কা ইলিনাকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দেবে এরকমই কথা হয়েছিল। তাই দুজনেই উঠে বসল গাড়িতে।

অনুষ্কার বাবা গাড়ি স্টার্ট দিলেন। হেডলাইট জ্বেলে গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, ‘কী, ফাংশানের রিহার্সাল কেমন হল?’

দুজনেই বলল, ‘ভালো—।’

‘গুড—ভেরি গুড।’ বলে অনুষ্কার বাবা হাসলেন।

।।দশ।।

চাঁদকে দেখে পূর্ণিমা বোঝার উপায় ছিল না, কারণ, আকাশের মেঘ পুরু আড়াল তৈরি করেছিল। গতকাল থেকেই বৃষ্টির আশা তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টি এখনও সবাইকে অপেক্ষায় রেখেছে।

ফেস্টিভ্যাল হলে রিহার্সাল চলছিল। যাদের হাজির থাকার কথা তারা সবাই হাজির। দুটো গ্রুপে ভাগ হয়ে মেয়েরা কাকলি ম্যাডাম আর শম্পা ম্যাডামের কাছে তালিম নিচ্ছিল। রবিনা ম্যাডাম একপাশে বসে রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’র পাতা ওলটাচ্ছিলেন আর মাঝে-মাঝে কয়েকটা সাদা পাতায় কী যেন টুকে নিচ্ছিলেন।

বড়দি আজ আসেননি, তবে ওঁর চালু করে দেওয়া টিফিন আর চায়ের নিয়মটা পালটায়নি।

আজও যথারীতি অনুষ্কা চা-টিফিন খায়নি। ‘বাইরের জিনিস খাওয়া ডাক্তারের বারণ’ বলে এড়িয়ে গেছে।

ও একটা কাগজ হাতে ধরে বসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশ্ন’ কবিতাটা লেখা। রবিনা ম্যাডাম ওকে এই কবিতাটা তৈরি করতে বলেছেন।

রিহার্সালের জন্য সামান্য হট্টগোল চলছিল। তার মধ্যে হঠাৎই একটা শব্দ সমর্পিতার কানে গেল। হলের টিনের চালে একটা জোরালো শব্দ হয়েছে। বোধহয় বড় মাপের কোনও গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে।

সম্পি বোধহয় ওর ডাকাবুকো স্বভাবের পুরোটা ছাড়তে পারেনি। আর তার সঙ্গে ওর শখের গোয়েন্দা হয়ে ওঠার শখ। তাই ও চট করে উঠে দাঁড়াল। ওর ঢাউস স্কুল-ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল হলের বাইরে।

ইলিনা ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। ও অনুষ্কাকে বলল, ‘যাই, কী ব্যাপার একবার দেখে আসি—।’ তারপর উঠে রওনা হল।

হলের বাইরে বেশ কয়েকটা আলো লাগানো, কিন্তু উঁচু চালের কাছটায় অন্ধকার। চালের ওপরে গাছের ডালপালা আর পাতা ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে কী যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, গাছের ডাল আর পাতা সরিয়ে খুব ক্ষিপ্রভাবে এদিক থেকে ওদিক চলাফেরা করছে।

সম্পিকে দেখতে পেল ইলিনা। ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে।

রনিতা ম্যাডামের সঙ্গে টিচার্স রুমের সেই ঘটনার পর থেকে সম্পির একটা ব্যাপার ইলিনা লক্ষ করেছে : সম্পি কখনও ওর স্কুল-ব্যাগটা কাছ-ছাড়া করে না।

ইলিনা সম্পির কাছে গিয়ে দাঁড়াল : ‘কিছু দেখতে পেলি?’

‘হ্যাঁ—কিছু একটা হলের চালের ওপরে ঘোরাফেরা করছে।’

‘বোধহয় ভাম-টাম কিছু হবে।’

ইলিনা এ-কথা বলল কারণ, স্কুল চত্বরে মাঝে-মাঝে ভাম দেখা যায়।

ওর কথার উত্তরে সম্পি বলল, ‘হ্যাঁ, ভাম হতে পারে। তবে প্রবলেমটা হল ভামটা আমাদের মতো স্কুল-ড্রেস পরে রয়েছে।’

ইলিনা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল সম্পির দিকে। তারপর মোবাইল ফোন উঁচিয়ে ধরে বলল, ‘অনুষ্কাকে ফোন করে ডাকব?’

‘না, না—এখনও সেরকম কিছু সিচুয়েশান হয়নি।’ সম্পি হাত নেড়ে বারণ করল : ‘তা ছাড়া অন্য সবাই সন্দেহ করতে পারে। তারপর রনিতা ম্যাডাম জানতে পারবেন...। চল, ফিরে যাই।’

ওরা দুজন হলে ফিরে চলল।

সম্পি বলল, ‘রনিতা ম্যাডামের সঙ্গের দুটো মেয়েকে আমরা চিনতে পারিনি। তা ছাড়া এর মধ্যে কারও ঘাড়ে ওরা কামড় বসিয়েছে কি না কে জানে! সংখ্যাটা তা হলে তিন থেকে আরও বেড়ে যাবে...।’

ইলিনার অনুষ্কার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, পূর্ণিমার রাতে ওই পিশাচগুলো পাগলের মতো হয়ে ওঠে। আজ ওরা একটা কিছু করবেই। অনুষ্কাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা ভয় পায় না। ওরা এখন বোধহয় সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

ইলিনা আর সমর্পিতা ফেস্টিভ্যাল হলে ঢুকে পড়ল। অনুষ্কা আর সজনীর কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

সম্পি চাপা গলায় চালে শব্দ হওয়ার ব্যাপারটা ওদের বলল।

একটু পরেই সম্পি বলল, ‘অ্যাই, আমাকে টয়লেটে যেতে হবে।’ ও ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাকি তিনজনও উঠে পড়ল, বলল, ‘চল আমরাও যাই—।’

অনুষ্কা রবিনা ম্যাডামের কাছে গিয়ে চাপা গলায় টয়লেটে যাওয়ার পারমিশান নিল। তারপর ওরা চারজন আবার বেরিয়ে এল হলের বাইরে।

আকাশে এখনও মেঘ। চাঁদ মেঘের আড়ালে থাকলেও চাঁদের ঘোলাটে জ্যোতি দেখা যাচ্ছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। বড়-বড় গাছের পাতা এলোমেলো নড়ছে, পাতায়-পাতায় ঘষা লেগে খসখস শব্দ হচ্ছে।

ফেস্টিভ্যাল হল থেকে বেরিয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিটার দূরে টয়লেট। জায়গাটা স্কুল-বিল্ডিং-এর পিছনদিক। টয়লেটের বাঁ-দিকে রেলিং ঘেরা বাগান। আর ডানদিকে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

এই টয়লেটটা সাধারণত তালা দেওয়া থাকে। এখন রিহার্সাল চলছে বলে বড়দির নির্দেশে তালা খুলে দেওয়া হয়েছে। মাঠে যখন প্যান্ডেল বেঁধে স্কুলের কোনও ফাংশান-টাংশান হয় তখন এই টয়লেটটা গেস্টদের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

ওরা চারজন টয়লেটের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঝিলমিল লাগানো বিশাল দরজা—প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তিনটে সিঁড়ির ধাপ উঠে তারপর টয়লেটে ঢুকতে হয়।

সম্পি বলল ও আগে যাবে। তখন ইলিনা বলল, ‘তোর ব্যাগটা আমার কাছে দিয়ে যা—।’

তাতে ও স্পষ্ট জবাব দিল, ‘না রে, ব্যাগ আমার সঙ্গে থাক...।’ তারপর দরজা ঠেলে ঢুকে গেল।

ব্রিটিশ আমলের টয়লেট। তার সিলিং যেমন উঁচু, আকারও তেমনি বিশাল। তবে মাত্র একজন ব্যবহার করতে পারে।

টয়লেটে চল্লিশ ওয়াটের দুটো বালব জ্বলছে। বাঁ-দিকের দেওয়ালে বড় ওয়াশ বেসিন। তার ওপরে বিরাট মাপের বেলজিয়ান আয়না। তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বাথটাব। লম্বায় প্রায় আট ফুট হবে। তার সাদা রং অনেক জায়গায় চটে গিয়ে জং ধরা লোহা বেরিয়ে পড়েছে।

ডানদিকে বড় মাপের ইউরিনাল কিউবিকল, আর তার পাশে একটা ছোট ঘর হল ল্যাট্রিন।

টয়লেটের দেওয়ালে-দেওয়ালে ঝুল-কালি আর মাকড়সার জাল দেখে বোঝাই যায় এটা খুব কম ব্যবহার হয়।

টয়লেটের দরজা বন্ধ করল সম্পি। তারপর দু-পাল্লার ঝিলমিলের ওপরে কাঠের লক আটকে দিল।

এবার ও টয়লেটের প্রতিটি আনাচকানাচ খতিয়ে দেখে নিল যে, টয়লেটে সত্যিই ও একা।

সিলিং-এর দিকে তাকাল সম্পি। অনেক উঁচুতে চার দেওয়ালে চারটে বড় মাপের ভেন্টিলেটার। তার চারপাশে মোটা-মোটা ঝুল জমে আছে।

সম্পির একটু ভয়-ভয় করছিল। ও ব্যাগটা শুকনো মেঝেতে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ইউরিনাল কিউবিকল-এ ঢুকল। তখনই যেন একটা ছোট্ট কাশির শব্দ শুনতে পেল।

ও গলা বাড়িয়ে বাইরেটা আবার দেখে নিল। কেউ নেই।

ভাগ্যিস ও ভয়ে চিৎকার করে ওঠেনি! স্কুলে ডাকাবুকো বলে যার পরিচয় তাকে সবাই ভিতুর ডিম বলে ডাকুক এটা ও কিছুতেই চায় না।

কিন্তু ইউরিনাল কিউবিকল থেকে ও যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন টয়লেটে ও একা নয়। টয়লেটের দরজার কাছে রনিতা ম্যাডাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর মুখটা এখনও পালটে যায়নি, কিন্তু দু-চোখে সাদা আলো জ্বলছে।

ম্যাডামের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুল ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়ে। সম্পি ওর নাম জানে না, তবে মুখটা চেনে। যতদূর মনে পড়ছে, মেয়েটা ক্লাস নাইনের ‘সি’ সেকশানে পড়ে। ওর চোখেও সাদা আলো ধকধক করে জ্বলছে।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা সম্পি ততটা ভয় পেল না। কারণ, দরজার বাইরে ওর তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আবার অনুষ্কা রয়েছে।

কিন্তু এই পিশাচ দুটো কোথায় লুকিয়ে ছিল? সম্পি তো এদের খুঁজে পায়নি! তা হলে কি ল্যাট্রিনের ছাদের ওপরে লেপটে শুয়ে ছিল?

সম্পি চিৎকার করার কথা ভাবল। কিন্তু দরজার ঠিক বাইরেই যখন তিন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তখন চিৎকার না করে ওদের স্বাভাবিক গলায় ডাকলেই হয়। তা হলে ওরা বুঝবে, সম্পি ভিতু নয়।

সম্পি 'ইলিনা! ইলিনা!' বলে ডেকে উঠল। ডাকটা সম্পির অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিৎকারের মতো হয়ে গেল।

কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

পিশাচ দুটো চাপা খিলখিল হাসিতে ঢলে পড়ল। গোপন রসিকতায় এ ওর গায়ে ঠেলা মারতে লাগল। রনিতা ম্যাডাম ওঁর ছাত্রীর যেন ইয়ার-দোস্ত হয়ে গেছেন।

'ওরা কেউ নেই রে। ওরা চলে গেছে।' হেসে বললেন রনিতা। ওঁর গলাটা অস্বাভাবিকরকম মিহি শোনাল : 'আমাদের মতো আর-একজন ওদের মিছে কথা বলে ডেকে নিয়ে গেছে। তোর পাহারা থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

পিশাচের কথা বিশ্বাস করল না সমর্পিতা। ও আবার ইলিনা আর অনুষ্কার নাম ধরে জোরে-জোরে ডেকে উঠল—একবার, দু-বার, তিনবার।

না, কেউ সাড়া দিল না। সম্পির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

পিশাচ দুটো আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। কাচের চুড়ির সঙ্গে কাচের চুড়ি ঠোকাঠুকি লাগল যেন। তারপর আহ্লাদে আটখানা হয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল।

'কেউ নেই—' আঙুল ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বললেন রনিতা, 'তুই এখন আমাদের। তোর বন্ধু অনুষ্কা—ওই ন্যাকা ভ্যাম্পায়ারটা—ওকেও আজ আমরা খতম করব। ভ্যাম্পায়ার, কিন্তু মানুষ ধরা পছন্দ করে না। ন্যাকাষষ্ঠী! বেড়াল বলে মাছ ছোঁব না! তার উপর আমাদের পিণ্ডি চটকানোর প্ল্যান আঁটছে! আজ দেখব কত দৌড়!'

'তোকে আজ কেউ বাঁচাতে পারবে না।' রনিতার সঙ্গী পিশাচটা বলল, 'আজ আমাদের পূর্ণিমা ফেস্টিভ্যাল...।'

সম্পি ঝুঁকে পড়ে ওর ব্যাগ খুলল। একটা জলের বোতল বের করে ছিপি খুলল। ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে।

পিশাচ দুটো বিদ্যুৎঝলকের মতো লাফ দিল। এক লহমায় চলে এল সম্পির কাছে। ওর দু-পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াল। লম্বা জিভ বের করে ওর ঘাড়-গলা চাটতে লাগল। আর মুখ থেকে জড়ানো গলায় 'আঃ—! আঃ—!' করে লোভের শব্দ বের করতে লাগল।

সমর্পিতার গা ঘিনঘিন করছিল কিন্তু একইসঙ্গে আরাম কিংবা তৃপ্তির ঝিমুনি লাগছিল। সেই অবস্থাতেই ওর মনে প্রশ্ন জাগল : এই পিশাচগুলো কি সম্মোহন জানে?

রনিতা ম্যাডাম সম্পির হাতের জলের বোতলের দিকে তাকিয়ে নেশা-ধরা গলায় বললেন, 'সম্পি, তোর তেষ্টা পাচ্ছে, তেষ্টা?...আমাদেরও পাচ্ছে...দারুণ তেষ্টা...তেষ্টা—আ—আ—আঃ...!'

রনিতা ম্যাডামের কথা শেষ হওয়ার আগেই জলের বোতলটা ওঁর মাথায় উপুড় করে দিল সম্পি। তাই রনিতার শেষ দিকের 'আঃ!'-টা আরামের শীৎকার থেকে যন্ত্রণার চিৎকারে বদলে গেল।

মানুষের মাথার ওপরে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতল উপুড় করে দিলে যে-দশা হয় রনিতা ম্যাডামের দশা তার চেয়েও দশগুণ খারাপ হয়ে গেল।

ওর শরীর গাঢ় ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। গরম তেলের ওপর জলের ফোঁটা পড়ল যেরকম চড়বড়-চড়বড় শব্দ হয় সেরকম শব্দ হতে লাগল। তার সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণার মরণ আর্তনাদ।

ধোঁয়াটে রনিতা ম্যাডাম কেমন যেন দলা পাকিয়ে খসে পড়ল মেঝেতে।

বৃষ্টির জলের সত্যি-সত্যি এত শক্তি!

সম্পি তাজ্জব হয়ে গেল। এই পিশাচটাকে নিকেশ করার জন্য ও কতদিন ধরে বৃষ্টির জল জমিয়ে রেখেছিল। দুটো প্লাস্টিকের বোতলে সেই জল ভরে ও সেই কবে থেকে স্কুল-ব্যাগে বোতলগুলো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে!

আজ সেটা কাজে এল।

ধেড়ে পিশাচ তো পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু কচিটা?

সেটা তখন সম্পিকে জাপটে ধরে ইস্পাতের দাঁতের পাটি ফাঁক করেছে। এবং সেই ধারালো দাঁত বসিয়ে দিতে চাইছে সমর্পিতার গলায়।

সম্পি এক ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল—অনেকটা যুদ্ধের ডাকের মতো। তারপর বোতলে যে-সামান্য জল ছিল সেটা ছুড়ে দিল দ্বিতীয় পিশাচের গায়ে।

পিশাচটার গা থেকে ধোঁয়া বেরোল। ওটা চকিতে দু-পা পিছিয়ে গেল সম্পির কাছ থেকে।

সমর্পিতা এইটুকু সময়ই চাইছিল। যন্ত্রের মতো নির্ভুল দ্রুতগতিতে ও ব্যাগ থেকে দ্বিতীয় জলের বোতলটা বের করে নিল। একলাফে আহত পিশাচটার কাছে পৌঁছে গেল। ছিপি খুলে বোতলের জল ঢেলে দিল ওটার মাথায়।

ধোঁয়া। চড়বড় শব্দ। যন্ত্রণার চিৎকার।

পিশাচটা পড়ে গেল মেঝেতে। ধোঁয়ায় মাখামাখি হয়ে ছটফট করতে লাগল।

দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে দরজার দিকে পাগলের মতো ছুট লাগল সম্পি। একইসঙ্গে খ্যাপাটে চিৎকার করতে লাগল। হাতের খালি বোতলটা এক ঝটকায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে টয়লেটের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর ছিটকিনি খুলে সোজা বাইরে।

সম্পি বাইরে এলেও ওর চিৎকার থামেনি। চিৎকার করতে-করতে ও ছুটে গেল ফেস্টিভ্যাল হলের দরজার দিকে।

ওর চিৎকার শুনে অনেকেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দরজার কাছে ভিড় করে সবাই দাঁড়িয়ে। পুরোনো ঘটনার কথা মনে রেখে কেউই এগোতে সাহস পায়নি।

সম্পি ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলি ম্যাডামকে দেখতে পেয়ে ওঁর ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিকৃত গলায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘পিশাচ! পূর্ণিমা! পিশাচ! টয়লেটে। রনিতা...রনিতা ম্যাডাম...পিশাচ!’

এটুকু শুনেই কাকলি ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সম্পি টাল সামলাতে না পেরে আর-একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল— কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিল।

মেয়েরা কাকলি ম্যাডামকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

অন্যরা সমর্পিতাকে ঘিরে ধরে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগল।

ও বড়-বড় শ্বাস টেনে অনেক কিছু বলতে চাইল, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে জড়ানো এলোমেলো শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধাতস্থ হয়ে সম্পি টয়লেটের ভয়ংকর ঘটনা সবাইকে খুলে বলল। তারপর জিগ্যেস করল, ইলিনা, সজনী, অনুষ্কা ওরা কোথায়।

কেউই কিছু বলতে পারল না। সবাই শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। ভয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে রইল।

হঠাৎই একটি মেয়ে বলল, ‘তোমার সঙ্গেই তো ওরা তিনজন হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো আর দেখিনি—।’

তা সত্ত্বেও সম্পির চোখ ভিড়ের মধ্যে তিন বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। কোথায় গেল ওরা? ওদের ফোন করার কোনও উপায় নেই, কারণ মোবাইল ফোন ও টয়লেটে ব্যাগে ফেলে এসেছে।

সম্পি এতক্ষণে ভয় কাটিয়ে দম ফিরে পেয়েছিল। ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে জুতসই একজন সঙ্গী খুঁজতে লাগল। ইলিনাদের খোঁজার জন্য কয়েকজনকে ও সঙ্গে নিতে চায়।

ও সামনে দাঁড়ানো দুজন মেয়েকে বলল, ‘আমি ইলিনাদের খুঁজতে যাব। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?’

ওর কথায় দুজনের জায়গায় ছ'জন ওর কাছে এগিয়ে এল : 'চলো, আমরা যাব...।'

সম্পির চোখ সাহসী রবিনা ম্যাডামকে খুঁজল কিন্তু দেখতে পেল না।

কয়েকজনকে জিগ্যেস করে জানল, মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে ক্লাস নাইনের একটি মেয়ে এসে রবিনা ম্যাডামকে কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেছে।

সম্পি আর দাঁড়াল না। ওর মন কু-ডাক ডাকতে লাগল। ওর মনে হল, রবিনা ম্যাডাম, ইলিনা, সজনীদের খুব বিপদ। কারণ আজ পূর্ণিমা।

অনুষ্কা কি পারবে সবাইকে বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সম্পি পিচের রাস্তা ধরে বাস্কেটবল গ্রাউন্ডের দিকে রওনা হল। প্রায় সাত-আটজন মেয়ে দল বেঁধে ওর সঙ্গী হল। শম্পা ম্যাডাম বারবার সম্পিকে ডাকলেন, অন্ধকারে এসব খোঁজাখুঁজির কাণ্ড থামাতে বললেন। কিন্তু সম্পির আজ কোনও বারণ না শোনার দিন।

নিরুপায় শম্পা ম্যাডাম তখন মোবাইল ফোন নিয়ে বড়দিকে ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সম্পিরা তখন হইহই করে এগিয়ে চলেছে। থেকে-থেকে ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কার নাম ধরে ডাকছে।

আকাশের চাঁদের দিকে সম্পির চোখ গেল।

মেঘের আড়াল সরিয়ে ফ্যাকাশে হলদে চাঁদ কখন যেন বেরিয়ে এসেছে।

।।এগারো।।

উদভ্রান্তের মতো যে-মেয়েটি ওদের কাছে ছুটে এল ইলিনারা ওর মুখ চেনে, কিন্তু নাম জানে না। ক্লাস টেন-এর-ই অন্য কোন একটা সেকশানে যেন পড়ে।

ইলিনা, সজনী আর অনুষ্কা টয়লেটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সমর্পিতার বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মেয়েটা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'তোমাদের তিনজনকে...রবিনা ম্যাডাম...এক্ষুনি ডাকছেন। তোমাদের নাম ইলিনা, সজনী আর...আর অনুষ্কা তো?'

ওরা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'তোমাদের...তোমাদের রবিনা ম্যাডাম...এক্ষুনি ডাকছেন...খুব দরকার।'

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় যতটুকু দেখা গেল তাতে 'খুব দরকার' ভাবটা মেয়েটির চোখে-মুখেও ফুটে উঠেছিল।

'ম্যাডাম কোথায়? ফেস্টিভ্যাল হলে?'

'না, ম্যাডাম হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাসের পেছনের দিকে গেলেন। তোমাদের তিনজনকে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে বললেন...।'

ইলিনারা ইতস্তত করল। এ ওর দিকে তাকাল। রবিনা ম্যাডাম হঠাৎ ক্যাম্পাসের পিছনদিকে কী করতে গেলেন?

অনুষ্কা বলল, 'ইলিনা, সজনী—তোমরা বরং যাও, আমি এখানে থাকছি।'

মেয়েটি অসহায়ের মতো বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম যে তিনজনকেই ডেকেছেন—বলেছেন ভীষণ আর্জেন্ট...।'

তখন অনুষ্কা ওকে বুঝিয়ে বলল, 'আমাদের এক বন্ধু টয়লেটে গেছে। আমরা ইন ফ্যাক্ট ওর জন্যেই ওয়েট করছি। ও বেরোলে আমরা...।'

মেয়েটি বেশ বিপন্ন গলায় বলল, 'তা হলে তো খুব প্রবলেমে পড়লাম! ম্যাডাম যেভাবে বললেন...।'

ইলিনা মোবাইল ফোন বের করে সমর্পিতাকে ফোন করতে লাগল।

রিং বেজে গেল, কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। তখন ইলিনা ফোন কেটে দিল।

'ফোন বেজে যাচ্ছে। ও ধরছে না—।'

সজনী বলল, 'ওর ফোনটা নিশ্চয়ই সাইলেন্ট মোডে আছে—।'

অনুষ্কা বলল, ‘ঠিক আছে। তোমরা দুজন যাও—নিশ্চয়ই ওখানে কোনও প্রবলেম হয়েছে। আমি এখানে থাকছি। সম্পি টয়লেট থেকে বেরোলে তারপর আমি যাব। কোনও ভয় নেই—।’

‘ভয়? ভয় কীসের?’ অন্য মেয়েটি কৌতূহলে জানতে চাইল।

ইলিনা আর সজনী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ‘না, না—এমনি। চলো, যাই...।’

ওরা দুজনে যখন মেয়েটির সঙ্গে এগোচ্ছে তখন অনুষ্কা ডেকে বলল, ‘কোনও প্রবলেম হলেই আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে ফোন কোরো। সম্পি বেরোলেই আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি—।’

‘ঠিক আছে।’ বলে ওরা জোর পায়ে হাঁটা দিল।

দু-পাশে গাছপালা, মাঝখান দিয়ে পিচের রাস্তা। ল্যাম্পপোস্টের হলদে আলো এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। অন্ধকার আর আলো দাবার ছক তৈরি করেছে যেন।

রিহার্সালের গানের আওয়াজ কানে আসছে। তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ।

অনুষ্কা আনমনাভাবেই আকাশের চাঁদের দিকে তাকাল। কী সুন্দর গোল আর স্পষ্ট। ওর ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। ছবির চাঁদটা মেঘে ঢাকা পড়েছে কি না কে জানে! প্রকৃতির সঙ্গে ওই ছবিটা সবসময় মেলে না।

চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনুষ্কার কেমন ঘোর লেগে গেল। ও অপলকে তাকিয়ে নিশিনাথকে দেখতে লাগল।

হঠাৎই অনুষ্কার হাতের মুঠোয় ধরা মোবাইল ফোন থরথর করে কেঁপে উঠল। ও চমকে উঠে ফোনের পরদার দিকে তাকাল।

ইলিনা।

ফোন ধরতেই ইলিনার বিপন্ন গলা শোনা গেল। শুধু বিপন্ন নয়, ওর গলা কাঁপছে।

‘অনুষ্কা, শিগগির এসো—সর্বনাশ হয়েছে!’

‘তোমরা কোথায়?’

‘পিছনদিকের পাঁচিলের কাছে—যেখানে তুমি আর আমি কোকিল দেখতে গিয়েছিলাম। সেই ইটের পাঁজা...।’

আর শোনার দরকার মনে করল না অনুষ্কা। ফোন কেটে দিয়ে পিছনের বাউন্ডারি ওয়ালের দিকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে শুরু করল।

আলো আর অন্ধকারে ওর শরীরটা একবার দেখা যাচ্ছিল, একবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। যেন ওর ছুটন্ত শরীরটা জ্বলছে-নিভছে।

ছুটতে-ছুটতে অনুষ্কার মনে হল, টয়লেটের দিক থেকে একটা মিয়োনো ডাক যেন ভেসে এল। ইলিনার নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল যেন।

কিন্তু ওর সামনে দু-বন্ধুর ডাক, পিছনে এক বন্ধুর ডাক। তাই অনুষ্কা দৌড় থামাল না—ছুটতেই থাকল। সেই অবস্থাতেই ও লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে শূন্যে ভেসে উঠে অলৌকিক গতিতে দূরত্ব কমাতে লাগল।

মনে হচ্ছিল যেন ও উড়ে চলেছে। অন্ধকার কিংবা গাছপালা ওর গতি রুখতে পারছিল না। ওকে এই অবস্থায় দেখলে যে-কেউ স্তম্ভিত হয়ে যেত, ভয় পেত।

অকুস্থলে পৌঁছতে অনুষ্কার সময় লাগল আট সেকেন্ডেরও কম। রাস্তা ছেড়ে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

ওই তো, পুরোনো টিন, কাঠ আর অ্যাসবেস্টস। তার পাশে ইটের পাঁজা। ইটের পাঁজার ওপরে শুয়ে আছে ওরা দুজন কে? শুয়ে-শুয়ে ছটফট করছে? গায়ে স্কুল-ড্রেস?

জায়গাটা অন্ধকার। গাছপালার পাতার আড়াল থাকায় চাঁদের আলোও সেখানে ঢোকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্যাম্পায়ার মেয়ের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

চিত হয়ে শুয়ে আকুলিবিকুলি করছে ইলিনা আর সজনী। ওরা যে চিৎকার করতে পারছে না তার কারণ স্কুল-ড্রেস পরা একটা পিশাচ ওদের ওপর উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পিশাচটার মুখ ভয়ংকর, চোখ জ্বলছে, ইস্পাতের দাঁত ঝিলিক দিচ্ছে।

কিন্তু রবিনা ম্যাডাম কোথায়?

প্রশ্নটা অনুষ্কার মনে ঝলসে গেলেও একইসঙ্গে ও প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করল।

ও ইলিনাদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দূরত্বটাকে ও মোটেই কমাতে চেষ্টা করল না। ওখানে দাঁড়িয়েই ওর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিল।

হাতটা পলকে রবারের মতো লম্বা হয়ে গেল। একইসঙ্গে হাতের পেশি, শিরা-উপশিরা সব দেখা গেল। যেন অনুষ্কার হাতটা স্বচ্ছ কাচের তৈরি।

পিশাচটা ততক্ষণে ইলিনার গলার খাঁজে কামড় বসিয়েছে। আর ঠিক তখনই অনুষ্কার হাতের চেটোতে কতকগুলো কাঁটা গজিয়ে গেছে—ছুচলো ইস্পাতের কাঁটা।

সেই হাতে বজ্রমুঠিতে পিশাচটার ঘাড় চেপে ধরল অনুষ্কা। শরীর থেকে যেমন করে জোঁক ছাড়ায় সেভাবে পিশাচটাকে ইলিনার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল, এক হ্যাঁচকায় টেনে নিল নিজের কাছে।

ইলিনা আর সজনী এবার প্রাণপণ চিৎকার জুড়ে দিল। সেই চিৎকারে গাছপালার ঘুমন্ত পাখিরা জেগে উঠে ডাকতে লাগল, ওড়াউড়ি শুরু করল।

ইলিনারা টের পেল দারচিনির গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

ইলিনার গলা থেকে রক্ত পড়ছিল, মাথা টলে যাচ্ছিল। ও কোনওরকমে উঠে বসল। তাকাল অনুষ্কার দিকে।

সজনীও তাকাল।

ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ইলিনার প্রিয়তম ভ্যাম্পায়ার! শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে।

অনুষ্কার হাতের মুঠোয় পিশাচটার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওটা হাঁ করে বাতাস টানার চেষ্টা করছিল। যন্ত্রণার চিৎকার করছিল। ইস্পাতের দাঁতের পাটি ঝকঝক করছে। আর তার ফাঁকে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকানো একটা কালো রঙের জিভ। সেটা কখনও-কখনও লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে।

অনুষ্কার শক্তি এতটাই যে, পিশাচটা তার কানাকড়িও ডিঙোতে পারছিল না। তাই জেতার চেষ্টা করতে-করতে ওটা কাহিল হয়ে পড়ল।

অনুষ্কা মোবাইল ফোন ফেলে দিয়ে বাঁ-হাতে পিশাচটার নাক চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দ করে পিশাচটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে।

অনুষ্কা ওটাকে ছেড়ে দিল। ওটার নিষ্প্রাণ শরীরটা ভেজা কাপড়ের মতো খসে পড়ল মাটিতে। পড়েই রইল।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

ইলিনা আর সজনী থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

এই তা হলে অনুষ্কার গোপন শক্তি! অনুষ্কা না থাকলে ইলিনারা আজ বাঁচত না।

কৃতজ্ঞতার আবেগে ইলিনার কান্না পেয়ে গেল। একইসঙ্গে গলার অসহ্য যন্ত্রণা ওকে অজ্ঞান করে দিতে চাইছিল। ও সজনীকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল।

সজনীর অবস্থা তখন সাংঘাতিক। ওর বুক ধড়াস-ধড়াস করছিল। আধো-অন্ধকারে এইমাত্র ও কী দেখল? ওদের বন্ধু অনুষ্কা! সে কেমন পালটে ভয়ংকর হয়ে গেল! অমানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমানুষিক লড়াই করল!

সজনীর বুক ঠেলে কান্না উথলে উঠছিল। একইসঙ্গে একটা অচেনা ভয় ওকে অবশ করে দিচ্ছিল।

ইলিনা আর সজনী নেমে এল ইটের পাঁজা থেকে। দুজনেই ভয়ে কাঁপছে, কাঁদছে।

ইলিনার স্কুল-ড্রেস রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ও সজনীকে আঁকড়ে ধরে পা ফেলছিল। যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠছিল।

অনুষ্কা ছুটে গিয়ে ওদের জাপটে ধরল। ওরা তিনজনেই হাঁপাচ্ছিল। কাঁদছিল। আর সজনী শিউরে উঠছিল।

একটু পরে অনুষ্কা সজনীকে বলল, 'শিগগির সম্পিকে একটা ফোন করো...।' কথাটা বলেই ও ইলিনার গলায় নিজের রুমালটা চেপে ধরল। যে করে হোক রক্তটা বন্ধ করা দরকার।

সজনী কান্না-ভাঙা কাঁপা গলায় বলল, 'আমাদের দুজনের কারও মোবাইল নেই। গণ্ডগোলের সময় কোথায় ছিটকে পড়েছে জানি না...।'

'আমার ফোন থেকে ফোন করো। ওই তো আমার ফোন ওখানে পড়ে আছে।'

সজনী এগিয়ে গেল সামনে। অন্ধকারে হাতড়ে অনুষ্কার মোবাইলটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল।

সম্পিকে ও ফোন করতে যাবে, তখনই অনুষ্কা জিগ্যেস করল, 'আমরা যে পিশাচটাকে খতম করলাম সেটাই কি টয়লেটের ওখানে আমাদের ডাকতে গিয়েছিল?'

সজনী নাক টেনে-টেনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'না, ও ভালো মেয়ে। এখানে এসে দূর থেকে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে দিয়েই ও ছুটে আবার ফেস্টিভ্যাল হলে চলে গেছে। আমরা এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে খুঁজছি, তখনই ওই শয়তান পিশাচটা এগিয়ে এল। তারপর...।'

সজনী কথা বলছিল আর একইসঙ্গে সম্পির নম্বর ডায়াল করে মোবাইল ফোনটা কানে চেপে ধরেছিল।

রিং হয়ে যাচ্ছে। ফোন কেউ ধরছে না।

সে-কথাই ও বলল অনুষ্কাকে।

অনুষ্কা বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওঃ, আবার সেই সাইলেন্ট মোড! শিগগিরই চলো, ইলিনাকে এখুনি ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে। কুইক—।'

ইলিনা অনুষ্কার গায়ে প্রায় এলিয়ে পড়েছিল। চোখ বুজে 'ও—ওঃ! ও—ওঃ!' শব্দ করে কাতরাচ্ছিল।

ওকে যে করে হোক সুস্থ করে তুলতে হবে। অনুষ্কা ভাবল। আরও গাঢ় করে ইলিনাকে জাপটে ধরল ও।

সজনীকে ডেকে নিয়ে ও এগোতে যাবে তখনই ওর মনে পড়ল রবিনা ম্যাডামের কথা। যাঁর নাম করে সেই মেয়েটা ওদের ডেকে নিয়ে এল সেই রবিনা ম্যাডাম কোথায়? আর কোন আর্জেন্ট কাজের জন্য তিনি ওদের তিনজনকে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

সজনীকে রবিনা ম্যাডামের কথা জিগ্যেস করতেই ও বলল, 'জানি না। এখানে এসে রবিনা ম্যাডামকে আমরা একবারও দেখিনি। যখন ম্যাডামকে খোঁজাখুঁজি করছি তখন ইটের পাঁজার আড়াল থেকে ওই ভয়ংকর পিশাচটা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তো তুমি এলে...।'

ইলিনা যন্ত্রণায় রুদ্ধ গলায় কোনওরকমে বলল, 'অনুষ্কা, রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো?'

সজনী সে-কথায় সায় দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'আমিও ঠিক এই কথাটাই বলছিলাম। রবিনা ম্যাডামের কোনও বিপদ হয়নি তো!'

'না রে, আমার কোনও বিপদ হয়নি।' উত্তর দিলেন রবিনা ম্যাডাম নিজেই, 'এখন আমার আর কোনও বিপদের ভয় নেই...।'

ওরা তিনজনে চমকে উঠল। শব্দ লক্ষ করে তাকাল।

কাছেই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে রবিনা ম্যাডামের দেহটা লেপটে আছে। মাটি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাত উঁচুতে ওঁর শরীরটা উলটোভাবে শূন্যে ঝুলছে। পা ওপরে। মাথা নীচের দিকে।

বোধহয় অন্ধকারে ঢাকা কোনও জুতসই ডালে রবিনা পা দুটো আঁকশির মতো আটকে রেখেছেন।

রবিনার শরীর থেকে একটা নীলচে আভা বেরোচ্ছে। সেই আভার জন্যই ওঁকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু উলটো হয়ে থাকার জন্য স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছে না।

রবিনার গাল বসে গিয়ে চোয়ালটা সামনে বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো অন্ধকার কৃষ্ণগহ্বর। আর তার কেন্দ্রে সার্চলাইটের মতো উজ্জ্বল সাদা আলোর বিন্দু।

‘তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রে...অসম্ভব পাগল করা তেষ্টা।’ গাছের গায়ে উলটো হয়ে ঝুলে থাকা পিশাচটা বলল, ‘সেদিন রনিতাদি কী যে কামড় বসাল ঘাড়ে, তারপর থেকেই যত অশান্তি আর ভোগান্তির শুরু। তোরা তো আর বুঝবি না, পূর্ণিমার তেষ্টা কী জিনিস! আয়, তোরা কাছে আয়...আয়...।’

এইসব কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে রবিনার শরীরটা পেন্ডুলামের মতো অল্প-অল্প দুলতে লাগল। ঠিক যেন হাওয়ায় দুলছে। আর ওঁর মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

ইস্পাতের দাঁতের পাটি দেখা গেল। তার ফাঁক দিয়ে একটা লম্বা কালো জিভ সাপের মতো সড়সড় করে বেরিয়ে এল। ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। তারপর সেই দেড়ফুট লম্বা জিভটা নড়তে লাগল, দুলতে লাগল।

পিশাচটার চোখের দৃষ্টিতে বোধহয় সম্মোহন ছিল। কারণ, ইলিনা আর সজনী উলটোভাবে ঝুলে থাকা রবিনার নীল আলো মাখা দেহের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল।

অনুষ্কা ওদের হাত ধরে টেনে আটকে রাখল। চিৎকার করে বলল, ‘যেয়ো না—এখানে চুপ করে দাঁড়াও! যেয়ো না! আমার কথা শোনো—!’

হঠাৎই দারচিনির গন্ধে বাতাস মিষ্টি হয়ে গেল। এক ঝটকায় ইলিনা আর সজনীকে ছিটকে ফেলে দিল অনুষ্কা। তারপর ওর ডানহাত চোখের পলকে লম্বা হয়ে ছোবল মারল রবিনা ম্যাডামের গলায়। এবং একটানে পিশাচটাকে গাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ইলিনা আর সজনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ওদের বন্ধুর অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখছিল। মনে হচ্ছিল, ওদের চোখের সামনে যা-যা ঘটে চলেছে সেগুলো বাস্তব নয়, একটা গাঁজাখুরি সিনেমা।

সেই ‘সিনেমা’-য় অনুষ্কার হাতের ইস্পাতের কাঁটাগুলো পিশাচটার গলায় আমূল গেঁথে গেল। ওর হাতের টানে পিশাচটা রবারের সুতোয় বাঁধা বলের মতো ছিটকে চলে এল অনুষ্কার কাছে।

পিশাচটা যন্ত্রণার হাহাকার তুলছিল। মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল। অনুষ্কা বাঁ-হাতে খপ করে পিশাচটার নাক টিপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল পিশাচটার মরণ গোঙানি। বারবার হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল।

একটু পরেই ওটার সব লড়াই শেষ হয়ে গেল। সব তেষ্টা মিটে গেল।

অনুষ্কা ছেড়ে দিতেই ওটা এক টুকরো কাঠের মতো খসে পড়ে গেল মাটিতে।

অনুষ্কার ডানহাতটা আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। ও এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ঘোর কেটে যেতেই ওর বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। ও ফিরে তাকাল ইলিনার দিকে, সজনীর দিকে। ওদের বিপদে কাজে লাগতে পেরে মনটা ভীষণ ভালো লাগছে। এই ভালো লাগা আগে কখনও ও টের পায়নি।

অনুষ্কা ইলিনাকে তুলে ধরল। তারপর ওকে বুকে জড়িয়ে নিল : ‘শিগগির চলো, তোমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে...।’

সজনী নিজে থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। ও অনুষ্কার কাছে এসে ওর হাত ধরল। চাপা গলায় বলল, ‘থ্যাংক য়ু—।’

ইলিনাও অনুষ্কার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, ‘ও যা বলল, তাই...।’

অনুষ্কার কানে এল অনেকের হইচই চিৎকার।

ও চাঁদের দিকে তাকাল। কী স্পষ্ট, কী সুন্দর!

চাঁদকে এই মুহূর্তে ওর ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

ঠিক তখনই সম্পির গলা কানে এল। ওদের তিনজনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে।

।।বারো।।

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই।

এখন আমাকে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে।

আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মার অবিনশ্বর হতে অসুবিধে কী! সুতরাং আমি অমর।

তোমার কি মনে নেই, গীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।' অর্থাৎ, কোনও শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না।

তিনি আরও বলেছেন, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।

তা হলে আমার 'মৃত্যু' হবে কেমন করে?

তাই আকাশে, বাতাসে ধুলোয় মিশে আবার শুরু হোক আমার পথ চলা।

চলতে-চলতে আবার আমাকে খুঁজতে হবে নতুন আশ্রয়। নিতে হবে আবার কোনও নতুন পরিচয়। তারপর আবার বিশ্রাম আর আরাম।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, নতুন করে শুরু হবে আমার নতুন জীবন।

আঃ, ভাবতেই কী তৃপ্তি!


আমি পিশাচ



।।এক।।

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই। কবে কীভাবে আমার জন্ম তা জানি না। আমার বয়েস কত তাও জানা নেই। শুধু জানি, রক্ত আমার একমাত্র খাদ্য। রক্তের পিপাসা আমাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখনও যে পথ চলছি সেও ওই রক্তের টানে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে আসছে আমার।

আমাকে কেমন দেখতে?

বলছি। তবে শুনে যেন অবাক হয়ে যেয়ো না।

আমার কোনও নির্দিষ্ট চেহারা নেই। যখন যেখানে থাকি সেইরকম চেহারা নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিই। যেমন, যখন জঙ্গলে থাকি তখন গাছের পাতা কিংবা গাছের বাকল হয়ে যাই। পুকুরপাড়ে থাকলে ঘাস-পাতা, আগাছা, কিংবা মাটির চেহারা নিই। এটা ছদ্মবেশ যদি বলো তো তাই।

ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, নোংরা জায়গায় আমি থাকতে ভালোবাসি। তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মানুষ বা পশুর শরীর। ওদের শরীরের ভেতরটা নরম, স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধময়, নোংরা—আবার একইসঙ্গে রক্তের তাপে উষ্ণ। ওদের শরীরে আমি নিশ্চিন্তে বহুদিন থাকতে পারি। আর ওদের দিয়ে আমার রক্তের তৃষ্ণা মেটাই। আমার ইচ্ছেয় ওরা অন্যের শরীরে ধারালো দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নেয়। ওরা বুঝতেও পারে না, ওরা আসলে আমার তেষ্টা মেটাচ্ছে। কারণ, ওদের শরীরে ঢুকে পড়ার পর থেকেই ওদের মস্তিষ্ক চলে আমার কথায়। অর্থাৎ, ওদের শরীর আর মন—দুই-ই দখল করে ফেলি আমি।

তবে পশুর চেয়ে মানুষই আমার বেশি পছন্দ। কারণ, মানুষের রক্তের স্বাদ সবার সেরা। আর মানুষ শিকার করাও সহজ। তারপর, আমার হয়ে সেই মানুষ—কিংবা অমানুষ রক্তপিশাচ—যখন মানুষ শিকার করে, তখন তার কাজটাও সহজ হয়ে যায়।

আঃ! ভাবতেই কত তৃপ্তি!

কিন্তু এ-কাজে বিপদও আছে।

আমার দখলে থাকা অমানুষগুলো যখন ধরা পড়ে যায় তখন ওরা শাস্তি পায়। অন্যান্য সুস্থ মানুষ ওদের খতম করে। তখন আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। এক দেহের আশ্রয় ছেড়ে ছুটতে হয় অন্য আস্তানার খোঁজে।

বুঝতেই পারছ, মানুষ-পিশাচগুলোর বিনাশ হলেও আমার বিনাশ নেই।

তা হলে কি আমি অমর? কে জানে!

তবে আত্মা যদি অমর অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মা কিংবা পিশাচের অমর হতে অসুবিধে কী!

পথ চলতে-চলতে যখন ভীষণ একঘেয়ে আর ক্লান্ত লাগছে ঠিক তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই মেঘের সাজ-সাজ রব চোখে পড়েছিল, দুপুর পেরোতেই তার কান্নাকাটি শুরু হল।

চলতে আর ইচ্ছে করছিল না। তেষ্টায় আমার ভেতরটা ছটফট করছিল। তাই সামনের দোতলা বাড়িটায় ঢুকে পড়লাম।

প্রকাণ্ড বাড়ি। তার লাগোয়া খেলার মাঠ আর বাগান। মাঠে বর্ষার সবুজ ঘাস। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওরা বোধহয় এই তুমুল বর্ষার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এখন খুশিতে টগবগে হয়ে কলরোল শুরু করে দিয়েছে।

যাক, এবার আমার কাজ হল বিশ্রাম আর আরাম। আর তার জন্যে চাই একজন মানুষ—যার শরীরে আমি আশ্রয় নেব। তারপর...।

।।দুই।।

সত্যবানস্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। কালো বোর্ডের ওপরে ওঁর চক-ধরা আঙুল তাড়াহুড়ো করে আলপনা এঁকে চলেছে। অঙ্ক যেন স্যারের পোষা পাখি। কী সুন্দর স্যারের কথা শোনে! কোনও অঙ্কই স্যারের আটকায় না। ধরেই স্যাটাস্যাট করে দেন। সেইজন্যেই অচ্যুত, ঋদ্ধিমান, বাসব, সৌরভরা সত্যবানস্যারের নাম দিয়েছে 'স্যাটাস্যাট'।

স্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। আর ক্লাস নাইনের ছেলেরা মাথা নীচু করে চুপচাপ সেটা খাতায় টুকে নিচ্ছিল। অচ্যুত অঙ্কে দারুণ—সবসময় একশোয় একশো পায়। কিন্তু বীজগণিতের এই অঙ্কটা ওরও আটকে গেছে। হল অ্যান্ড নাইটের 'হায়ার অ্যালজেব্রা' থেকে এই অঙ্কটা স্যার আগের দিন করতে দিয়েছিলেন।

মাথা ঝুঁকিয়ে অঙ্ক টোকা শেষ হতেই কন্দর্প অচ্যুতকে আলতো করে খোঁচা মারল।

অচ্যুত পাশে ফিরে তাকাতেই কন্দর্প ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই, আমার ব্যাগ থেকে সাত টাকা চুরি গেছে।'

অচ্যুত অবাক হল না। কারণ, গত সাত-আটদিন ধরে ওদের সেকশানে এই চুরির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

প্রথম যে-চুরিটা ওদের নজরে পড়েছিল সেটা ঋদ্ধিমানের ব্যাগ থেকে চার টাকা উধাও হওয়ার ঘটনা। সেটা ওরা কেউই খুব একটা আমল দেয়নি। ভেবেছে ঋদ্ধিমানের হয়তো ভুল হয়েছে। ভুল করে টাকাটা অন্য কোথাও রেখে এসেছে।

কিন্তু তারপর, ওদের বন্ধু কুলদীপের ব্যাগ থেকে বারো টাকা উধাও হতেই অচ্যুতরা নড়েচড়ে বসেছে।

ক্লাসে কুলদীপের গায়ের জোরই সবচেয়ে বেশি। ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে কেউ পারে না। তা ছাড়া ও রোজ ব্যায়াম করে, বক্সিং ক্লাবে বক্সিং শেখে।

টাকা চুরি যেতেই কুলদীপ তো রেগে আগুন। ও সবাইকে শাসিয়ে বলল, 'চোর ধরা পড়লে এক ঘুসিতে নাক ফাটিয়ে বারো টাকার শোধ নেব।'

কিন্তু চুরির ব্যাপারটা থামল না। যেমন আজ কন্দর্পের টাকা চুরি গেছে। সুতরাং দুটো পিরিয়ডের ফাঁকে ওরা চার-পাঁচজন মিলে টিচার্স রুমে গিয়ে বাংলার অমিয়স্যারকে সব জানাল। স্যার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'হাতেনাতে তস্করকে না ধরা পর্যন্ত তো কোনও প্রমাণ নেই! যদি তোরা নক্তচরকে লাল হাতে ধরতে পারিস, তা হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আদ্যোপান্ত অবধান করিয়ে শাস্তি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

অচ্যুতরা আন্দাজ করতে পারল 'তস্কর' আর 'নক্তচর' মানে চোর। অমিয়স্যারকে নিয়ে এই এক মুশকিল! বাংলার স্যার বলে বড্ড বেশি বাংলায় কথা বলেন।

পরদিন থেকে ওরা পাঁচজন—অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, আর সৌরভ—চোর ধরার নানান মতলব আঁটতে লাগল।

এসব ব্যাপারে কুলদীপ ওদের লিডার। আর প্রতীক কুলদীপের সর্বক্ষণের সাথী। মাঝে-মাঝে কুলদীপকে দুষ্টু বুদ্ধির জোগান দেয় বলে প্রতীকের একটু কুখ্যাতি আছে। বাসব ক্লাসের মনিটর, এন. সি. সি-র ক্যাডেট। ডিসিপ্লিন নিয়ে সবসময় মাথা ঘামায়। হাঁটা-চলা করে সৈনিকের ঢঙে—যেন লেফট-রাইট করে প্যারেড

করছে। ক্লাসের অনেকেই ওর হাঁটার ঢং নকল করে ওকে ব্যঙ্গ করে—তবে আড়ালে। নইলে ও স্যারদের কাছে কমপ্লেন করে দেবে। আর যেহেতু সৌরভের ব্যাগ থেকে চব্বিশ টাকা চুরি গিয়েছিল, তাই চোর ধরার মতলবে ও একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টিফিনের সময় স্কুলের লাগোয়া খেলার মাঠে জামগাছতলায় বসে ওদের প্ল্যান আঁটার কাজ শুরু হল।

টিফিনের সময় অচ্যুতরা বেশির ভাগই ক্লাসরুম ছেড়ে খেলার মাঠে বেরিয়ে আসে। টিফিনটা কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে ওদের কলরোল খেলাধুলো শুরু হয়। ওদের চেঁচামেচিতে গাছে বসে থাকা বুলবুলি, শালিখ, বসন্তবৌরি আর দোয়েল পাখিরা উড়ে পালায়। আধঘণ্টা পর ক্লাস বসলে মাঠটা হঠাৎ আবার ফাঁকা নির্জন হয়ে যায়। তখন পাখিরা বোধহয় হাঁফ ছেড়ে ফিরে আসে।

চুরির ঘটনাগুলো খতিয়ে বিচার করার পর প্রতীক বলল, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা যে নেয় সে টিফিনের সময় নেয়। ক্লাসে তখন যদি অন্যরা কেউ বসে থাকে তা হলে নেয় না। কিন্তু ফাঁক পেলেই ব্যাগ হাতড়ায়। টিফিনের সময় ক্লাসরুমটা ওয়াচ করতে হবে।'

তখন ঠিক হল, রোজ টিফিনের সময় সৌরভ ওদের ক্লাসরুমে ডেস্কের নীচে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। ক্লাসে কেউ ঢুকলে সৌরভগেক দেখতে পাবে না। ফলে চোরবাবাজি ধরা পড়বেই।

যেমন মতলব তেমনি কাজ। এবং ফল পাওয়া গেল তিনদিনের মধ্যেই।

সৌরভ ক্লাসরুমে লুকিয়ে ছিল। ওদের ক্লাসে দুটো করে ডেস্ক পাশাপাশি তক্তা দিয়ে জুড়ে দুজনের বসার মতো ব্যবস্থা করা আছে। সেই জোড়া ডেস্কগুলোকে আবার পাশাপাশি সাজিয়ে ডেস্কের সারি তৈরি করা হয়েছে। আর ক্লাসরুমের মাঝ-বরাবর রয়েছে যাতায়াতের প্যাসেজ।

সৌরভ ক্লাসরুমের একেবারে শেষে এককোণে একটা জোড়া ডেস্কের নীচে লুকিয়ে ছিল। অত বড় ঘরে আর কেউ নেই। সব চুপচাপ। শুধু তিনটে সিলিং ফ্যান ঘোরার শব্দ হচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে সৌরভের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একটা জেদ ওকে দিয়ে এই কষ্ট সইয়ে নিচ্ছিল।

আগের দু-দিন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আজ ঘটল।

মিনিটদশেক যেতে না যেতেই একজোড়া পা দেখতে পেল সৌরভ।

খুব সাবধানে দুটো ডেস্কের পায়ার একচিলতে ফাঁক দিয়ে ও উঁকি মারল। দেখল, ওদেরই ক্লাসের রাজীব দাস প্রথম সারির ডেস্কের ব্যাগগুলো ব্যস্তভাবে হাতড়াচ্ছে। কোনও-কোনও ব্যাগের ভেতর থেকে কী যেন মুঠো করে নিয়ে পকেটে ঢোকাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্লাসরুমের দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

মাত্র পাঁচমিনিট। তার মধ্যেই দুটো ডেস্কের সারির তল্লাশি চটপট সেরে ফেলল রাজীব। যা পেল পকেটে গুছিয়ে নিল। তারপর তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

না, সৌরভ 'চোর, চোর' বলে চেঁচায়নি। কারণ, সেইরকমই কথা ছিল। ও শুধু চুরির ঘটনাটা কুলদীপ, অচ্যুতদের জানিয়ে দিল। বলল, এই কুকীর্তি কার।

এই খবরটা জানার পর কুলদীপরা চোর ধরার ফাঁদ পাতল। ওরা পাঁচজন টিফিনের সময় ক্লাসরুমের পাঁচ জায়গায় ডেস্কের নীচে ঘাপটি মেরে রইল।

ওদের হতাশ হতে হল না। কারণ, চোর এল এবং চটপট কাজ সারতে লাগল।

কুলদীপ সকলের আগে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। ওর পিঠের ধাক্কায় একজোড়া ডেস্ক দড়াম করে মেঝেতে উলটে পড়ল।

ও চিৎকার করে রাজীবকে জাপটে ধরল, 'ব্যাটা চোর, রোজ বন্ধুদের টাকা চুরি করিস—লজ্জা করে না!'

ততক্ষণে সৌরভ, বাসব, প্রতীক আর অচ্যুত ওদের লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওরা সবাই রাজীবকে ঘিরে ধরল। তারপর রাজীবকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল টিচার্স রুমে।

এখন টিফিনের সময়। একটা প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরে স্যারেরা বসেছিলেন। কয়েকজন গল্পগুজব করছিলেন, কেউ-কেউ টিফিন সারছিলেন। বেয়ারা সেবকরাম একপাশে দাঁড়িয়ে চক-ডাস্টার গুছিয়ে রাখছিল।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কুলদীপরা চট করে ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিল। ওদের ক্লাসটিচার ভূগোলের কালীপদস্যারকে ওরা দেখতে পেল না। বোধহয় কোনও কাজে বাইরে বেরিয়েছেন। তবে অমিয়স্যার আর সত্যবানস্যার ছিলেন। সত্যবানস্যার টিফিন করছিলেন। আর অমিয়স্যার খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

টিচার্স রুমের দরজায় ওদের জটলা দেখে কেউ-কেউ অবাক হয়ে দেখছিলেন।

বাসব অমিয়স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে আসব, স্যার?'

অমিয়স্যার কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। কুলদীপ, সৌরভ, বাসবদের দেখে বুঝলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কারণ, কুলদীপ রাজীবের কবজি শক্ত করে চেপে ধরে ছিল।

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অমিয়স্যার। খবরের কাগজটা একটা ডাস্টার চাপা দিয়ে রেখে চটপট চলে এলেন দরজার কাছে।

'কী রে, কী হয়েছে!'

ওরা হাঁফাতে-হাঁফাতে রাজীব দাসের কীর্তির কথা বলল।

অমিয়স্যার ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। ব্যাপারটা ওঁর মনে পড়ে গেল। তিনিই ওদের বলেছিলেন চোরকে হাতেনাতে ধরার কথা।

তিনি রাজীবকে বললেন, 'তুই এখানে থাক।' তারপর অচ্যুতদের দিকে ফিরে : 'তোরা শ্রেণিতে যা। আমি ব্যাপারটা দেখছি—।'

এমন সময় সত্যবানস্যার ওদের পাশ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের জটলা নিয়ে কোনওরকম কৌতূহল দেখালেন না। একজন অচেনা মানুষের মতো পাশ দিয়ে চলে গেলেন। অথচ দু-তিনদিন আগেও অচ্যুতকে দেখলে হেসে বলতেন, 'কী রে, দিনরাত শুধু ক্রিকেট নিয়ে পড়ে আছিস, নাকি অঙ্ক-টঙ্কও একটু-আধটু হচ্ছে? ভালো করে পড়। মাধ্যমিকে অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়া চাই-ই চাই।'

অচ্যুত বেশ অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ধরে ও সত্যবানস্যারের চলে যাওয়া দেখল।

আর ঠিক তখনই টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। স্কুলের দারোয়ান বানজারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল পিতলের ঘণ্টায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে তাল ঠুকে জানিয়ে দিচ্ছে টিফিনের আধঘণ্টা শেষ হয়েছে। এখন আবার ক্লাস শুরু হবে।

ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময় অচ্যুতের এরকম একটা পিতলের ঘণ্টা কেনার খুব শখ হয়েছিল। কিন্তু বাপি আর মা সেই শখের কথাটা শুনে হেসে এমন গড়িয়ে পড়েছিল যে, অচ্যুতের আর ঘণ্টা কেনা হয়ে ওঠেনি।

স্কুলের চওড়া বারান্দা ধরে ওরা ক্লাসের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। এখন দুপুর হলেও আকাশ মেঘলা। যখন-তখন বৃষ্টি হতে পারে। গত ক'দিন ধরেই ঝেঁপে বৃষ্টি চলছে। মাঝে-মাঝে এক-আধ-ঘণ্টার বিরতি। বৃষ্টিও বোধহয় তখন টিফিন করতে যায়—নয়তো ঘুমিয়ে পড়ে।

স্কুলের মাঠটা বৃষ্টিতে যাচ্ছেতাই হয়ে থাকে বলে এখন টিফিনের সময়ে খেলার হুল্লোড় অনেকটা মিইয়ে গেছে। আর সবসময় মেঘলা থাকলে অচ্যুতের কেমন যেন মনখারাপ লাগে।

ফিফথ পিরিয়ডের দশ-পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রাজীব ক্লাসে এসে ঢুকল।

রমেশস্যার তখন ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন, আর ক্লাসের অর্ধেক ছেলে তন্দ্রার টানে ঢুলছিল। ঘন-ঘন হাই উঠছিল সকলের।

কিন্তু রাজীব দাসকে দেখেই সবাই সোজা হয়ে বসল।

রাজীবের রং টকটকে ফরসা। ঘি-মাখন খাওয়া গোলগাল নধর চেহারা। চোখে চশমা। সবসময় ফিটফাট থাকে। কিন্তু এখন ওর চুল উসকোখুসকো, চোখের জল চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে নেমে এসেছে, হেঁচকি তুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রমেশস্যার দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন সাম্রাজ্যের সাতকাহন থামিয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার? তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

প্রশ্নটা করে কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে তিনি রাজীবকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন।

'অমিয়স্যার আমাকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল রাজীব।

'কেন রে? কী করেছিস তুই?'

রাজীব চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অচ্যুতের ভীষণ খারাপ লাগছিল। আহা রে! হেডস্যার মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওকে বেত দিয়ে মেরেছেন। কিন্তু রাজীবই-বা টাকা চুরি করে কেন? ওরা তো বেশ বড়লোক! রেল স্টেশনের কাছে ওদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। মারুতি জেন গাড়ি করে স্কুলে আসে।

মনিটর বাসবকে ডেকে রমেশস্যার ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। রাজীবকে বললেন, 'তুই ডেস্কে গিয়ে বোস।'

রাজীব মাথা নীচু করে ডেস্কের দিকে এগোল।

অচ্যুতের ডেস্কের সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজীব ওকে মিনমিনে গলায় বলল, 'ছুটির পর তোকে অমিয়স্যার দেখা করতে বলেছেন।'

অচ্যুত ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলল।

রমেশস্যার বাসবের কাছে গোটা গল্পটা শুনে তারপর আবার সাতবাহন রাজবংশের কাহিনি শুরু করলেন।

রমেশস্যারের পিরিয়ড শেষ হতেই সবাই রাজীবকে ছেঁকে ধরল। কেউ-কেউ ওকে সান্ত্বনা দিল। আবার কেউ বলল, 'ঠিক হয়েছে—অন্যায় করেছে তাই শাস্তি পেয়েছে।'

কুলদীপ, সৌরভ, বাসবরা খুঁটিয়ে জানতে চাইল অমিয়স্যার ওকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ঠিক কী-কী হয়েছে।

রাজীব থতিয়ে-থতিয়ে বলছিল আর ফুঁপিয়ে উঠছিল। হেডস্যারের দশ ঘা বেতের বাড়ি খেয়ে ও সহ্য করেছে। কিন্তু হেডস্যার বলেছেন, কাল ওর বাবা-মাকে স্কুলে এসে দেখা করতে। এটা ওকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বাপি-মাম্মি এসব ঘটনা জানতে পারলে ওকে হয়তো বাড়ি থেকেই বের করে দেবে। রাজীব তাই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে সিঁটিয়ে গেছে।

কুলদীপদের ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। ওরা রাজীবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া, দেখছি কী করা যায়। তুই চিন্তা করিস না।'

সব শুনে অচ্যুত বলল, 'অমিয়স্যার তো আমাকে ছুটির পর ডেকেছেন। তখন আমি স্যারকে বলব। হেডস্যারকে যেন রিকোয়েস্ট করেন—যাতে গার্জেন কল না হয়।'

অচ্যুতের কথায় রাজীব তেমন ভরসা পেল বলে মনে হল না।

চারটে বেজে দশমিনিটে বানজারা ছুটির ঘণ্টা বাজাল।

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে নানান ক্লাসের ছেলের দল পিলপিল করে বেরিয়ে এল ক্লাসরুমের বাইরে। তারপর স্কুল-বাড়ি ছেড়ে মাঠে নেমে এল 'সাদা জামা কালো প্যান্টের' ভিড়। সেখান থেকে সদরের লোহার গেট। আবার গেট পেরিয়ে রাস্তা।

আকাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে। এখনই বোধহয় আবার বৃষ্টি নামবে।

স্কুলের মাঠের একপাশে সারে-সারে দাঁড় করানো সাইকেল। এক ঝাঁক ছেলে হইহই করে ছুটল সাইকেলের দিকে। নীচু ক্লাসের কয়েকটা ছেলে জল-কাদাভরা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলতে লাগল। মাঠের এখানে-ওখানে জমে থাকা জলের ওপর পা ফেলে দাপিয়ে ছুটে গিয়ে কাদা-জল ছিটকে দিতে লাগল চারপাশে।

সদরের গেটের বাইরে বাবা-মায়েদের ভিড়। তাঁদের চোখ সাদা-কালো পোশাকের ভিড়ে নিজের-নিজের ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্কুল ছুটির সময় এই ভাঙাচোরা সরু রাস্তাটা সাইকেল, সাইকেল রিকশা আর স্কুটারে ছয়লাপ হয়ে যায়। যানজট চলে অন্তত আধঘণ্টা। এখন, বর্ষার সময়, তাই অবস্থা একেবারে বেহাল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও অচ্যুতরা কয়েকজন ক্লাস থেকে বেরোয়নি। অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রাজীবের ব্যাপারে অচ্যুত ঠিক কী কী বলবে তাই নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। রাজীব কুলদীপ-অচ্যুতদের হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়ল : 'তোরা আমাকে যেভাবে হোক সেভ কর।' প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা ক্লাসরুম থেকে বেরোল।

কুলদীপরা সবাই চলে গেল। পিঠে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে অচ্যুত একা রওনা হল টিচার্স রুমের দিকে। যাওয়ার আগে ও কুলদীপকে বলল, 'রাজীবের ব্যাপারে অমিয়স্যারের সঙ্গে কী কথা হল আমি তোকে রাতে ফোন করে জানাব। টা-টা!'

অচ্যুত খেয়াল করেনি কখন যেন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু আগের হুল্লোড় হইচই থেমে গিয়ে এখন সব একেবারে নিঝুম! শুধু বৃষ্টি ঝিরঝির করে পড়ছে। বাইরে কলাগাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার টপটপ শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে সাইকেল রিকশার 'প্যাঁকপ্যাঁক' ডাক শোনা যাচ্ছে। আর কখনও-কখনও মেঘের 'গুড়ুম-গুড়ুম'।

ছুটির পর স্কুল থেকে সবাই চলে যায়। তখন বানজারা স্কুলের সব ঘর ঘুরে-ঘুরে আলো আর পাখা অফ করে, দরজায়-দরজায় তালা দেয়। তারপর স্কুল বিল্ডিং-এর কোলাপসিবল গেটে তালা দিয়ে নিজের ঘরে যায়। ওর ছোট্ট ঘর স্কুল-বাড়ির লাগোয়া, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া। পাশেই একটা টিউবওয়েল। আর তাকে ঘিরে নানান গাছপালা। বর্ষায় সেগুলো সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

টিউবওয়েল থেকে একটু দূরেই একটা ছোট গোয়ালঘর। সেখানে বানজারার পোষা গোরু রামুয়া আর ছোট একটা বাছুর আছে। ওরা বেশির ভাগ সময়েই মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ঘাস-পাতা খায়।

বানজারা বউ নিয়ে থাকে। ওর বউ স্কুলের সুইপারের কাজ করে। সবসময় পান খায়, আর মাথায় ঘোমটা টেনে থাকে।

টিচার্স রুমের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় অচ্যুতের বুটজুতোর খটখট শব্দ করিডরে কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। একতলা থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বানজারা ওর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

টিচার্স রুমের কাছে এসে অচ্যুত অবাক হয়ে গেল। ঘর খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই।

ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। খোলা জানলা দিয়ে ঘোর কালো মেঘ, গাছপালা আর বৃষ্টি চোখে পড়ছে। দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতা হাওয়ায় উড়ছে।

তা হলে কি বৃষ্টি আসার ভয়ে অমিয়স্যার একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছেন?

এমন সময় একটা শব্দ অচ্যুতের কানে এল।

মেঝেতে খুচরো পয়সা পড়ে যাওয়ার শব্দ।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে নজর ধারালো করল অচ্যুত। সামান্য কুঁজো হয়ে টেবিলের নীচ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

খুচরো পয়সা কোথায় পড়ল? কার পকেট থেকে পড়ল?

ঝুঁকে পড়ে নীচু হতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার দেওয়ালের গায়ে টিকটিকির মতো হেঁটে বেড়াচ্ছেন!

মেঝে থেকে অন্তত হাতদুয়েক ওপরে মেঝের সঙ্গে সমান্তরালভাবে স্যারের শরীরটা আঠার মতো আটকে রয়েছে। ঠিক সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

এরকম একটা মজার দৃশ্য দেখে অচ্যুতের হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু ও ভয় পেল। ওর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, বুকের ভেতরে বাতাস আটকে গেল। কারণ, সত্যবানস্যারের মুখে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর উল্লাস। ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুক করছে, চোখে এক অলৌকিক সবুজ আলো।

আর ঠিক তখনই কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। অচ্যুত চমকে উঠল। ওই অবস্থাতেও ও বুঝতে পারল খুচরো পয়সাগুলো স্যারের পকেট থেকেই পড়েছে।

এরকম একটা বিচিত্র ভয়ংকর দৃশ্য অচ্যুতকে পাগল করে দিল। ও হেঁচকি তুলে শ্বাস টানল, বুক ভরে বাতাস নিতে চাইল। তারপরই ছুট লাগাল দোতলার বারান্দা ধরে। ওর বুটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল কোনও পাগলা ঘোড়া মৃত্যুভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

অচ্যুত যদি পিছন ফিরে তাকাত তা হলে দেখতে পেত সত্যবানস্যার ওর হেঁচকির শব্দে দেওয়ালের গা থেকেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন। সবুজ আগুনভরা চোখে ওর ছুটে পালানো দেখছেন।

আর স্যারের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে রহস্যময় হাসি।

।।তিন।।

পরদিন সাইকেল চালিয়ে স্কুলের গেটে পৌঁছে অচ্যুতের মনে হচ্ছিল গতকাল ও যা দেখেছে সবটাই স্বপ্ন—অথবা দুঃস্বপ্ন।

রং-চটা সীমানা-পাঁচিলের গায়ে বসানো জং-ধরা লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলা। অচ্যুত সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। তারপর সাইকেলটা হাঁটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মাঠের এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। মাঝখানের খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাদ দিলে মাঠের বাকি অংশে বড়-বড় ঘাস আর আগাছা। এ ছাড়া পাঁচিলের ধার ঘেঁষে কয়েকটা বট, অশ্বত্থ, কদম, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু গাছ। আর প্রকাণ্ড জামগাছটা আছে বানজারাদের ঘরের কাছাকাছি। গরমকালে পাকা জাম পড়ে-পড়ে গাছের নীচটা বেগুনি হয়ে থাকে। গাছটার নীচে বসার জন্য কয়েকটা সিমেন্টের বেদি আছে।

বৃষ্টি না হলে এই মাঠেই স্কুলের প্রেয়ার হয়। আর বৃষ্টি হলে যার-যার ক্লাসরুমে।

মাঠের বাঁদিকে একটা দোলনা আর স্লিপ—নীচু ক্লাসের ছেলেদের খেলার জন্য। আর তার পিছনেই সাইকেল রাখার জায়গা।

সাইকেল রেখে অচ্যুত স্কুল-বাড়ির দিকে এগোল।

বড় মাপের ছড়ানো দোতলা বাড়ি। তার পলেস্তারা-খসা রং-চটা চেহারার দিকে খুব খুঁটিয়ে নজর করলে বোঝা যায় একসময়ে বাড়িটার রং গোলাপি ছিল।

স্কুল-বাড়ির একতলার দেওয়ালে তেল রঙে বড়-বড় করে আঁকা মনীষীদের রঙিন ছবি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, রামমোহন, সবাই সেখানে হাজির। বৃষ্টির জলে ধোয়া ছবিগুলো ঝকঝক করছে।

ওঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা অচ্যুত কিছুতেই সত্যি বলে মেনে নিতে পারছিল না।

গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই আকাশের দিকে তাকাল অচ্যুত। আবার শুরু হল। এবার পুজোয় বৃষ্টির পিছু ছাড়াতে পারলে হয়। ও একতলার বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল।

বানজারার ঘণ্টার পর ক্লাস শুরু হল বটে তবে অচ্যুত ভীষণ আনমনা হয়ে রইল। গতকালের ঘটনাটা ওর বুকের ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

প্রথম পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়তেই ও চমকে উঠল। কারণ, সেকেন্ড পিরিয়ডটা অঙ্কের—সত্যবানস্যারের ক্লাস।

অচ্যুত কুলদীপের দিকে তাকাল। কুলদীপ দুটো সারি পিছনে বসে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কুলদীপ ইশারা করল। যার অর্থ, এক্ষুনি স্যাটাস্যাট আসছেন।

এখনও পর্যন্ত অচ্যুত শুধু কুলদীপকেই ঘটনাটা বলেছে। আর কাউকে নয়। এমনকী বাপি-মা-কেও নয়।
সত্যবানস্যার ক্লাসে এসে ঢুকলেন।
টকটকে ফরসা রং। পিছনদিকে টেনে আঁচড়ানো তেলচকচকে চুল। চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। গাল সামান্য ভাঙা—চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। লম্বাটে নাকের নীচে সরু গোঁফ। গালে দাড়ির নীলচে আভা।
সত্যবানস্যারের পরনে সাদা হাফশার্ট আর গাঢ় বাদামি প্যান্ট। চেহারা বেশ রোগা হওয়ায় প্যান্টটা ঢলঢল করছে। গতকাল স্যার এই পোশাকই পরেছিলেন।
অচ্যুত খুব খুঁটিয়ে স্যারকে দেখছিল। অঙ্ক করতে-করতে মাঝে-মাঝেই কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছেন আর জিভ বের করে ঠোঁটজোড়া চেটে নিচ্ছেন। তেষ্টা পেলে মানুষ যেমন করে।
কিন্তু এরপরই এক অবাক কাণ্ড হল।
বীজগণিতের অনুপাত আর সমানুপাতের কুড়ি প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো বোর্ডে স্যার বোঝাচ্ছিলেন। সেই অঙ্ক হঠাৎই আটকে গেল!
অচ্যুত যতদূর জানে সত্যবানস্যারের অঙ্ক কখনও আটকায়নি। কিন্তু আজ এ কী কাণ্ড!
সত্যবানস্যার বোর্ডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। আঙুলে ধরা চকটা শূন্যে ঘুরিয়ে মনে-মনে যেন অঙ্কটা কষে ফেলতে চাইলেন।
অচ্যুতের মনে পড়ে গেল গতকালের কথা। টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে সত্যবানসার একজন অচেনা মানুষের মতো ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর স্কুল ছুটির পর টিচার্স রুমের দেওয়ালে ওই কাণ্ড! আর এখন, বরাবর যিনি স্যাটাস্যাট অঙ্ক করেন, তাঁর অঙ্ক গেছে আটকে!
স্যারের কি তা হলে কিছু হয়েছে?
সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর চেয়ারে বসে পড়লেন। অঙ্ক কষা নিয়ে এলোমেলো ধানাইপানাই করে চললেন। তারপর, ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার সময়, কুলদীপকে বললেন, ‘কুলদীপ, তোরা কাল সন্ধেবেলা তো কোচিং-এ আসছিস, তখন ভালো করে এটা বুঝিয়ে দেব।’
অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, রাজীব আর সৌরভ সত্যবানস্যারের কোচিং-এ একই ব্যাচে পড়ে। স্যারের বাড়ি নৈহাটি। তবে প্রতিদিন স্কুলের পর কোচিং সেরে রাতের ট্রেন ধরেন। তবে কখনও-কখনও রাত হয়ে গেলে কোচিং-এর ঘরটাতেই থেকে যান।
পরের দুটো পিরিয়ড অচ্যুতের আর কাটতে চাইছিল না। ও ভাবছিল, কতক্ষণে টিফিন হবে আর ও কুলদীপকে নিয়ে আলোচনায় বসবে।
গতকাল বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মন বসাতে পারেনি অচ্যুত। সত্যবানস্যারের দেওয়ালে হাঁটার দৃশ্যটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। একটা লতানে গাছ যেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে সড়সড় করে বেড়ে চলেছে।
লেখাপড়ার চেষ্টা ছেড়ে টিভিতে ই. এস. পি. এন. আর স্টার স্পোর্টস চ্যানেল দেখতে বসে গিয়েছিল, কিন্তু স্যার টিভির পরদাতেও হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।
মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে ওকে দেখছিল। অনেকক্ষণ দেখার পর কাছে এসে জিগ্যেস করল, ‘তোর কী হয়েছে রে?’
‘কিচ্ছু না।’ অচ্যুত মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে টিভির পরদার দিকে চেয়ে রইল।
‘তখন থেকে দেখছি কেমন উসখুস করছিস?’
কোনও জবাব দিল না অচ্যুত।
‘স্কুলে ঝগড়া-মারপিট করেছিস?’

'না।' মাথা নাড়ল অচ্যুত। টিভির দিক থেকে চোখ সরাল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলের মনের ভেতরটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে গেল রান্না-ঘরের দিকে। ভাবল অচ্যুতের বাবা এলে ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলবে। ছেলে বড় হচ্ছে। স্কুলে কী সমস্যা বাধিয়ে এসেছে কে জানে!

অচ্যুতের বাবা এখন বাড়িতে নেই। অফিস থেকে ফিরে বটতলার মিষ্টির দোকানের কাছে তাসের আড্ডায় মেতে আছে। ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা।

অচ্যুত যখন টিভি, রেডিয়ো, ওয়াকম্যান, বারান্দা, এ-ঘর, ও-ঘর করে ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে, ঠিক তখনই কুলদীপের ফোন এল।

অচ্যুত ফোন করেনি দেখে কুলদীপই ওকে ফোন করেছে।

নীচুগলায় ওর সঙ্গে কথা বলল অচ্যুত।

বলল, অমিয়স্যারের দেখা পায়নি। আর সত্যবানস্যারকে ওইরকম করতে দেখেছে।

কুলদীপ ও-প্রান্তে শিস দিয়ে উঠল, বলল, 'কীসব যা-তা বলছিস!'

অচ্যুত বলল, 'মা-কালীর দিব্যি—।'

কুলদীপ আবার চাপা শিস দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠলে ও শিস দেয়। আর মেজাজ ভালো থাকলে শিস দিয়ে গান শোনায়।

অচ্যুত এলোমেলোভাবে ওকে সব খুলে বলল। জট পাকানো হলেও গোটা গল্পটা বুঝতে কুলদীপের অসুবিধে হল না। সব শোনার পর ও বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'স্যাটস্যাট আগের জন্মে বোধহয় টিকটিকি ছিল...'

কুলদীপের রসিকতায় অচ্যুতের হাসি পেল না। ওর মনে পড়ল, টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওর হাত-পা ঠকঠক করে কেঁপেছিল।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই অচ্যুতের চমক ভাঙল।

ক্লাসের অন্যান্য ছেলে বই-খাতা ডেস্কে ঢুকিয়ে হুড়মুড় করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। করিডরে ওদের হুটোপাটি ছুটোছুটিতে হুল্লোড় বেধে গেল। কার টিফিন বক্স ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঠং করে আওয়াজ হল। লুচি আর আলুভাজা ছড়িয়ে পড়ল। বুট পরা ছুটন্ত পা-গুলো নিমেষে সেগুলো মাড়িয়ে চলে গেল। কারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কতক্ষণে নীচের মাঠে গিয়ে পৌঁছবে সেই চিন্তায় সব মশগুল।

কুলদীপ আর অচ্যুত বেরোল সকলের শেষে। ওদের হাতে টিফিন বক্স।

সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে রাজীব দাসের সঙ্গে ওদের দেখা হল। মুখ কালো করে এক পা এক পা করে নামছে।

গতকাল অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় হেডস্যারকে ম্যানেজ করার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে। অচ্যুত রাজীবকে সেটা বলতেই ও কাচুমাচু মুখ করে বলল, 'আমি স্কুলে এসেই হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করেছি। বলেছি, আজ মাম্মি আর বাপি কলকাতায় গেছে, কাল এসে দেখা করবে। বিপদে পড়ে মিছে কথা বলতে হল। তোরা আমাকে সেভ কর। তোরা আজ অমিয়স্যারকে একটু বল—প্লিজ! আচ্ছা, মানুষের কি ভুল হয় না?'

রাজীবের চোখে জল এসে গেল।

কুলদীপ বলল, 'অ্যাই, বাংলা সিনেমার লাস্ট সিনের মতো কাঁদবি না। আজ তোর ব্যাপারটা ফয়সালা করে দেব। এখন টিফিন খেয়ে বল খেল গিয়ে।'

অচ্যুত আর কুলদীপ জামগাছতলার সিমেন্ট বাঁধানো বেদির ওপরে গিয়ে বসল। প্রতীক ওদের কাছে বসতে এসেছিল, কিন্তু কুলদীপ ওকে বলল, 'কিছু মনে করিস না—অচ্যুতের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট টক আছে।'

প্রতীক সন্দেহের চোখে কুলদীপকে দেখল। আজকাল ওকে মাঝে-মাঝেই ‘কমলাবালা গার্লস হাইস্কুল’-এর গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। সে-ব্যাপারে প্রাইভেট কথা কি না কে জানে!

কিছু না বলে প্রতীক ভুরু উঁচিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

মিহি বরফের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছে। বাদলা হাওয়ায় সেই গুঁড়ো মুখে উড়ে এসে আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘের চাপা গুড়গুড় শোনা যাচ্ছে কখনও-কখনও। একটু দূরে, স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে, বানজারার গোরু রামুয়া আর তার বাছুর আপনমনে ঘাস খাচ্ছে।

দুজনের টিফিন মিলিয়ে-মিশিয়ে খেতে-খেতে কুলদীপ বলল, ‘স্ট্রেটকাট বল তো, স্যাটাস্যাটের এগেইনস্টে কী অ্যাকশন নিতে চাস?’

অচ্যুত কুলদীপের চোখে তাকাল : ‘অ্যাকশন নেব কী, ব্যাপারটা ঠিক কী, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।’

‘স্যাটাস্যাটকে একটু ওয়াচ রাখতে হবে।’

‘যদি আমাকে ধরে কিছু বলে?’ অচ্যুতের বুকের ভেতরে কেমন যেন শব্দ হচ্ছিল।

‘ধুস, কী আর বলবে! বলবে যে, আমি দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতো হাঁটছিলাম! তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না।...তা ছাড়া তোকে তো আর একা পাচ্ছে না যে বলবে!’

অচ্যুতের মুখ দেখে মনে হল না খুব ও একটা ভরসা পেয়েছে। ও চুপচাপ বসে বর্ষাভেজা প্রকৃতি দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কুলদীপ তাড়া লাগাল, ‘চল, অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করে তারপর ক্লাসে যাব। রাজীবের ব্যাপারটা আগে বলা দরকার। নইলে ওর প্রবলেম হয়ে যাবে।’

বেদি ছেড়ে ওঠার সময় অচ্যুত বলল, ‘সত্যবানস্যারের কেসটা কিন্তু কাউকে বলিস না।’

কুলদীপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মনিটর বাসব আর প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে অচ্যুত আর কুলদীপ টিচার্স রুমে গেল। অমিয়স্যারকে অনেক করে বলে-কয়ে ওরা রাজীবের গার্জেনকল ঠেকাল। অমিয়স্যার অচ্যুতকে বললেন, ‘অ্যাই, তোর বাংলা খাতাটা আমার দেখা হয়ে গেছে। এত বানান ভুল করিস কেন রে? অভিধান অবলোকন করবি। ছুটির পর এসে খাতাটা নিয়ে যাস। কাল বর্ষণের জন্যে আমি একটু আথিবিথি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।’

আবার সেই ‘ছুটির পর’! তার ওপর আবার ‘আথিবিথি’! অমিয়স্যারের সঙ্গে পরিচয় না হলে অচ্যুত কোনওদিন জানতেই পারত না ওর মাতৃভাষায় এত মারপ্যাঁচ আছে।

অচ্যুতের চোখ অনেকক্ষণ ধরেই চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্যারদের বসার বিশাল টেবিলের শেষ প্রান্তে সত্যবানস্যার বসে আছেন। কী একটা বইয়ের পাতায় ডুবে আছেন। চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কোনও হুঁশ নেই।

অচ্যুত অমিয়স্যারের কথার ওপরে কথা বলতে পারল না। শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ল। ছুটির পরই ও স্যারের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

টিফিন শেষের ঘণ্টা একটু আগেই বেজেছে। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ক্লাসে ফিরে চলল।

অচ্যুতের মনে অশান্তির ঝড় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও কি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে একা যাবে, নাকি কুলদীপ, বাসব, কিংবা সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে অমিয়স্যার বিরক্ত হতে পারেন। তা ছাড়া টিচার্স রুমে সত্যবানস্যার তো ওকে আর একা পাচ্ছেন না!

সুতরাং ছুটির ঘণ্টা পড়তে-না-পড়তেই অচ্যুত পা চালাল টিচার্স রুমের দিকে। দেরি করে গেলে টিচার্স রুম ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। সেই ঝুঁকি অচ্যুত নিতে চায় না।

টিচার্স রুমে গিয়ে দেখল অমিয়স্যার ছাড়া আরও অনেক স্যারই তখন সেখানে রয়েছেন। যদিও সত্যবানস্যারকে অচ্যুত দেখতে পেল না।

অনুমতি নিয়ে অমিয়স্যারের কাছে গেল অচ্যুত। স্যারের কাছ থেকে খাতা নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে করিডর ধরে হাঁটা দিল।

সিঁড়ি নামার সময় ওর কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

মুখ তুলে তাকাল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার। মুখে এক চিলতে হাসি। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটছেন।

আশেপাশে আরও কয়েকজন ছেলে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতেই মশগুল।

সত্যবানস্যার ওর সঙ্গে-সঙ্গে নামতে লাগলেন, আর চাপা গলায় কথা বলতে লাগলেন।

'জানিস তো, মানুষ অনেক সময় ভুল দ্যাখে! যেমন, তুই কাল বিকেলে যা দেখেছিস ভুল দেখেছিস। কারণ, তুই যা দেখেছিস সেটা প্রমাণ করতে পারবি না। আর প্রমাণ দিতে না পারলে কেউ তোর কথা বিশ্বাসও করবে না।' স্যার হিসহিস শব্দ করে হাসলেন : 'এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়।'

গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁধের ওপরে স্যারের আঙুলের চাপে ব্যথা লাগছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। অচ্যুতের মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

একতলায় নেমে সত্যবানস্যার বাঁদিকে কয়েক পা হেঁটে গেলেন। ক্লাস ফাইভের বি সেকশানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অচ্যুত কাঠের পুতুলের মতো স্যারের পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্যার থমকে দাঁড়াতেই ও-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

এদিকের বারান্দাটা এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং ওদের কথা শুনতে পাবে কাছাকাছি এমন কেউ নেই।

ক্লাসরুমের দরজার কাছটায় অচ্যুতকে একরকম ঠেলেই নিয়ে গেলেন সত্যবানস্যার। চাপা গলায় বললেন, 'শোন, কাউকে কোনও কথা বলবি না। অবশ্য বললেও কেউ আমল দেবে না। ওরে, মানুষের কি ভুল দেখার কোনও শেষ আছে! এই দ্যাখ—!' বলেই স্যার অচ্যুতের চোখে তাকালেন।

অচ্যুত দেখল, সেখানে ধকধক করছে দুটো সবুজ টুনি বালব। আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি হল চোখের মণি।

'এটাও তুই ভুল দেখছিস।' মিহি সুরেলা গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'কারণ, তুই এটা প্রমাণ করতে পারবি না। সুতরাং তোর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যবানস্যার। তার হিমেল ঝাপটা অচ্যুতের মুখ ছুঁয়ে গেল। অচ্যুতের গায়ে কাঁটা দিল।

ও লক্ষ করল, স্যারের চোখের সবুজ রং ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে সাদাটে হয়ে গেল। তারপর সামান্য ছাই-রং হয়ে কটা চোখের চেহারা নিল। তারপর কালচে হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'তুই কাউকে কিচ্ছু বলবি না! কারণ, তুই আসলে কিছুই দেখিসনি। কাল সন্ধেবেলা কোচিং-এ আসবি, কামাই করবি না। ভাবিস না, তুই পালিয়ে বাঁচবি। আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

অচ্যুত ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কাঁধের ওপর স্যারের বাঁকানো আঙুলের চাপ যেন ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছিল।

'এখন যা।' সত্যবানস্যার ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওকে আলতো করে ঠেলে দিলেন : 'তুই কিন্তু কিছুই দেখিসনি—।'

অচ্যুত আর-একটু হলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ও মাঠে নামার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল। ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতে পারল না।

জল-কাদা পেরিয়ে যখন ও সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছল তখন প্রতীক ওকে পিছন থেকে ডাকল।

অচ্যুত ফিরে তাকাতেই প্রতীক জিগ্যেস করল, 'তোকে স্যাটাস্যাট ওরকম হাসতে-হাসতে কী বলছিল রে?'

'কিছু না। কাল কোচিং-এর খাতা-বই ঠিকমতো নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল।' অচ্যুতের গলা সামান্য কেঁপে গেল।

'তোকে স্যার হেভি ফেভার করে।' বেজার মুখে বলল প্রতীক, 'অবশ্য ফেভার তো করবেই! তুই অঙ্কে একশোয় একশো পাস, আর আমার নম্বরটা চার কি পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তবে একশো হয়। তবে অঙ্ককে আমি মোটেই ভয় পাই না। পারি-না-পারি, লড়ে যাই।'

অচ্যুত হাসতে পারল না।

কারণ, সত্যবানস্যারের একটা কথা বারবার ওর মনে কাঁটার মতো বিঁধছিল।

বাড়ি ফিরেও ওর খচখচানিটা গেল না।

স্যার বলেছেন, '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

এর মানে কী?

।।চার।।

অচ্যুত রাতে কুলদীপ আর সৌরভকে ফোন করল। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলল, কোচিং নিয়ে কথা বলল, কিন্তু সত্যবানস্যারের কথা বলল না। বরং কুলদীপ উৎসাহ নিয়ে সত্যবানস্যারের রহস্য ভেদ করার ব্যাপারে নানান উদ্ভট পরামর্শ দিল। বলল, 'স্যারকে ফলো করতে হবে, বুঝলি! সবসময় নজরে-নজরে রাখতে হবে। তা হলেই কেসটা বোঝা যাবে।'

অচ্যুত তখন ভাবছিল, কুলদীপ তো আর স্যারের সবুজ চোখ দ্যাখেনি! দেখলে বোঝা যেত ওর এখনকার এত সাহস কতটা চুপসে যায়।

রাতে বিছানায় শুয়ে অচ্যুত একরকম জেগেই রইল। ওর ভেতর থেকে ভয়টা কিছুতেই যেতে চাইছিল না। পরদিন স্কুলে যাওয়া নিয়ে সামান্য ভয় করলেও সেটা মা-বাপিকে বুঝতে দিল না। মনে-মনে ঠিক করল, স্কুলে কখনও ও আর একা থাকবে না। যেখানেই যাক, দু-একজন বন্ধুকে সঙ্গে নেবে। এমনকী টয়লেটে গেলেও।

স্কুলের সময়টা শান্তিমতোই কেটে গেল। তবে একবার সত্যবান-স্যার করিডরে অচ্যুতের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন—কিন্তু ওকে চিনতে পারেননি।

অচ্যুতের সঙ্গে প্রতীক ছিল। পরশুদিন সত্যবানস্যারের এরকম অদ্ভুত আচরণ ও নিজের চোখে দেখেছে। স্যার চলে যাওয়ার পর ও চাপা গলায় বলল, 'যা-ই বল, স্যাটাস্যাট কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে!'

অচ্যুত চুপ করে রইল। এই দেড় দিনে চুপ করে থাকাটা ওর দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে।

স্কুল ছুটির পর একটা বিচিত্র দৃশ্য অচ্যুতের চোখে পড়ল। ওরা যখন বেরোচ্ছে তখন দেখল সত্যবানস্যার মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বানজারার গোরু আর বাছুরকে আদর করছেন। ওদের গলার কাছে কুঁচি দেওয়া যে নরম চামড়া থাকে—যাকে গলকম্বল বলে—সেখানে হাত বোলাচ্ছেন। আর অবোলা জীব দুটো চুপটি করে দাঁড়িয়ে স্যারের আদর খাচ্ছে।

গোরু-বাছুরকে আদর করা নিশ্চয়ই খারাপ নয়। কিন্তু সত্যবানস্যারকে আগে কখনও কেউ এরকম আদর করতে দ্যাখেনি।

সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নানান দুশ্চিন্তা অচ্যুতের মাথার ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ঘণ্টাদুয়েক পর যখন ও সত্যবানস্যারের কোচিং-এ রওনা হল তখনও চিন্তাগুলো ওর মাথা থেকে যায়নি।

আকাশ ঘোলাটে মেঘলা। ভেজা মেঘের আড়ালে আবছাভাবে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বেহিসেবি বাদলা হাওয়া কখনও-কখনও গাছগাছালির পাতা দুলিয়ে দিচ্ছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় এখানে-ওখানে জল-কাদার নকশা। দোকানপাটে খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই।

পথচলতি সাইকেল রিকশা আর স্কুটারকে পাশ কাটিয়ে সাবধানে সাইকেল চালাচ্ছিল অচ্যুত। সত্যবানস্যারের কোচিং-এ স্কুলের পাশ দিয়েই যেতে হয়। যাওয়ার সময় দেখল, অন্ধকারে ভূতের মতো দোতলা স্কুল-বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বানজারার ঘরে আলো জ্বলছে।

কোচিং-এ পৌঁছে প্রথম-প্রথম একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোচিং-এর সময়টা বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাটল। গত সপ্তাহের মতো তুখোড় পেশাদার ঢঙেই পড়ালেন সত্যবানস্যার। অচ্যুতের অঙ্ক কষার কেরামতিকে তারিফ করলেন, ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। প্রতিটা অঙ্ক বেশ সহজ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখে দিলেন। সব মিলিয়ে কোথাও কোনও ছন্দপতন নেই।

তবে একটা ব্যাপারে সামান্য খটকা লাগল অচ্যুতের।

রাজীবের অঙ্কের অবস্থা প্রতীকের মতোই। তার ওপর রাজীবের আবার অঙ্ক নিয়ে আতঙ্ক আছে। অঙ্ক কষতে গিয়ে ও ঘন-ঘন আটকে যাচ্ছিল। সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ করছিলেন। তারপর ওর কাছে গিয়ে আলতো করে ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগলেন : 'চেষ্টা কর, ঠিক পারবি। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়—।'

রাজীবকে আজ যেন স্যার বড্ড বেশি যত্ন নিয়ে অঙ্ক দেখাচ্ছেন। আগে কখনও এই যত্ন অচ্যুতের চোখে পড়েনি। তার ওপর ঘাড়ে যেরকম মোলায়েম করে হাত বোলাচ্ছেন তাতে বানজারার গোরু-বাছুরকে আদর করার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

অচ্যুত মনে-মনে নিজেকে ধমক দিল। আজকাল ওর কী হয়েছে! সবকিছুতেই শুধু খটকা লাগছে! একজন স্যার কি হঠাৎই স্নেহপ্রবণ হতে পারেন না?

কিন্তু ধমক খেয়েও অচ্যুতের মন মানতে পারছিল না। বরং ভাবছিল, হঠাৎ করে কেউ যদি দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তার আচমকা স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে বাধা কী!

কোচিং শেষ করে ফেরার সময় রাজীব বলল, 'অচ্যুত, আমি তোর সঙ্গে যাব। আমাকে পরেশদার কেকের দোকানে নামিয়ে দিবি।'

রাজীবের সাইকেল নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হবে এই ভয়ে বাবা-মা কিনে দেননি।

কুলদীপ কোচিং ক্লাস চলার সময় অনেকবার অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে ইশারা করেছে। ঠোঁট উলটে মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ, সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ছে না।

অচ্যুত কোনও উত্তর দেয়নি।

কোচিং-এর বাইরে বেরিয়ে অচ্যুতের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কুলদীপ বলল, 'ধৈর্য চাই, ধৈর্য। সহজে এ-রহস্যের জট খুলবে না।'

অচ্যুত 'হুঁ—' বলে সায় দিল।

ওর সাইকেলে সামনের রডে বসার সময় রাজীব জিগ্যেস করল, 'আমাকে ক্যারি করতে পারবি তো? এই জল-কাদায় যদি ফেলে দিস তা হলে জামা-প্যান্টের বারোটা বেজে যাবে। তারপর মাম্মির হাজারটা কোশ্চেন—।'

'তোর কোনও ভয় নেই। আমি তিনমাস ধরে ডাবল ক্যারি করছি।'

ওকে বসিয়ে নিয়ে অচ্যুত সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল।

এখন বৃষ্টি নেই। তবে কখন শুরু হবে কেউ বলতে পারে না। কাগজে লিখেছে কোথায় যেন নিম্নচাপ হয়েছে—তার জন্যই নাকি এরকম বাজে অবস্থা।

একটু পরেই ওরা স্কুলের কাছাকাছি চলে এল।

স্কুলের একরকম পাশেই এক প্রকাণ্ড পুকুর। তার ঢালু পাড়ে বড়-বড় মানকচু গাছ আর আগাছার ঝোপ। নাম-না-জানা লতানে গাছের দল আধো-অন্ধকারে সাপের মতো জড়াজড়ি করে রয়েছে।

পুকুরপাড়ের বেড়ে ওঠা আগাছার রমরমাকে রুখে দিয়েছে ছোট-ছোট চার-পাঁচটা দোকান। দরমা, বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘেরা চা-সিগারেট-পান-বিড়ির দোকান। সেখানে হ্যারিকেন বা কুপির আলো জ্বলছে।

দোকানগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে অন্ধকার আর কচু পাতার কালো ছায়া। সেখান থেকে নানান সুরে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক।

পুকুর পেরিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গোরুর 'হাম্বা' ডাক অচ্যুতের কানে এল।

অচ্যুত বলল, 'স্যাটাস্যাট আজ তোকে ব্যাপক আদর করছিল।'

'হ্যাঁ রে, আমিও তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। অন্যদিন কীরকম বকুনি দেয়! বলে, বাপিকে রিপোর্ট করবে...।'

'এবার তুই অ্যানুয়ালে অঙ্কে এইট্টি পারসেন্ট পাবি।'

'ভ্যাট!'

'দেখিস...।'

পরেশদার কেকের দোকান এসে গিয়েছিল। অচ্যুত দোকানের কাছ ঘেঁষে সাইকেল থামাল। কাঁচা ড্রেনের ওপরে পাতা সিমেন্টের স্ল্যাবে ওর সামনের চাকা ঠেকে গিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি লাগল।

রাজীব সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল : 'কাল টিফিনের জন্যে কেক আর প্যাটিস কিনব।'

অচ্যুত টিফিনে মায়ের হাতে তৈরি লুচি কিংবা পরোটা নিয়ে যায়—সঙ্গে আলুর তরকারি বা আলুভাজা। মাসে দু-একদিন কেক বা প্যাটিস। আর দু-তিন টাকা পকেটে থাকলে টিফিনের সময় স্কুলের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো বিভিন্ন 'ওলাদের' কাছ থেকে ঝালমুড়ি, ঘুগনি বা বাদাম খায়।

রাজীব হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'একটা সিগারেট টেস্ট করে দেখবি নাকি?'

'না না—আমার ওসব ভালো লাগে না।'

'সেদিন কুলদীপ দু-চার টান দিয়েছিল। মন্দ নয়। জানিস তো, ও মাঝে-মাঝে স্মোক করে!'

'জানি!'

রাজীব আবদারের গলায় বলল, 'যাই বল, আজ এরকম বৃষ্টি-বাদলার দিন...একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। অচেনা দোকান থেকে কিনব। তারপর দুটো টফি খেয়ে বাড়ি যাব—কেউ গন্ধ পাবে না। তুই খাবি না—শিয়োর?'

অচ্যুত হেসে বলল, 'না।'

তারপর রাজীবকে টা-টা করে চলে গেল।

রাজীব পরেশদার দোকানে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকল।

ঘুরে তাকাল রাজীব।

সত্যবানস্যার। সাইকেল পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজীবের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছেন।

রাজীব স্যারের কাছে এগিয়ে গেল, 'কিছু বলবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। কী কিনবি কিনে নে, তারপর চল, যেতে-যেতে বলছি। তোর বাড়ি তো স্টেশনের দিকে। চল, তোকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

'সিগারেট খাওয়াটা ভোগে গেল', মনে-মনে ভাবল রাজীব। স্যার যে পিছন-পিছন আসবেন তা ও কেমন করে জানবে! এরকম আগে কখনও হয়নি।

কিন্তু রাজীব অবাক ভাবটা চেপে রাখল। ছোট্ট করে বলল, 'একমিনিট ওয়েট করুন, স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

তারপর ছুট্টে ঢুকে পড়ল পরেশদার দোকানে।

পরদিন স্কুলে ঢুকে অচ্যুত দেখল বানজারার ঘরের সামনে অনেক ছাত্রের ভিড়। দু-একজন গার্জেন আর স্যারও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

সাইকেল জায়গামতো রেখে মাঠের কোণের দিকটায় ছুটে গেল অচ্যুত। ভিড় ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

দৃশ্যটা দেখার আগেই বানজারার বউয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছিল অচ্যুত। কাঁদছিল আর দেশোয়ালি ভাষায় বিলাপ করছিল। ওর কথার একটি বর্ণও অচ্যুত বুঝতে পারছিল না। শুধু 'রামুয়া' শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল আর এটুকু বুঝতে পারছিল, ভালোবাসার কেউ মারা গেলে মানুষ এরকম বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বৃত্তের ভেতরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখতে পেল অচ্যুত।

রামুয়া আর ওর বাছুর মাটিতে পাশাপাশি পড়ে আছে। ওদের চোখ বোজা। বানজারার বউ ওদের ওপর শরীর এলিয়ে কাঁদছে।

বানজারা একপাশে বেজার মুখে উবু হয়ে বসে ছিল। চোখ ছলছল। মাথাটা ডানহাতে ভর দিয়ে হেলানো।

অচ্যুত অবাক হয়ে দেখল, রামুয়ার ধপধপে সাদা গলায় রক্তের দাগ। খানিকটা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর বাছুরের দশাও তাই। ঠিক মনে হচ্ছে, কোনও হিংস্র জন্তু ওদের নরম গলায় কামড় দিয়েছে।

কিন্তু এই সামান্য ক্ষত থেকে কি এতবড় মাপের একটা গোরু মরে যেতে পারে?

তা ছাড়া কোন জানোয়ারই-বা গোরুর গলায় এভাবে কামড়ায়? সাপ, নাকি কুকুর?

বানজারা এবং আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কথাবার্তার টুকরো জুড়ে গোটা গল্পটা মোটামুটি আঁচ করতে পারল অচ্যুত।

আজ ভোর-রাতের দিকে গোয়ালঘর থেকে একটা ঝটাপটির শব্দ বানজারা শুনতে পায়। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে সব আবার চুপচাপ হয়ে গেছে। তখন বানজারা আর ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। অনেক সময় রামুয়া আচমকা খেপে উঠে পা ছোড়াছুড়ি করে। ব্যাপারটা সেইরকম কিছু একটা ভেবে বানজারা আবার শুয়ে পড়ে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা বউকেও আর ডাকেনি।

সকালবেলা ঘর থেকে বেরিয়েই বানজারার বউ চিৎকার করে ওঠে। সেই চিংকার শুনে বানজারা ছুটে যায়। দ্যাখে রামুয়া গোয়ালঘরের বাইরে জলকাদার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে—তখনও দেহ একেবারে অসাড় হয়ে যায়নি। আর ওর বকনা বাছুরটা গোয়ালঘরের ভেতরে চোখ কপালে তুলে শেষ।

বানজারা আর ওর বউ মিলে বাছুরটার দেহ গোয়ালঘরের গুমোট অন্ধকার থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে আসে। তারপর ঘটির পর ঘটি জল ঢেলে মা-মেয়েকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সবই বেকার। দুজনেরই দেহান্ত হয়ে যায়।

অচ্যুতের দৃশ্যটা ভালো লাগছিল না। ও ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে কুলদীপ ওর কাঁধে হাত দিল।

অচ্যুত চমকে উঠল। কুলদীপ কখন এসেছে ও টের পায়নি।

কুলদীপ হাতঘড়ি দেখে বলল, 'চল, ক্লাস বসে যাবে। আজ তো আর ঘণ্টা পড়বে না।'

'ওই গোরু আর বাছুরটার কী করে এমন দশা হল বল তো!'

'কী জানি!' ঠোঁট ওলটাল কুলদীপ : 'শোন, আজ সকালে মউলি ফোন করেছিল। ও আজ হিস্ট্রি কোচিং-এ যাবে না। তোর নোটটা নেক্সট উইকে ফেরত দেবে।'

অচ্যুতরা কয়েকজন সুপারমার্কেটের কাছে ইতিহাস পড়তে যায়। ওখানে নগেনস্যারের কোচিং আছে। নগেনস্যার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের টিচার ছিলেন—প্রায় বছরদশেক হল রিটায়ার করেছেন। নগেনস্যার যখন ইতিহাস পড়ান তখন অচ্যুতদের মনে হয় ওরা যেন সিনেমা দেখছে। ওদের চোখের সামনে চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, মেগাস্থিনিস চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

মউলি কমলাবালা গার্লস হাইস্কুলে পড়ে। অচ্যুতদের পাশের বাড়িতেই থাকে, অথচ সবসময় কুলদীপকে ফোন করে অচ্যুতকে খবর দেয়।

মউলি খুব ছটফটে, শাড়ি পরতে ভালোবাসে না, বেণী দুলিয়ে হাঁটে। একদিন বিকেলে ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল অচ্যুত। খেয়াল করেনি যে, ওদের ছাদে দাঁড়িয়ে মউলি ওর ঘুড়ি ওড়ানোর হাস্যকর চেষ্টা দেখছে।

'যারা সবসময় লেখাপড়া করে তারা ঘুড়ি ওড়াতে গেলে এরকমই হয়—।'

ঘুড়ি ওড়ানো থামিয়ে ফিরে তাকাল অচ্যুত। ওর ময়ূরপঙ্খী ঘুড়িটা গোঁত খেয়ে সামনের বাড়ির শিউলি গাছে আটকে গেল।

তাই দেখে মউলি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

অচ্যুত বলল, 'আমি মোটেই সবসময় লেখাপড়া করি না—তা হলে এখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছি কী করে।'

ঠোঁট বেঁকাল মউলি : 'আজকের ব্যাপারটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি দিনরাত লেখাপড়া করো বলেই তো আমার পড়ায় মন বসে না—।'

ধুত, যত্তসব উলটোপালটা কথা। ওর অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল অচ্যুত। বলল, 'এরকম আবার হয় নাকি!'

'হয়। দেখবে, আজ আমার কী দারুণ পড়ায় মন বসবে। মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...তা হলে সব কাজে আমার মন বসবে।'

অচ্যুত কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। ও ছাদের পাঁচিলের কাছে এসে সাত-আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মউলিকে দেখছিল। মউলির মাথার পিছনে সূর্য অস্ত যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল।

মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...। তার মানে?

মউলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'সকালে আর বিকেলে ছাদে এসে একটু ফ্রেশ বাতাস তো নিতে পারো। তা হলে দেখবে, ভালো হবে।'

'কার?'

'দুজনেরই।'

মউলির মুখে সূর্যের তেরছা আলো পিছলে গেল। ও চটপট ঘুরে দাঁড়িয়ে একরকম ছুটেই চলে গেল।

সেদিন অচ্যুত ছাদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছিল। ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে মউলির এলোমেলো কথার মানে বোঝার চেষ্টা করেছিল।

তারপর থেকে অচ্যুত লক্ষ করেছে, মউলির কাজের কিছু বলার থাকলে ও কুলদীপের মারফত বলে পাঠায়। ইতিহাস কোচিং-এ যখন পড়তে যায় তখনও ও অচ্যুতের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। বরং ছাদে যখন দেখা হয় তখন অনেক সহজভাবে অনেক উলটোপালটা অকাজের কথা বলে। বলে, 'তুমি ভিতু, তোমার মাথায় বুদ্ধি নেই। কী করে অঙ্কে একশোয় একশো পাও কে জানে!'

অচ্যুত জবাব না দিলেও ওর কথাগুলো নিয়ে চুপচাপ বসে ভাবে।

এখন কুলদীপ যে-নোটটার কথা বলেছে সেটা মউলি চেয়ে পাঠিয়েছিল কুলদীপের মারফত। আবার সেটা ফেরতও আসবে কুলদীপের হাত দিয়ে। তা হলে তো মউলি কুলদীপের কাছ থেকেই নোটটা নিতে পারত! কারণ, নগেনস্যারের ডিকটেশান থেকে ওরা সবাই নোট নিয়েছিল। সেদিন মউলি আসেনি।

আবার একদিন ছাদে দেখা হতে অচ্যুত এই অদ্ভুত 'যোগাযোগ ব্যবস্থা' নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে মউলি হেসে বলেছিল, 'এতে একটা অন্যরকম মজা আছে—তুমি বুঝবে না।'

ওর ভ্যাবাচ্যাকা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু পরে মউলি বলেছে, 'ঠিক আছে, আমি দুটো এক্স্যাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝাচ্ছি। সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে টেলিফোনে কথা বললে কত ভালো লাগে। আবার সেই কথাগুলো চিঠি দিয়ে বলাবলি করলে...ওঃ, ফ্যান্টাস্টিক।'

একটু চুপ করে থেকে অচ্যুতকে দেখল মউলি। তারপর জিগ্যেস করল, 'কিছু বুঝলে?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল। সত্যিই ও কিছু বোঝেনি।

তাই এখন কুলদীপের কথায় ও শুধু ঘাড় হেলাল।

তখনই ওর চোখ গেল স্কুলের দোতলার বারান্দার দিকে।

সত্যবানস্যার বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেট খাচ্ছেন। নীচে বানজারার ঘরের কাছে যে অত হইচই, ভিড়, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই।

হঠাৎই মাঠে একটা শোরগোল ব্যস্ততা শুরু হল। ছাত্রের দল প্রায় ছুটে চলে গেল স্কুল বিল্ডিং-এর কাছে। হুড়মুড় করে যার-যার ক্লাসরুমের দিকে রওনা হল।

ওদের কথাবার্তার টুকরো শুনে অচ্যুতরা বুঝল হেডস্যার এসে গেছেন। পিছন ফিরে তাকাতেই ওরা হেডস্যারকে দেখতে পেল।

হেডস্যার মোহনলাল পুরকায়স্থ রোগা শরীরটাকে টান-টান করে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। মাথায় টাক, চোখে চশমা, ভাঙা গাল, চোয়াল শক্ত। দেখলেই বোঝা যায় বেশ কড়া ধাতের মানুষ। সবসময় ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে চান। কিন্তু আজ প্রেয়ার হবে কি না কে জানে! বানজারা ঘণ্টা বাজাতে পারেনি। তা ছাড়া অনেকটা দেরিও হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রেয়ারের ঘণ্টা বাজল—দেরিতে হলেও। হেডস্যার পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। এখন বানজারার গোরু-বাছুরের মৃতদেহের নিশ্চয়ই একটা গতি হবে। কিন্তু কোন প্রাণী ওদের গলার অমন হিংস্র কামড় বসিয়েছে সেটা জানা যাবে কী?

ক্লাস বসল। অচ্যুত ভালো করে পড়ায় মন দিতে পারছিল না। বারবার ভাবছিল, স্কুলে হঠাৎ এসব কী শুরু হল!

টিফিনের সময় প্রতীক ওকে জিগ্যেস করল, ‘কী রে, রাজীব আজ এল না?’

অচ্যুত বলল, ‘দেখছি তো আসেনি—।’ একইসঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল, রাজীব আজ টিফিনের জন্য কেক-প্যাটিস কিনতে পরেশদার দোকানে নেমেছিল।

তা হলে কি হঠাৎ করে ওর জ্বর-টর হল!

চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর থেকে রাজীব ওদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। নিজের অন্যায়ের জন্য বারবার ওদের কাছে দুঃখ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে। অচ্যুত ভাবল, রাতে একবার ফোন করে রাজীবের খবর নেবে। কিন্তু তখনই খেয়াল হল, ওর কাছে তো রাজীবের ফোন নম্বর নেই। তখন ও প্রতীককে বলল ফোন করে রাজীবের খবর নিতে।

টিফিনের সময় প্রতীক পকেট থেকে একটা পাতলা ক্যালকুলেটার বের করে অচ্যুতদের দেখাল : ‘আমার ছোটমামা পরশু আমেরিকা থেকে ফিরেছে—আমার জন্যে এটা নিয়ে এসেছে।’

ওরা একে-একে ওটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দেখতে লাগল।

কুলদীপ বলল, ‘এই, তোরা ক্যালকুলেটর পরে দেখবি—আগে শোন। সামনের শনিবার দুটোর সময় ‘সি’ সেকশনের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ ঠিক করেছি। আজ ছুটির পর টিম ফাইনাল করে ফেলতে হবে।’

বাসব আর সৌরভ হইহই করে উঠল। ওরা দুজনে ফুট-বলের পোকা।

তারপর ফুটবল নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য বিপজ্জনক অশুভ ঘটনাগুলো মুছে গেল ওদের মন থেকে।

সেদিন ছুটির পর অচ্যুত যখন সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিল তখন ওর মনটা বেশ হালকা লাগছিল। আজ সাতটার সময় নগেনস্যারের কাছে পড়া আছে। মউলি আজ আসবে না। কুলদীপকে দিয়ে মউলি যেমন খবর পাঠায়, অচ্যুতেরও কি পালটা কোনও খবর পাঠানো উচিত? নাকি কাল বিকেলে ছাদে উঠে ওর জন্য অপেক্ষা করবে? যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়! মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা একটুও বলা হয়নি। বলতে পারলে অচ্যুতের মন হালকা হত।

ইতিহাসের কোচিং সেরে অচ্যুত বাড়ি ফিরল প্রায় পৌনে নটা নাগাদ। আর ফিরেই শুনল প্রতীক ওকে ফোন করেছিল। কোচিং থেকে ফিরলে ফোন করতে বলেছে। খুব জরুরি দরকার।

বই-খাতা গুছিয়ে রেখে প্রতীককে ফোন করল অচ্যুত।

একবার রিং বাজতে-না-বাজতেই প্রতীক রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল।

'আমি অচ্যুত—।'

'ওঃ, তোর ফোনের জন্যেই ওয়েট করছিলাম। এক্ষুনি রাজীবের বাড়িতে যেতে হবে।'

'কেন?' অচ্যুত অবাক হয়ে গেল।

'সে অনেক ব্যাপার—গেলে সব জানতে পারবি। আমি কুলদীপকে ফোন করে দিচ্ছি, ও দশ মিনিটের মধ্যে রাজীবের বাড়ি পৌঁছে যাবে। তুইও চলে আয়।'

অচ্যুতের বুকের ভেতরে একটা ধকধকানি শুরু হল। রাজীব কাল টিফিনের কেক-প্যাটিস কিনেছিল, কিন্তু আজ স্কুলে আসেনি! ওর কি কোনও বিপদ হয়েছে?

'কী হয়েছে রাজীবের?' অচ্যুতের গলার স্বরটা খসখসে হয়ে গেল।

'বললাম তো, গিয়ে সব শুনবি—।'

ফোন রেখে দিল প্রতীক।

অচ্যুত মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'আমাকে এখুনি একবার সাইকেল নিয়ে বেরোতে হবে।'

'কেন রে, রাত নটার সময় কোথায় বেরোবি?'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে মিথ্যে কথা বলল অচ্যুত, 'প্রতীকের কাছে আমার একটা নোট রয়ে গেছে। সেটা আজ রাতেই লাগবে—পড়তে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না—আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরোল অচ্যুত। আকাশের দিকে একবার তাকাল। সেখানে ঘোলাটে লালচে মেঘ অপেক্ষা করছে।

তখনই চোখ গেল মউলিদের বারান্দায়। একটা মেয়েলি ছায়া সেখানে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে ধরা রেডিয়ো বাজছে।

সাইকেল চালিয়ে রাজীবদের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অচ্যুত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বুকের হালকা ভাবটা কখন যেন মিলিয়ে গেছে। তার বদলে মেঘলা আকাশটা চুপিচুপি সেখানে ঢুকে পড়েছে।

।।পাঁচ।।

রাজীবদের বাড়িতে পৌঁছে দেখল কুলদীপ আর প্রতীক আগেই সেখানে হাজির। অল্প আসবাব দিয়ে ছিমছামভাবে সাজানো ড্রয়িং- ডাইনিং-এ ওরা বসে রয়েছে। ওদের সামনে আখরোট কাঠের কারুকাজ করা টেবিলে কমলা রঙের শরবতের গ্লাস। ঘরের এককোণে রঙিন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল চলছে।

অচ্যুত ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসতে-না-বসতেই দেখল, রাজীব আসছে।

রাজীবের গায়ে একটা নীলরঙের চাদর জড়ানো। ওর মাম্মি ওকে ধরে-ধরে নিয়ে আসছেন।

রাজীবের ফরসা মুখ বেশ ফ্যাকাশে। অচ্যুতদের দেখে মলিন হাসল।

মাম্মি ওকে যত্ন করে সাবধানে একটা সোফায় বসালেন। অচ্যুতদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল রাত থেকে হাই ফিভার—মাথা তুলতে পারছে না। ডক্টর দেখিয়ে আজ সন্ধের পর জ্বর একটু কমেছে। ওর ঘাড়ে পোকা-টোকা কী একটা কামড়েছে—তাই থেকেই হয়তো ইনফেকশান হয়েছে। এখানকার ড্রেনেজ সিস্টেমটা তো একেবারেই প্রিমিটিভ, নন-হাইজিনিক...সাফার করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই...।'

রাজীবের মাম্মির সাজগোজ বেশ নজরে পড়ার মতো। ডানহাতের দু-আঙুলে দুটো পাথর বসানো সোনার আংটি।

'তোমাদের সঙ্গে রাজুর কী ইমপর্ট্যান্ট ডিসকাশন আছে—সেই সন্ধে থেকে ও একেবারে ছটফট করছে। তোমরা কথা বলো...', অচ্যুতের দিকে ফিরে : 'আমি তোমার শরবত পাঠিয়ে দিচ্ছি—।'

চলে যেতে-যেতে রাজীবের দিকে ঘুরে তাকালেন মাম্মি : 'রাজু, বেশি স্ট্রেইন কোরো না। ডক্টর ব্যানার্জি তোমাকে অ্যাবসলিউট রেস্ট নিতে বলেছেন...।'

মাম্মি চলে যেতে রাজীব শব্দ করে হাঁফ ছাড়ল। তারপর ওদের তিনজনের চোখের দিকে পালা করে তাকিয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা আমি মাম্মি-বাপি কাউকে বলিনি। বললে শোরগোল করে থানা-পুলিশ ঘেঁটে একেবারে দুনিয়া মাথায় তুলবে। আমার বিপদের কথাটা ভাববে না।'

'কীসের বিপদ?' এক চুমুকে শরবত শেষ করে কুলদীপ জানতে চাইল।

'বলছি।' ঢোঁক গিলল রাজীব। ওর মুখে একটা আলতো ভয়ের ছায়া নেমে এল। ও অচ্যুতের দিকে তাকাল : 'তুই কাল আমাকে পরেশদার দোকানে নামিয়ে দেওয়ার পর স্যাটাস্যাটের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল...।'

কুলদীপ চোখ বড়-বড় করে চাপা শিস দিয়ে উঠল।

অচ্যুত অপেক্ষা করতে লাগল। প্রতীক গালে হাত দিয়ে কৌতূহলভরা মুখে রাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। আর মাঝে-মাঝে আনমনাভাবে শরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

'সত্যবানস্যারের সঙ্গে সাইকেল ছিল। বললেন, আমার সঙ্গে কী কথা আছে...যেতে-যেতে বলবেন। আমি কেক-টেক কিনে ওঁর সাইকেলে উঠলাম—সামনে রডের ওপরে বসলাম। স্যারের চোখে-মুখে একটা চাপা ফুর্তি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারিনি।

'...সাইকেল চালিয়ে যেতে-যেতে স্যাটাস্যাট অঙ্ক নিয়ে খুব জ্ঞান দিতে লাগল।' অচ্যুতের দিকে ইশারা করে রাজীব বলল, 'তোর অঙ্কের মাথা নিয়ে খুব প্রেইজ করছিল। আর কথা বলতে-বলতে...।' রাজীবের চোখ সরু হয়ে এল : 'আমার ঘাড়ের কাছে বারবার ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছিল। আমার বিরক্ত লাগছিল...কিন্তু কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। স্যাটাস্যাটের জড়ানো গলায় কথা শুনতে-শুনতে আমার ঝিম ধরানো নেশা মতন হয়ে গেল। ততক্ষণে সাইকেল ঘোষদের বাগানবাড়ি ছাড়িয়ে পুকুরের পাশের অন্ধকার রাস্তায় চলে এসেছে। আমি বললাম, ''স্যার, এ-রাস্তা দিয়ে এলেন কেন?'' আমার মাথার পেছন থেকে স্যাটাস্যাট খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, ''এটাই তো তোর বাড়ি যাওয়ার শর্টকাট রে বোকা!''

'আমি কিন্তু জানতাম যে, ওটা শর্টকাট নয়—তবুও কিছু বলতে পারলাম না। কেমন যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের ওপরে আর কোনও কন্ট্রোল ছিল না।

'স্যাটাস্যাট একটা বটগাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে সাইকেলটা দাঁড় করাল। বটগাছের ঝুরির ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। পুকুরের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছিল।

'আমার বেশ ভয় করছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারছিলাম না। গলার ভেতরে কেউ যেন খানিকটা তুলো গুঁজে দিয়েছে। এমন সময় পুকুরের কালো জলে কোনও মাছ বোধহয় ঘাই মারল—ছপাৎ করে শব্দ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ে কাঁটা ফোটার মতো ব্যথা পেলাম। তারপরই জায়গাটা চিনচিন করতে লাগল। আমি...।'

ডিসকভারি চ্যানেলে আচমকা বাঘের গর্জন শোনা গেল। ওরা চারজনেই সামান্য চমকে উঠল। এই গরমের মধ্যেও অচ্যুতের কেমন যেন শীত করছিল।

ওরা টিভির দিকে তাকিয়েছিল। তখনই দেখল, একজন মহিলা একগ্লাস শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

শরবতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন। রাজীব গ্লাসটা তুলে নিয়ে অচ্যুতের হাতে দিল, 'নে, শরবত খা।'

অচ্যুত এক ঢোঁকে শরবতের গ্লাস অর্ধেকটা শেষ করে জানতে চাইল, 'তারপর?'

রাজীব দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল :

'...আমি অসাড় হয়ে সাইকেলের রডের ওপরে বসে রইলাম। নড়াচড়ার শক্তি নেই। স্যারও কোনও কথা বলছিলেন না। একটা ঘোরের মধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল। চোখের সামনে থেকে চাঁদ মুছে গেল। ব্যাঙের ডাক আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু চিনচিনে ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলাম।

'...ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। একসময় আবার চাঁদ দেখতে পেলাম, ব্যাঙের ডাকও শুনতে পেলাম। শরীরটা খুব উইক লাগছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। টের পেলাম, স্যার আমার ঘাড়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। জামার কলারটা তুলে দিয়ে ঘাড়ের কাছটা ভালো করে ঢেকে দিতে চাইলেন। তারপর বললেন, ''আমার দিকে একবার তাকা...।'' আমি অন্ধ ভক্তের মতো ওঁর হুকুম মেনে তাকালাম...।'

রাজীব হঠাৎই শিউরে উঠল। পাশে বসে থাকা অচ্যুতের হাত খপ করে চেপে ধরল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'বাড়িতে এসব কথা একদম বলিনি। তোদের বলছি—।'

'তাকিয়ে কী দেখলি?' প্রতীক জিগ্যেস করল।

'দেখলাম...।' চোখ গোল-গোল করে তাকাল রাজীব। ওর মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল : 'দেখলাম, স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ—ধকধক করে জ্বলছে—আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি। ঠিক যেন বেড়াল বা চিতাবাঘের চোখ। চোখ তো নয়, মার্বেল পাথর বসানো! স্যার অদ্ভুতভাবে হেসে ভয়ানক গলায় বললেন, ''কাউকে এসব বলবি না। তুই এখন আমার! আমার কথায় উঠবি, আমার কথায় বসবি, আমার কথায় চলবি। আমার ইশারা তোর কাছে আদেশ। এ-কথা মনে রাখিস।''

'আশ্চর্য! বিশ্বাস কর, স্যারের ওপরে আমার একটুও রাগ হল না। ছুটে পালাতেও ইচ্ছে করল না। পাথরের স্ট্যাচুর মতো স্যারকে দেখছিলাম, স্যারের কথা শুনছিলাম।

'এরপর স্যার সাইকেল চালিয়ে আমাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিলেন। কানের কাছে মুখ এনে সাপ-খেলানো সুরে অনেক কথা বললেন। কথাগুলো সব আমার মনে নেই। তবে একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আমি বাড়ি এলাম। গলার পাশে, ঘাড়ের কাছটায় চুলকোচ্ছিল। হাত দিতেই কেমন চটচটে লাগল। দেখি রক্ত। তখনই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। তারপর বাপি-মাম্মির হইচই, ডাক্তার ডাকাডাকি, কত কী কাণ্ড!

'বাড়িতে আমি ভয়ে কোনও কথা বলিনি। বলেছি, অন্ধকারে ওই পুকুরের কাছটায় কী একটা পোকা যেন কামড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোদের সত্যি কথা বলছি, সত্যবানস্যারের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা হয়ে আছি। বারবার মনে হচ্ছে, কাল রাতের ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বপ্ন—একবর্ণও সত্যি নয়। কিন্তু আসলে তো সত্যি! এখন তোরা আমাকে বাঁচা। কী করব বলে দে—।'

রাজীবের কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। কুলদীপ ওর কদমছাঁট চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল। প্রতীক বয়স্ক মানুষের মতো ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বসে। আর অচ্যুতের মনের ভেতরে তোলপাড় চলছিল।

কী করা উচিত এখন?

প্রতীক বিড়বিড় করে বলল, 'স্যাটাস্যাট আসলে ড্রাকুলা! আজকের যুগে এ তো বিশ্বাস করা মুশকিল!'

অচ্যুত ধীরে-ধীরে বলল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ব্যাপারটা বোধহয় মিথ্যে নয়। তা ছাড়া পিশাচের আবার যুগ আছে নাকি!'

কুলদীপ বলল, 'আমি ওসব ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। রাজীব, তোর মনে হয় ভুল হয়েছে। তোকে সত্যি-সত্যিই কোনও পোকা-টোকা কামড়েছে।'

রাজীব চোখ বড় করে জানতে চাইল, 'তা হলে ওই সবুজ চোখ দুটোও ভুল?'

'না, মোটেই ভুল নয়,' জবাব দিল অচ্যুত, 'আমিও ওই সবুজ চোখ দেখেছি। স্যারের মধ্যে যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে সেটা আঁচ করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে এইরকম তা বুঝতে পারিনি। রাজীব, তুই এখন যা—শুয়ে পড় গিয়ে। কয়েকটা দিন রাস্তায় বেরোস না। আমরা একটু ভেবে দেখি, কী করা যায়। তোর ফোন নাম্বারটা আমাকে দে—।'

রাজীব ফোন নম্বর বলল। অচ্যুত সেটা কয়েকবার বিড়বিড় করে আওড়ে মুখস্থ করে নিল।

এমন সময় রাজীবের মাম্মি ঘরে ঢুকলেন। রাজীবকে লক্ষ করে বললেন, 'রাজু, চলো, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। এবারে ওষুধ লাগিয়ে রেস্ট নেবে। কাল ডক্টর ব্যানার্জি আবার চেক আপে আসবেন। তোমরা শরবত

খেয়েছ তো?'

শেষ প্রশ্নটা অচ্যুতদের লক্ষ করে।

প্রতীক আর অচ্যুত গ্লাসের বাকি শরবত শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

কুলদীপ হাঁ করে টিভিতে বাঘ আর বাইসনের লড়াই দেখছিল, অচ্যুত ওকে খোঁচা মারল। কুলদীপ ফিরে তাকাতেই ওকে উঠতে ইশারা করল।

'আসি, আন্টি।'

রাজীবকে 'টা-টা' করে ওরা তিনজন দরজার দিকে এগোল। হঠাৎই প্রতীক ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজীবকে বলল, 'কাল তোকে ফোন করব—।' তারপর মাম্মিকে আড়াল করে এক চোখ টিপে হাতের ইশারায় বলতে চাইল, 'কোনও ভয় নেই।'

রাস্তায় বেরোতেই কুলদীপ অচ্যুতকে বলল, 'কী রে, স্যাটাস্যাটের সবুজ চোখের ব্যাপারটা আমাদের বলিসনি তো!'

'ভয়ে বলিনি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাট হেভি ডেঞ্জারাস। কিন্তু কী করে হঠাৎ এরকম চেঞ্জ হয়ে গেল বল তো?'

'হয়তো ওর ওপরে পিশাচ ভর করেছে।' অচ্যুত বলল, 'রক্তপিশাচ ড্রাকুলা যেমন ভর করত—আমি টিভিতে দেখেছি।'

প্রতীক কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'বানজারার গোরু-বাছুরকেও কি তা হলে পোকা কামড়েছে?'

কুলদীপ আর প্রতীকের দিকে তাকাল অচ্যুত। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, স্যাটাস্যাট-পোকা।'

ওর কথায় কেউ হাসল না।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

ওরা তিনজন যে-যার সাইকেলে উঠে রওনা হয়ে পড়ল। যেতে-যেতে কুলদীপ চেঁচিয়ে বলে গেল, 'কাল স্কুলে দেখা হবে—।'

রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে। সাইকেল রিকশা, স্কুটার, বা লোকজন চোখে পড়ে কি পড়ে না। অচ্যুত সাইকেল চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর মন রাস্তার দিকে ছিল না। দুটো ধকধকে ক্ষুধার্ত সবুজ চোখ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল।

ও মনে-মনে ঘটনাগুলো যতই চিন্তা করছিল ততই যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও মানে হয় না, কারণ, কেউ ওদের কথা বিশ্বাস করবে না।

তা হলে কী করা যায়? সত্যবানস্যারকে ওরা দশ-পনেরোজন মিলে ঘিরে ধরে কোণঠাসা করবে? জবাবদিহি চাইবে? নাকি হেডস্যারের কাছে দলবেঁধে গিয়ে সত্যবানস্যারের নামে নালিশ করবে?

তখনই অমিয়স্যারের কথা মনে পড়ল।

প্রমাণ চাই, প্রমাণ। স্যাটাস্যাটকে লাল হাতে ধরতে হবে। কিন্তু সেই সুযোগ কি কখনও পাওয়া যাবে?

এইসব এলোমেলো চিন্তা করতে-করতে অচ্যুত যখন বাড়ি ফিরল তখন দেখল মা একরাশ দুশ্চিন্তা মুখে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

একইসঙ্গে ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, মউলিদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় সেই মেয়েলি ছায়াটা এখনও একইরকমভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, 'সেই কখন থেকে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! একে রাত হয়েছে, তার ওপর বৃষ্টি—একটা বিপদ হলে তখন কী হবে বল তো!'

অচ্যুত সামান্য হাসল। সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে মা-কে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। মা-কে ও বলতে পারল না, 'বিপদ হলে তখন কী হবে' নয়—এর মধ্যেই ও বিপদের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে।

অভিমন্যুর মতো ওকে চক্রব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ভেদ করতে না পারে, তা হলে অভিমন্যুর মতোই হয়তো ওর...।

অচ্যুত আর ভাবতে পারল না।

রাজীবের ঘটনাটা ওর শিরদাঁড়ায় বরফ জমিয়ে দিয়েছে।

।।ছয়।।

পরদিন স্কুলে গিয়ে অচ্যুতরা জোট পাকাতে শুরু করল।

ও, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, সৌরভ সবাই বন্ধুদের রাজি করিয়ে কাছাকাছি ডেস্কে বসল। আর ক্লাসের মাঝে ফাঁক পেলেই ফিসফাস করে আলোচনা করতে লাগল।

একটার পর একটা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, ওদের সেদিকে মন নেই। আনমনা হওয়ার জন্য বাসব ভূগোলের পিরিয়ডে কালীপদস্যারের কাছে বকুনিও খেল। কিন্তু সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা এত সাঙ্ঘাতিক যে, ওরা কেউই পড়াশোনায় মন দিতে পারছিল না।

টিফিনের ঘণ্টা যখন পড়ল তখনও ওরা ক্লাসে বসে রইল। যে দু-তিনজন ঘরে বসেই টিফিন খায়, কুলদীপ তাদের মাঠে যেতে বলল, ‘তোরা নীচে গিয়ে টিফিন খা। আমাদের একটু প্রাইভেট কথা আছে।’

কুলদীপকে সবাই একটু সমীহ করে। তাই কেউই কথা বাড়াল না।

অচ্যুতের কাছে সব শোনার পর বাসব আর সৌরভ তো একেবারে থ হয়ে গেল।

প্রতীক বলল, ‘সেইজন্যেই তুই আর কুলদীপ অত গুজগুজ করতিস!’

কুলদীপ একটু হাসল। বলল, ‘চিন্তা করে দেখ, ব্যাপারটা কীরকম আজগুবি আর সিরিয়াস।’

বাসব বলল, ‘কুলদীপ বলছে স্যাটাস্যাটকে চোখে-চোখে রাখতে—যদি হাতেনাতে ধরা যায়।’

প্রতীক গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল : ‘হুঁ—প্রমাণ না পেলে কিছু করা মুশকিল...।’

‘স্যাটাস্যাটও আমাকে এই কথা বলেছিল—সবুজ চোখ দেখানোর সময়। প্রমাণ না পেলে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।’

সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, ‘আমার ছোট একটা অটোমেটিক ক্যামেরা আছে। ফটো তুলে নিলে কেমন হয়। সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ—।’

প্রতীক হাসল, ‘স্যাটাস্যাট কি তোর ক্যামেরার সামনে চোখ সবুজ করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবে?’

‘কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে!’

বাসব হাতের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল। তারপর বলল, ‘আমাদের পাঁচজনের কাজ এখন একটাই—প্রমাণ খোঁজা। সৌরভ যদি ক্যামেরা নিয়ে কিছু করতে পারে তো করুক। আর আমরা সত্যবানস্যারের ওপরে কড়া নজর রাখব। শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও। এই নজরদারির কাজে দরকার হলে আরও কয়েকজনকে দলে নেব।’

বাসবের কথাটা কুলদীপের মনে ধরল। প্রতীকও মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, ‘স্যার একা—আর আমরা অনেক। আমাদের সুবিধে অনেক বেশি।’

অচ্যুত বলল, ‘আমাদের গ্রুপের বাইরে কেউ যেন কিছু না জানতে পারে। ক্লাস টেনের দাদাদেরও কিছু বলার দরকার নেই। এখন সবকিছু সিক্রেট রাখাটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট।’

‘তুই বাড়িতে কিছু বলিসনি?’ কুলদীপ জিগ্যেস করল।

‘না, এখনও বলিনি। বললে পর হইচই বেধে যাবে—হয়তো এ-স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য স্কুলে ভরতি করে দেবে। আমার মা যা ভিতু!’

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত ওদের জল্পনা-কল্পনা চলল। স্কুল ছুটির পর মাঠের সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা না-ফুরোনো কথা বলছিল।

কুলদীপ বলল, ‘আগামীকালের ম্যাচ বাতিল করতে হবে।’

সৌরভ বলল, ওর ক্যামেরাটায় নতুন ফিল্ম ভরে ও তৈরি হবে।
বাসব বলল, সত্যবানস্যারের ওপরে সবসময় নজর রাখার জন্য পাড়ার বন্ধুবান্ধবদেরও বলতে হবে। কারণ, বাসবরা যদি রাস্তাঘাটে, স্টেশনে, সব জায়গায় স্যারের পিছু নেয় তা হলে স্যার সহজেই গোলমালটা ধরে ফেলবেন।
ওরা চারজন বাসবের কথায় সায় দিল।
অচ্যুত আনমনা হয়ে কী ভাবছে দেখে প্রতীক ওকে ঠেলা মারল : 'কী রে, কী ভাবছিস?'
'ফটো তোলা যাবে কী করে তাই ভাবছি। সৌরভ, তোর ক্যামেরা যেন সোমবার থেকে রেডি থাকে—।'
সৌরভ প্রবল উৎসাহে ঘাড় কাত করে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। কালকেই ফিল্ম কিনে ক্যামেরা লোড করে নেব।'
অচ্যুত বলল, 'রাতে সবাই রাজীবকে ফোন করে একটু সাহস দিস...নইলে ওর ভয় কাটবে না। তা ছাড়া ওর শরীর কেমন আছে, সেটাও জানা দরকার।'
কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভ ঘাড় নাড়ল। বাসবের বাড়িতে ফোন নেই।
ছুটির পর ছেলের দল স্রোতের মতো মাঠ পেরিয়ে লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই স্রোত এখন একেবারে ফিকে হয়ে এসেছে।
ওরা দেখল, সত্যবানস্যার আরও দুজন স্যারের সঙ্গে স্কুল থেকে বেরোচ্ছেন। ওঁদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন। দেখে মনেই হয় না এতগুলো ভয়ংকর ঘটনা সত্যি।
কুলদীপ হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, নেক্সট উইকে স্যাটাস্যাটের কোচিং-এর কী হবে?'
অচ্যুত বলল, 'আমরা যেমন যাই যাব। শুধু রাজীবকে যেতে বারণ করব। আর শোন, স্যার যদি কাউকে একা ডাকেন তা হলে কেউ যাবি না। স্কুলে অতটা ভয় নেই...বেশি ভয় বাইরে।'
অচ্যুত লক্ষ করল, সত্যবানস্যার যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের জটলার দিকে একবার তাকালেন। ছোট্ট করে হাসলেন বলেও মনে হল। অবজ্ঞার হাসি।
একটু পরেই ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।
আকাশে মেঘ আছে, তবে তেমন ঘন নয়। বাতাস বইছে, এলোমেলো। অচ্যুতের চুল হাওয়ায় উড়ছিল। মাঠে-ঘাটে কাশফুল ফুটেছে। জানিয়ে দিচ্ছে পুজোর আর খুব দেরি নেই। কিন্তু বর্ষার যা ঢং এবার, মনে হয়, মা দুর্গাকে প্রণাম না করে সে বাড়ি ফিরবে না।
দোকানপাটে ভিড় তেমন নেই। পুজোর বাজার এখনও লাগেনি। পুজো-পুজো গন্ধটাও অচ্যুতের নাকে আসছে না। অথচ আর কিছুদিন পরেই পুজোর ছুটি পড়বে। ওর বন্ধুদের অনেকেই বাইরে বেড়াতে যাবে। অচ্যুতরা খুব একটা যায় না। গতবারে শুধু দিঘা গিয়েছিল।
পথে একটা চুড়িদারের দোকান দেখতে পেল অচ্যুত। সেখানে অনেক বাহারি রঙের চুড়িদার ঝুলছে। তার মধ্যে একটা ওকে মউলির কথা মনে পড়িয়ে দিল। মউলির ওইরকম রঙের একটা চুড়িদার আছে।
কাল রাতে মউলি অতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কেন? অচ্যুত কখন ফেরে সেটা দেখার জন্য?
মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা বলতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু অচ্যুত তো এখনও পর্যন্ত মা-বাপিকেও কিছু বলেনি।
সময় আসুক, তখন বলবে।

রবিবার সকালে একটা ভয়ানক খবর অচ্যুতদের এলাকাটাকে একেবারে ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল।
ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে একটা বড় ধানকল আছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা চ্যাম্পিয়ানশিপের বড়-বড় খেলা সব এই মাঠে হয়। এলাকার লোকজন মাঠটাকে ধানকলের মাঠ বলে।
সেই মাঠে ভোরবেলা দু-দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেল।

দুটো মৃতদেহই রক্তহীন, ফ্যাকাশে। তাদের ঘাড়ের পাশে গভীর দুটো দাঁতের দাগ।

এরকম অদ্ভুত মৃতদেহ এলাকার কেউ কখনও দেখেনি।

যারা নিজের চোখে মৃতদেহ দুটো দেখেছে, তারা বলল, 'ঠিক মনে হবে ঘাড়ে পাইপ ঢুকিয়ে কোনও পিশাচ কোক কিংবা পেপসি খাওয়ার মতো রক্ত টেনে নিয়েছে।'

অচ্যুত পাড়ার হারানদার মুদিখানা দোকানে গুঁড়ো হলুদ আর চিঁড়ে কিনতে গিয়েছিল। সেখানে খবরটা শুনেই ওর গা গুলিয়ে উঠল। রাজীবের কথাগুলো মনে পড়ে গেল পলকে।

যারা মারা গেছে তারা বিহারি। ধানকলে কাজ করত, মাঝে-মাঝে ছুটি-ছাটায় দেশে যেত। দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে জোট বেঁধে ধানকলের কাছাকাছি ঝুপড়িতে থাকত।

কাল রাতে ওরা দুজনে হয়তো নেশা-টেশা করতে বেরিয়েছিল...তারপর রাত করে মাঠের ওপর দিয়ে ফেরার সময় ওইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

বহু চেষ্টা করেও খুনের উদ্দেশ্য কেউ খুঁজে পেল না। নেশাগ্রস্ত দুজন গরিব দেহাতিকে কে খুন করতে চাইবে? তা ছাড়া ঘাড়ের পাশে ওইরকম বীভৎস একজোড়া গর্তই বা কে করবে?

অনেকেই ধরে নিল, এ কোনও অপদেবতার কাজ।

পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু স্থানীয় লোকজনকে মামুলি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ডেডবডি চালান করে দিয়ে দায় সারলেন।

অচ্যুত বাড়ি ফিরে মা-বাপিকে এই জোড়া-খুনের খরব দিল।

মা তো ভয়েই সারা। বলল, 'কোচিং থেকে ফেরার সময় একা-একা ফিরবি না। এরকম কাণ্ড জীবনে শুনিনি বাবা!'

বাপি বলল, 'দ্যাখো গিয়ে, কারা হয়তো রক্তের ব্যাবসা করার জন্যে সিরিঞ্জ দিয়ে সব রক্ত টেনে নিয়েছে!'

অচ্যুত বলল, 'তা হলে এক-একজনের ঘাড়ে দুটো করে সিরিঞ্জের ফুটো কেন?'

'কেন আর, দুটো সিরিঞ্জে তাড়াতাড়ি রক্ত টানা যাবে—।'

বাপির স্বভাব হচ্ছে যে-কোনও সমস্যাকে চটজলদি সমাধান করে দেওয়া। যেমন এখন। বাপি যুক্তি দিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দেবে রক্তের চোরাব্যবসার জন্যই ওই দুজন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যদি প্রত্যেকের ঘাড়ে পাঁচটা করেও ফুটো থাকত, তা হলেও বাপির ব্যাখ্যা করতে কোনওরকম অসুবিধে হত না।

এই জোড়া খুনের ঘটনাটার কথা শুনে অচ্যুত বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল, আজই স্কুলের ব্যাপারগুলো মা-বাপিকে খুলে বলবে। কিন্তু বাপির দায়সারা যুক্তি আর ব্যাখ্যা শুনে ও দমে গেল। কে জানে, ওর কথা শুনে বাপি হয়তো আজগুবি বলে হেসেই উড়িয়ে দেবে!

সত্যবানস্যার ঠিক বলেছিলেন। এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চাইবে। প্রমাণ না দিতে পারলে অচ্যুতের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকী মা-বাপিও হয়তো বিশ্বাস করবে না।

কিছুক্ষণ কী ভাবল ও। তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে সৌরভকে ফোন করল।

ফোন করতেই সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, 'জোড়া মার্ডারের খবর পেয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ—।'

'শোন, কুলদীপ আমাকে ফোন করেছিল, ওর পাড়ার দু-বন্ধুকে ও স্যাটাস্যাটের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা স্যাটাস্যাটকে কাল রাতে ধানকলের মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।'

'ক'টার সময়?'

'এই ধর দশটা। মাঠের ধারে জঙ্গলের কাছটায় স্যাটাস্যাট ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল। ওর সঙ্গে আরও একজন ছিল—তবে সে অন্ধকারে গাছের আড়ালে থাকায় ওরা লোকটাকে দেখতে পায়নি। স্যাটাস্যাট

লোকটার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছিল। কুলদীপের বন্ধুরা কোনও কথা শুনতে পায়নি। তারপর...রাত বাড়ছিল বলে ওরা ভয়ে পালিয়ে এসেছে...।'

তা হলে কি দুটো খুন দুজনের কীর্তি? স্যাটাস্যাট একা করেনি?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অচ্যুত বলল, 'শোন, তোকে যে-জন্যে ফোন করেছি। তোর ক্যামেরাটা রেডি আছে তো?'

'হ্যাঁ রেডি—।'

'কাল স্কুলের পর তোর বাংলা কোচিং আছে না?'

'হ্যাঁ—তো কী হয়েছে?'

'তুই কোচিং সেরে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে আমাকে মিট করবি। পরেশদার কেকের দোকানের সামনে। সেখান থেকে আমরা স্যাটাস্যাটের কোচিং-এ যাব...শুধু তুই আর আমি...তার বেশি গেলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।'

সৌরভ বলল, 'ও. কে.।'

'শোন, ক্যামেরা নিয়ে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আমাদের গ্রুপের বাইরে কাউকে বলবি না।'

'আচ্ছা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর সৌরভ জানতে চাইল, 'কাল স্যাটাস্যাটের ফটো তুলবি?'

'হ্যাঁ। কাল তা হলে ঠিক সাতটায়...।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত।

তারপর পড়াশোনা নিয়ে বসল।

বই-খাতা চোখের সামনে খোলা, অক্ষর কিংবা শব্দগুলো দিব্যি নজরে পড়ছে—কিন্তু মাথায় সেগুলোর কোনওরকম অর্থ তৈরি হচ্ছিল না। সেখানে মাইলের পর মাইল লম্বা ঘুড়ির সুতো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আর জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অচ্যুত হাঁসফাঁস করছিল।

বারবার রাজীবের কথা মনে পড়ছিল। খুব কপালজোরে ও বেঁচে গেছে। নইলে ধানকলের মাঠের ঘটনার মতোই ওকে পুকুরপাড়ে আগাছার জঙ্গলে ভোরবেলা পাওয়া যেত।

অচ্যুতের বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল।

রাজীবও নিশ্চয়ই ধানকলের মাঠের খবরটা শুনেছে! ছোট জায়গায় খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগে না।

এ খবর কানে গেলে রাজীব হয়তো আরও ভয় পেয়ে যাবে।

নানান চিন্তায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই রাজীবকে ফোন করল অচ্যুত।

'হ্যালো—।'

ওপাশ থেকে কোনও মহিলা ইংরেজিতে রাজীবদের ফোন নম্বরটা বললেন। গলা শুনে মনে হল রাজীবের মাম্মি।

'রাজীব আছে?'

'হু ইজ স্পিকিং প্লিজ?'

'আমি অচ্যুত—রাজীবের ক্লাসমেট...।'

'হ্যাঁ, ধরো—।'

একটু পরেই রাজীব ফোনে কথা বলল, 'অচ্যুত, খবরটা শুনেছিস?'

'ধানকলের মাঠের কেসটা?'

'হ্যাঁ।' রাজীবের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'সেইজন্যেই তোকে ফোন করেছি। একটুও ভয় পাবি না—আমরা শিগগিরই যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করছি। স্যাটাস্যাটের কেসটা আমরা এসপার-ওসপার করে ছাড়ব।'

'শোন...একটা ব্যাপার...মানে...।' থতিয়ে থতিয়ে বলতে চাইল রাজীব।

'কী হয়েছে?'

'স্যাটাস্যাট কাল রাতে আমাকে ফোন করেছিল...।'

'বলিস কী!...কী বলল?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে ড্রাম বাজতে শুরু করল।

'আমাকে ওর কোচিং-এ যাওয়ার কথা বলছিল।'

'সে কী! কাল তো কোচিং ছিল না।'

'সেইজন্যেই তো ডাকছিল। বলছিল, আমার সঙ্গে ওর একা-একা কী দরকার...তাই...।'

'খবরদার যাবি না!' চেঁচিয়ে উঠল অচ্যুত।

'শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে যাইনি। তবে...তবে ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছিল...।' অপরাধীর সুরে বলল রাজীব, 'তুই বিশ্বাস করবি না, স্যার কীরকম অদ্ভুত গলায় আমাকে ডাকছিলেন। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা গল্পের নিশির ডাকের মতো। বারবার বলছিলেন, ''আসতে তোকে হবেই। আমার ডাক তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি না। আজ না হয় কাল তোকে আসতেই হবে। আমার তেষ্টা তোর রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তোকে পাগল করে দেবে। তোর আমার যে রক্তের সম্পর্ক, তাকে কখনও ছিন্ন করা যায় না। কখখনও না।''

'...তুই বিশ্বাস কর, অচ্যুত—আমি তখন মাতালের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। স্যার ছাড়া আমি আর তখন কিচ্ছু ভাবতে পারছিলাম না। মাথাটা হঠাৎ কেমন টলে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। টেবিলের একটা কোনা ধরে সামলে নিলাম। মাম্মি একটু দূরে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। আমাকে টলে যেতে দেখেই ছুটে আমার কাছে এসে আমাকে ধরে ফেলল। তারপরই..।'

'তারপর কী?'

'তারপর মাম্মির সঙ্গে আমার কী ঝামেলা! মাম্মি আমাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না, আর আমি বেরোবই! শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে...।'

রাজীব হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অচ্যুত ওকে কী বলবে ভেবে পেল না। রাজীব কাঁদছে কেন সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

কান্না থামিয়ে ভাঙা গলায় রাজীব বলল, 'কাল আমি খুব জোর বেঁচে গেছি, না রে?'

অচ্যুত অবাক হয়ে গেল, 'কেন বল তো?'

'আমি গেলাম না বলেই হয়তো ধানকলের মাঠের লোক দুটো খতম হয়ে গেল।'

'এসব তুই কী বলছিস!'

'ঠিকই বলছি। স্যারের সেই ডাকের টান যে কী মারাত্মক সে তোকে আমি বলে বোঝাতে পারব না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজীব ধরা গলায় জানতে চাইল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো? তোদের ব্যাগ থেকে আর কখখনও আমি টাকা চুরি করব না...বিশ্বাস কর।' রাজীব আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওর কান্নাটা এমন যেন ও জেনে গেছে, ওর কপালে কেউ সুনিশ্চিতভাবে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

অচ্যুতের খুব কষ্ট হল। ও বলল, 'তুই মিছিমিছি কাঁদছিস। তোর কোনও ভয় নেই। আমি এক্ষুনি কুলদীপ, প্রতীকদের ফোন করছি। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তোর বাড়িতে যাচ্ছি। আন্টিকে আমাদের জন্যে শরবত তৈরি করে রাখতে বল...।'

ফোন ছেড়ে দিল অচ্যুত।

ওর শরীরটা কেমন অবশ লাগছিল। দিশেহারাভাবে ও যে-কোনও একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

।।সাত।।

সোমবার সন্ধে সাতটার সময় সৌরভ পরেশদার কেকের দোকানের সামনে এল।

অচ্যুত আগে থেকে সাইকেল নিয়ে কেকের দোকানের পাশে একটা সাইকেল সারানোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সৌরভকে দেখেই ওর দিকে এগিয়ে গেল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ক্যামেরা এনেছিস

তো?'

সৌরভ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'চল যেতে-যেতে প্ল্যানটা বলছি...।'

সাইকেলে উঠে পড়ল অচ্যুত। সৌরভও সাইকেল নিয়ে ওর পাশে-পাশে চলল।

সরু রাস্তায় ওদের বেশ কসরত করে সাইকেল চালাতে হচ্ছিল। আজ সারাদিনে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি, তাই রাস্তা মোটামুটি শুকনো। তবে বাতাস থমকে গিয়ে একটা গুমোট গরম চেপে বসেছে।

রাস্তায় মোটামুটি ভিড়। তারই মধ্যে দুটো সাইকেল-ভ্যান মাইক লাগিয়ে আগামী রবিবারে কী একটা মিটিং হবে বলে প্রচার চালাচ্ছে। 'দলে-দলে যোগ দিন' কথাটা বারবার ওদের কানে এসে ঝাপটা মারছিল।

কোনওরকম যানজট কাটিয়ে সাইকেল-ভ্যানে দুটোকে পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল।

কাল বিকেলে অচ্যুত, প্রতীক, কুলদীপ আর বাসব রাজীবের বাড়িতে গিয়েছিল। ওকে যতটা সম্ভব ভরসা দিয়ে এসেছে। কিন্তু অচ্যুত বুঝতে পারছিল, একটা সাংঘাতিক ভয় রাজীবের মনে গেঁথে গেছে। ওর কাছে ঘণ্টাদেড়েক থেকে তারপর অচ্যুতরা যার-যার বাড়ি ফিরে গেছে।

সাইকেল চালাতে-চালাতে সৌরভ আর অচ্যুত স্কুলের কাছে চলে এল। স্কুল পেরিয়ে, পুকুর পেরিয়ে, যতই এগোতে লাগল রাস্তার লোকজন ততই ফিকে হতে লাগল। সেই সঙ্গে আলোও।

বর্ষার টইটম্বুর নালা থেকে ব্যাঙের দল ডাকছিল। তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ঝিঁঝির দল সঙ্গত করছিল। বড়-বড় গাছের মাথা আকাশের মেঘের সঙ্গে কখন যে মিশে গেছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না। পথের এখানে-ওখানে কয়েকটা ঝুপড়ি-দোকানে পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা বিক্রি হচ্ছে। তার টিমটিমে আলো দোকান ছাড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছতে পারছে না।

একটু পরেই সত্যবানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল ওরা।

দেড়খানা ঘর নিয়ে পলেস্তারা-খসা একটা একতলা বাড়ি। তার একপাশে টিনের চাল। বাড়ির ডানপাশে আর পিছনদিকে গাছ-আগাছার দল যেমন খুশি বেড়ে উঠেছে। আর বাঁ-দিকে একটা জং-ধরা ঘাড় কাত করা টিউবওয়েল।

বাড়ির বাইরে আলো বলতে হাতদশেক দূরে ইলেকট্রিক পোস্টের মাথায় ঝোলানো একটা বালব।

এই আস্তানাটা ভাড়া নিয়ে সত্যবানস্যার কোচিং চালান।

বড় ঘরটার চারটে ছোট-ছোট জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। জানলাগুলো একটু উঁচুতে হাওয়ায় শুধু ঘরের ড্যাম্প ধরা দেওয়াল চোখে পড়ছে।

কোচিং-এর ঘর থেকে একটু দূরে সাইকেল থামাল অচ্যুত আর সৌরভ। আগাছার জঙ্গলের ওপরে সাইকেল দুটো ওরা কাত করে শুইয়ে দিল। তারপর অচ্যুত নীচু গলায় সৌরভকে বলল, 'তুই আস্তে- আস্তে পেছনদিকে চলে যা। সাবধানে জানলা দিয়ে উঁকি মারবি। যেই দেখবি স্যাটাস্যাট পিকিউলিয়ার কিছু করছে অমনি ফটো তুলে নিবি। শিয়োর হওয়ার জন্যে দরকার হয় দু-তিনটে শট নিবি। তারপর সোজা সাইকেল নিয়ে পালাবি—কোনওদিকে তাকাবি না। রাতে তোর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলে নেব।'

সৌরভের মুখে আলো-ছায়া নড়ছিল। ওকে একটু যেন বিভ্রান্ত দেখাল। ও জিগ্যেস করল, 'স্যাটাস্যাট হঠাৎ পিকিউলিয়ার কিছু করবে কেন?'

অচ্যুত কোচিং ক্লাসের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'সে-দায়িত্ব আমার। তুই যা—রেডি হয়ে থাক...।' সৌরভকে ঠেলা মারল অচ্যুত।

সৌরভ পা টিপে-টিপে বাড়ির পিছনদিকে চলে গেল।

আর অচ্যুত সটান হেঁটে গিয়ে কোচিং ক্লাসের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ওর বুকের ভেতরে যে মেঘ গুড়গুড় করছিল সেটাকে ও জোর করে ভুলে যেতে চাইল।

'স্যার—।'

অচ্যুতের ডাকে সত্যবানস্যার চোখ তুলে তাকালেন।

ঘরে আর কেউ নেই। মেঝেতে পাতা শতরঞ্চির ওপরে বসে স্যার খাতা দেখছেন।

খুব শিগগিরই স্কুলে কোনও পরীক্ষা হয়নি। এগুলো নিশ্চয়ই স্যারের কোচিং-এ নেওয়া পরীক্ষার খাতা।

'তুই হঠাৎ এসময়ে?'

'স্যার, আপনার কথা আমি কাউকে বলিনি।'

হাসলেন সত্যবানস্যার : 'আয়, আয়—এখানে এসে বোস।'

অচ্যুত দরজার কাছে চটি ছেড়ে শতরঞ্চির ওপরে গিয়ে বসল। চোখের আন্দাজে মেপে দেখল স্যারের কাছ থেকে ওর দূরত্ব মাত্র তিন হাত।

স্যারকে লক্ষ করছিল অচ্যুত। তেলচকচকে চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। কিন্তু মাথা ঝুঁকিয়ে থাকায় কয়েকগোছা চুল চশমার ওপরে ঝুলে পড়েছে। পাশ থেকে স্যারের নাকটাকে আরও খাড়া মনে হচ্ছে। আর গলার পাশে একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

শিরাটার ওপরে চোখ পড়তেই অচ্যুতের বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ওর ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মনের জোরে ইচ্ছেটাকে ও রুখে দিল। রাজীবের কথা মনে করে ও চোয়াল শক্ত করল।

সত্যবানস্যার আবার মাথা নীচু করে খাতা দেখছিলেন। সেই অবস্থাতেই জিগ্যেস করলেন, 'তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? তুই আমার সবচেয়ে ফেভারিট স্টুডেন্ট...।'

'পড়াশোনায় একদম মন বসছে না, স্যার।' অনুযোগ করে বলল অচ্যুত।

'কেন রে?' স্যার খাতার দিক থেকে চোখ সরালেন না।

'আপনার জন্যে।'

চমকে চোখ তুলে তাকালেন : 'তার মানে!'

'আপনার...ইয়ে...ওইগুলো আমি এখনও...মানে...বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি সত্যি-সত্যিই ভুলভাল দেখেছি। আপনি কী করে দেওয়ালে হাঁটবেন! কী করে আপনার চোখ সবুজ হবে! অসম্ভব!' একদমে কথাগুলো বলে গেল অচ্যুত।

'ভুলভাল? অসম্ভব?' হাতে ধরা লাল পেন ছেড়ে দিলেন সত্যবানস্যার। ওঁর টকটকে ফরসা গালে অপমানের রক্ত ছুটে এল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কোমলভাবে হাসলেন : 'যাকগে, ওসব কথা ছাড়। তুই কী দরকারে এসেছিল বল...।'

'আপনি রাগ করবেন না, স্যার। ওরকম অলৌকিক ব্যাপার...তাই সত্যি বলে মানতে কষ্ট হচ্ছে। আমি এরকম ভুল দেখলাম! আমি, স্যার, ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না...।'

সত্যবানস্যার স্নেহের হাসি হাসলেন। বললেন, 'বুঝেছি...বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে তোর মেন্টাল ডিসটারবেন্স হচ্ছে। তা কী করলে তুই খুশি হবি? কী করলে তোর পড়ায় মন বসবে?'

কয়েকবার ঢোঁক গিলল অচ্যুত। তারপর দমকা হাওয়ার মতো বলে বসল, 'আমাকে আর-একবার করে দেখাবেন, স্যার?'

অদ্ভুত হেসে সত্যবানস্যার উঠে দাঁড়ালেন। স্যারকে অনেক লম্বা দেখাচ্ছিল। অচ্যুতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যস, এই?'

অচ্যুত দম বন্ধ করে ঘাড় নাড়ল। বলতে চাইল, 'হ্যাঁ—এই।'

স্যার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। তারপর শূন্যে কয়েকবার হাত নেড়ে দরজার পাশের দেওয়ালে থাবা বসিয়ে দিলেন। এবং টিকটিকির মতো দেওয়ালে শরীরটাকে লেপটে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন।

অচ্যুতের শীত করতে লাগল। ওর মনে হল, একটা কদাকার সরীসৃপ দেওয়ালে কিলবিল করছে। একটা ভয়ের চিৎকার ওর গলা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় অচ্যুত সেটাকে রুখে দিল। আর মনের জোরে শতরঞ্চির ওপরে স্থির হয়ে বসে রইল।

মাথার ওপরে পুরোনো সিলিং পাখার খটখট আওয়াজ হচ্ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে অচ্যুত যেন কয়েকবার অটোমেটিক ক্যামেরার 'চিঁউ-চিঁউ' শব্দ শুনতে পেল।

স্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ঘাড় কাত করে হাসিমুখে অচ্যুতের দিকে তাকালেন : 'কিছুদিন আগে যখন এই ক্ষমতাটা আবিষ্কার করি তখন খুব তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলি। তারপর খেয়াল করলাম, আমার মনের ভেতরে কেমন একটা তোলপাড় চলছে। কখনও অঙ্ক মনে থাকে, কখনও থাকে না। কখনও চেনা লোককে চিনতে পারি, কখনও পারি না। প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। আর...।' স্যার সিলিং-এর দিকে বেয়ে উঠতে লাগলেন : '...আর অদ্ভুত একটা তেষ্টা শুরু হল। যখন তেষ্টা পায় তখন কোনও জ্ঞান থাকে না। তখন তো আর আমি আমি থাকি না! আবার যখন তেষ্টা পায় না তো পায় না। অ্যাই, রাজীব কেমন আছে রে?'

'ভ-ভালো আছে।' চাপা শব্দের টুকরোগুলো অচ্যুতের ঠোঁট থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

'ওকে আমি খুব ভালোবাসি। অবশ্য তোকেও ভালোবাসি...।' স্যার দেওয়াল বেয়ে মেঝের দিকে নেমে আসতে লাগলেন : 'তোকে ভালোবাসি তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান বলে। আর রাজীবকে...থাকগে, সে অন্য ব্যাপার।'

সার্কাস শেষ করে সত্যবানস্যার শতরঞ্চির ওপরে নেমে এলেন। হাততালি দেওয়ার ভঙ্গিতে শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপরে সেট করে বললেন, 'কী রে, এবার তুই খুশি তো? এখন থেকে পড়ায় মন বসবে তো?'

অচ্যুত কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। বাতাসে ঘরের জানলার পাল্লা নড়ে উঠল। একটা জংলি গন্ধ ঘরে ঢুকে পড়ল যেন।

'সবুজ চোখ কী আর দেখতে চাস?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। না, ও দেখতে চায় না।

'আসলে কী জানিস, এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়। তাই আমার এসব নিজের চোখে না দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না। প্রথম-প্রথম তো আমারই বিশ্বাস হতে চায়নি।' বলে মিহি গলায় খিলখিল করে হেসে উঠলেন সত্যবানস্যার।

স্যারের গলাটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় অচ্যুত একটু চমকে গেল। দেখল, স্যার হাসতে-হাসতেই মাথাটা এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছেন। স্যারের চোখ দুটো নিজে থেকেই কেমন কটা রঙের হয়ে যাচ্ছে।

স্যারের হাসিটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোঙানির মতো হয়ে গেল। তিনি খপ করে অচ্যুতের ডান হাতের কবজি চেপে ধরলেন। তীব্র চোখে তাকালেন ওর দিকে।

স্যারের হাতটা কী গরম! যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

অচ্যুত ঝটকা মেরে হাতটা টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না।

কেমন যেন ভাঙা খনখনে গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'বাঁচতে চাস তো এক্ষুনি পালা। তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান। তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না।' ওর হাতটা ছেড়ে দিলেন স্যার। একরকম যেন ছুড়ে দিলেন অচ্যুতের কোলে : 'পালা! পালা শিগগিরই!'

অচ্যুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। একছুটে চলে গেল দরজার কাছে।

সত্যবানস্যার তখন শরীরটাকে পিছনদিকে বেঁকিয়ে বুকে হাত বোলাচ্ছেন আর বুক-ফাটা তেষ্টায় চাপা শব্দ করছেন, 'ওঃ! ওঃ!'

হঠাৎই নিজের ডানহাতে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

অচ্যুতের মাথাটা যেন ঘুরে গেল, দরজা ধরে নিজেকে সামলে নিল।

স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ হয়ে গেল। হাত কামড়ে ধরা অবস্থাতেই তিনি অচ্যুতের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গোঙানির মতো শব্দ করে কিছু একটা বলতে চাইলেন। তারপর কামড়ে ধরা জায়গাটা প্রবল টানে শব্দ করে চুষতে লাগলেন।

এতক্ষণ গলা টিপে ধরে রাখা চিৎকারটা এইবার অচ্যুতের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। একটানে দরজা খুলে ও ছিটকে চলে এল বাইরে। চোখ-মুখে অসহ্য তাপ। মাথা ঝিমঝিম করছে। কোনওরকমে ও ছুটে গেল শুইয়ে রাখা সাইকেলের কাছে। তারপর অচ্যুত নামের একটা রোবট অমানুষিক গতিতে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

ঠিক তখনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে পড়ল আকাশ থেকে।

অচ্যুতের ভয় ক্রমশ কমছিল। কারণ, ও বোধহয় পালটে যাওয়া সত্যবানস্যারের ধরনধারণ এখন অনেকটা স্পষ্টভাবে আঁচ করতে পারছিল। বুঝতে পারছিল, সত্যবানস্যারের একটা ভয়ানক অসুখ হয়েছে। এ-অসুখ কখনও সারে কি না অচ্যুতের জানা নেই।

মঙ্গলবার স্কুলের দিনটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কারণ, পরদিনই ওরা সৌরভের তোলা ফটো দেখতে পাবে।

অচ্যুত টিফিনের সময় সৌরভকে বলল, 'তুই ফটোর দোকানে বলবি, ওগুলো আমাদের স্কুলের একটা নাটকের রিহার্সালের ফটো—এমার্জেন্সি প্রিন্ট দরকার।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাটকে যদি চিনে ফ্যালে?'

বাসব বলল, 'তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় স্যাটাস্যাটের মুখ ভালো করে দেখা যাবে না।'

কুলদীপ চোখ পাকিয়ে বলল, 'চিনতে পারল তো বয়েই গেল—।' তারপর বাসবের টিফিন বক্স থেকে আধখানা সন্দেশ নিয়ে মুখে পুরে দিল।

সৌরভ বলল, 'ফটোর প্রিন্ট হাতে এলে অমিয়স্যারকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়?'

অচ্যুত বলল, 'জানালে অমিয়স্যার হয়তো হেডস্যারকে জানাতে বলবেন। হেডুর সঙ্গে দেখা করতে আমার ভয় করে।'

কুলদীপ বলল, 'ভয়ের কী আছে! স্যাটাস্যাটের ফটো নিয়ে আমি তোর সঙ্গে হেডুর কাছে যাব।'

'ঠিক আছে প্রিন্টটা আগে হাতে আসুক...।'

ওদের আলোচনা-পরিকল্পনার যেন কোনও শেষ নেই। স্কুলে যে-কথা শেষ হয় না সেগুলো রাতে টেলিফোনে চলতে থাকে।

অচ্যুত যে ইদানীং ফোন বড্ড বেশি করছে সেটা ওর মায়ের নজরে পড়ল। এমনিতে ওরা খুব দরকার ছাড়া ফোন ব্যবহার করে না। কারণ, অচ্যুতের বাপিকে বেশ কষ্ট করেই ফোনের খরচ চালাতে হয়। তাই বাড়াবাড়িরকম ফোন করা নিয়ে মা অচ্যুতকে বারদুয়েক বকাবকি করল।

'মা যদি জানত কেন এত ফোন করতে হয়, তা হলে ভয়ে কেঁপে উঠত।' মনে-মনে ভাবল অচ্যুত।

বুধবার সকালে ও ফোন করে রাজীবের খবর নিল। রাজীব এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছে। তবে মনের জোর ততটা ফিরে পায়নি।

সেদিন সন্ধেবেলা সত্যবানস্যারের কোচিং-এ সময়টা বেশ সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। স্যারকে দেখে কে বলবে, গত পরশু রাতে এই কোচিং-ঘরের দেওয়ালে তিনি বুকে হেঁটে বেড়িয়েছেন!

স্যার দু-তিনবার রাজীবের কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর আচমকা মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে বুকে কয়েকবার হাত বোলালেন।

কোচিং-এর শেষে বাড়ি ফেরার সময় ওরা সৌরভের সঙ্গে ফটোর দোকানে গেল। ফটোগুলো ডেলিভারি নিয়ে ওরা একটু দূরে সরে গেল।

ধীরে-ধীরে খাম থেকে প্রিন্টগুলো বের করল সৌরভ।

ওরা সবাই হাঁ করে সত্যবানস্যারের ছবিগুলো গিলতে লাগল।

অচ্যুত একটা প্রিন্ট নিজের কাছে রেখে দিল। মউলিকে ঘটনাগুলো যখন বলবে তখন ছবিটা দেখাবে।

কুলদীপ বলল, 'আমি বাসবকে একটা ফটো দেখিয়ে দেব।'

প্রতীক বলল, 'তোরা যদি বলিস, তা হলে রাজীবকেও দেখাব।'

অচ্যুত বলল, 'না, না—রাজীবকে এক্ষুনি দেখানোর দরকার নেই। ও আগে সেরে উঠুক, রেগুলার স্কুলে আসুক—তখন দেখানো যাবে।'

তারপর ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

রাজীবের কথা ভাবতে-ভাবতে অচ্যুত বাড়ি ফেরামাত্রই মা বলল, 'একটু আগেই রাজীবের মা ফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন, রাজীব আমাদের বাড়িতে এসেছে কি না।'

'তার মানে!' চমকে উঠল অচ্যুত।

সঙ্গে-সঙ্গে ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করল।

'হ্যালো, আন্টি, আমি অচ্যুত বলছি।'

'দ্যাখো না, রাজু আধঘণ্টা মতন আগে কাউকে না বলে কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমি ওর ফোনবুক দেখে পসিবল সব জায়গায় ফোন করলাম। বাট নোবডি নোজ হোয়্যার হি ইজ। রাজু এখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি—শরীর এখনও উইক...আমি যে এখন কী করি! ওর বাপি গতকাল ভাইজাগ গেছে—ফ্রাইডেতে ফিরবে...।' রাজীবের মাম্মির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে গেছে। ওঁর গলা বেশ অসহায় শোনাচ্ছে।

'আচ্ছা, আজ সন্ধের পর রাজীবের কি কোনও ফোন এসেছিল?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে গুমগুম শব্দ শুরু হয়ে গেল। ও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যাঁ...কে একজন ফোন করেছিলেন। বলছিলেন, রাজুর স্যার...।'

'ক'টার সময় ফোনটা এসেছিল?'

'অ্যাবাউট এইট থারটি...।'

অচ্যুতদের কোচিং শেষ হয়েছে আটটা নাগাদ। তা হলে তার পরে সত্যবানস্যার রাজীবকে ফোন করে থাকতে পারেন।

রবিবার রাজীবের সঙ্গে অচ্যুতের ফোনে কথা হয়েছিল। রাজীব তখন কান্নাকাটি করছিল। বলছিল, স্যাটাস্যাট ওকে অদ্ভুত গলায় ডাকছিল। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

সেদিনটা ছিল শনিবার।

তা হলে আজও কি সেইরকম কিছু হয়েছে? রাজীবের মাম্মি আজ আর ছেলেকে আটকাতে পারেননি।

'কী হল?' রাজীবের মাম্মি ওপাশ থেকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

অচ্যুত ঠোঁট কামড়াল। একপলক তাকিয়ে রইল ফাঁকা দেওয়ালের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি খোঁজ করে দেখছি। কোনও খবর পেলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

'তুমি একটু সিরিয়াসলি দ্যাখো, অচ্যুত। আমি ভীষণ উয়ারিড হয়ে আছি।'

ওঁকে আবার আশ্বাস দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত।

ওর মন বলল, সত্যবানস্যারের কোচিং-ঘরে গিয়ে একবার খোঁজ করা দরকার।

ও চটপট কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভকে ফোন করল।

প্রতীককে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বাকি দুজনকে ও তৈরি হয়ে সত্যবানস্যারের কোচিং-এ আসতে বলল।

তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাপির বালিশের পাশ থেকে তিন ব্যাটারির টর্চটা তুলে নিল। একবার 'অন' করে দেখে নিল ঠিকঠাক জ্বলছে কি না।

টর্চ হাতে নিয়ে বেরোনোর সময় রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'মা, আমি একটু কুলদীপের বাড়ি যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তুমি দরজাটা দিয়ে দাও।'

মা তাড়াতাড়ি খুন্তি-কড়াই সামলে রান্নাঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে অচ্যুত সাইকেল টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে।

মা সদর দরজার কাছে যখন এল তখন অচ্যুতের সাইকেল অনেকটা দূরে চলে গেছে। মায়ের পিছুডাক ও শুনতে পেল না। দরজা বন্ধ করতে-করতে মা ভাবল, অচ্যুতের বাবার কী যে এক তাসের নেশা! সে বাড়িতে থাকলে যা-হোক করে ছেলেটাকে হয়তো আটকাতে পারত। এই বয়েসটা যে ভালো নয়, সেটা মানুষটা বুঝলে আর চিন্তা ছিল না। ছেলেটা এমন তাড়াহুড়ো করে কুলদীপের বাড়ি গেল কেন, কে জানে!

মায়ের জন্য অচ্যুতের খারাপ লাগছিল। কিন্তু আরও খারাপ লাগছিল রাজীবের জন্য।

জোরে প্যাডেল করে দশমিনিটের মধ্যেই ও সত্যবানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল। দেখল, কুলদীপ আর সৌরভ তখনও এসে পৌঁছয়নি।

বাড়িটার কাছ থেকে একটু দূরে সাইকেল থামিয়ে দিল অচ্যুত। অবাক হয়ে দেখল, কোচিং-ঘরের জানলাগুলো খোলা, কিন্তু কোনও জানলাতেই আলো চোখে পড়ছে না।

আলো নেভানো অথচ জানলা খোলা কেন?

সাইকেল থেকে নেমে পা টিপে-টিপে কোচিং-এর দরজার দিকে এগোল অচ্যুত। ডানহাতের শক্ত মুঠোয় টর্চটা ধরা রয়েছে।

রাত সবে ন'টা পেরিয়েছে, কিন্তু এই অঞ্চলটা এমন যেন ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। চারপাশে অন্ধকার গাছপালার মাঝে একতলা বেখাপ্পা বাড়িটাকে আরও অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল।

কোচিং-এর দরজার কাছে পৌঁছে অচ্যুত একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল।

এ-হাসি ওর চেনা। মিহি খিলখিল হাসি।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা অচ্যুত ততটা ভয় পেল না। কারণ, সত্যবানস্যার নিজেই পরশুদিন বলেছেন, 'তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না...।'

স্যার নিশ্চয়ই অচ্যুতের কোনও ক্ষতি করবেন না।

কৌতূহল ওকে টানতে লাগল। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে কেন? কুলদীপ, সৌরভ যখন আসে আসুক—ওর একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ঘরের ভেতরের রহস্যটা কী।

দরজায় আলতো করে চাপ দিল অচ্যুত। দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল।

ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। তারই মধ্যে জ্বলছে দুটো সবুজ চোখ। বোধহয় দরজার শব্দ পেয়েই এদিকে তাকিয়েছে।

সেদিকে তাক করে অচ্যুত টর্চ জ্বালল। এবং দৃশ্যটা ওকে পাথর করে দিল।

রাজীব উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর ওপরে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে রয়েছেন সত্যবানস্যার। স্যারের দাঁতের সারি চকচক করছে। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। তার আশেপাশে কয়েক জায়গায় লিপস্টিকের মতো লালচে ছোপ। সবুজ চোখ দুটো তীব্রভাবে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে।

স্যার তখনও খিলখিল করে হাসছেন।

অচ্যুত বুকফাটা চিৎকার করে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝুঁকে পড়া নেকড়েটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবং অচ্যুতকে তাক করে লাফিয়ে পড়ার জন্য সামান্য কুঁজো হল।

অচ্যুত পাগলের মতো ছুট লাগাল। ওর হাতের টর্চ কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। টর্চের আলোর বৃত্তটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে এপাশ-ওপাশ দুলে আগাছার জঙ্গলে কোথায় হারিয়ে গেল।

ভয়ংকর মৃত্যু তেড়ে এলে মানুষ যেভাবে মরিয়া হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়, ঠিক সেভাবে দৌড়ল অচ্যুত। হাঁকপাঁক করে পৌঁছে গেল সাইকেলের কাছে। সাইকেল টানতে-টানতেই একলাফে তাতে চড়ে বসল। তারপর শুরু হল একা-একা সাইকেল রেস।

তারই মধ্যে পিছনে তাকিয়ে দেখল সত্যবানস্যার আর-একটা সাইকেলে চড়ে ছুটে আসছেন। অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান হয়েও আজ আর অচ্যুতের রক্ষা নেই।

প্যাডেল করতে-করতে ভয়ে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। মায়ের পিছুডাকটা না শুনে ও আজ মারাত্মক ভুল করেছে। পোষা সাইকেলটাকে ও মনে-মনে বলতে লাগল, 'আজ আমাকে বাঁচাতেই হবে। নইলে আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব মিথ্যে। ছোট—ছোট...আরও জোরে ছোট...।'

রাস্তার দু-চারজন লোক অচ্যুতের ছুটন্ত সাইকেল দেখে ভাবল, এক্ষুনি ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে। কয়েকটা সাইকেল রিকশা চটপট পাশে সরে গিয়ে ওর বেপরোয়া গতির সাইকেলকে পথ করে দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছে সাইকেলে ব্রেক কষল অচ্যুত। একলাফে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেলে ফেলে দিল একপাশে। তারপর দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিল আর একইসঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা! মা! দরজা খোলো—জলদি।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অচ্যুত উসখুস করতে লাগল। গলা উঁচু করে দেখল, সত্যবানস্যার তিরবেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে আসছেন। ওঁর সবুজ চোখ এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দরজা তখনও খুলছে না দেখে একলাফে মউলিদের দরজায় চলে গেল অচ্যুত। ঠেলা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ঝটপট দরজায় খিল তুলে দিল। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে হাপরের মতো হাঁফাতে লাগল।

।।আট।।

দরজা বন্ধ করার সময় দড়াম করে শব্দ হয়েছিল। খিল দেওয়ার সময়েও।

অচ্যুত চোখ বুজে হাঁফাচ্ছিল। আর ভাবছিল, সত্যবানস্যার ওকে মউলিদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন কি না। মউলিদের বাড়িতে এর আগে কোনওদিন ও ঢোকেনি।

এমন সময় দরজার কাছটায় একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠল।

'এ কী, তুমি! এ সময়ে!'

মউলি।

চোখ খুলল অচ্যুত। কয়েক হাত দূরেই চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে মউলি। পরনে সাদা টপ, নীলচে স্কার্ট, কপালে টিপ, আর জোড়া বিনুনি।

এই বিপদের মুহূর্তে মউলিকে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে হল অচ্যুতের। ও হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'শিগগির ওপরে চলো—।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'পরে বলব। আগে চলো, দোতলা থেকে উঁকি মেরে একটা জিনিস দেখতে হবে।'

অচ্যুতের মুখ-চোখ দেখে মউলি আর কথা বাড়াল না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠল। উঠতে-উঠতে বলল, 'তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছ...।'

অচ্যুত কোনও জবাব দিল না।

দোতলায় উঠে মউলির মা-কে দেখতে পেল ও। মউলি মায়ের কাছে গিয়ে চাপা গলায় কী যেন বলল। তারপর অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে, 'এসো।'

একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরের লাগোয়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে রাস্তা দেখা যায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে মউলি এই বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

অচ্যুত চাপা গলায় মউলিকে বলল, 'সাবধানে উঁকি মেরে দ্যাখো তো, আমাদের বাড়ির দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না...।'

ওকে বিছানার ওপরে বসতে বলে মউলি বারান্দায় গেল।

অচ্যুত ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখল।

দেওয়ালে তিনটে রঙিন পোস্টার। এক কোণে পড়ার টেবিল—বই- খাতায় ভরতি। তার পাশে বইয়ের র‍্যাক। র‍্যাকের পাশে দড়িতে মউলির জামাকাপড় ঝুলছে।

অচ্যুত তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। বুঝল, ও মউলির ঘরে বসে আছে।

পড়ার টেবিলের পাশে মেঝেতে একটা জলের জগ ছিল। অচ্যুতের বুকটা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। জগটা দেখে তেষ্টাটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও উঠে গিয়ে জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল।

জগটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল মউলি বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকছে।

অচ্যুতের কাছে এসে মউলি বলল, 'একজন ফরসা রোগামতন লোক তোমাদের দরজায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মায়ের সঙ্গে কীসব কথা বলছে। আর রাস্তায় পড়ে থাকা একটা সাইকেল দেখিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে—যেন কাউকে খুঁজছে।'

'লোকটার চোখে চশমা আছে?'

'হ্যাঁ—।'

'রাস্তায় যে-সাইকেলটা পড়ে আছে, ওটা আমার—।'

মউলি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'লোকটা কে?'

'আমাদের স্কুলের অঙ্কস্যার। ওর তাড়া খেয়েই তো আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। মা দরজা খুলতে দেরি করছিল...।'

মউলির মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ও হাঁ করে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুত মউলিকে দেখছিল। ডিয়োডোর‍্যান্টের হালকা গন্ধ কোথা থেকে যেন ভেসে আসছিল।

একটু পরে ও মউলিকে বলল, 'দ্যাখো তো, লোকটা চলে গেছে কি না।'

মউলি আবার বারান্দায় গেল।

মিনিটপাঁচেক পর ও ফিরে এল, বলল, 'চলে গেছে। তবে কাকিমা এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আমি তা হলে এখন যাই। মা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।'

'তুমি আমাদের বাড়িতে আজ প্রথম এলে। চা-টা কিছুই...।'

'এটা আবার আসা না কি!' হেসে বলল অচ্যুত, 'এটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?' তারপর নীচু গলায় সেই পুরোনো কথাটাই বলল মউলি, 'মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...।'

'আজ আসি। তুমি আমাদের বাড়িতে একদিন এসো।'

অচ্যুত চলে যাচ্ছিল। মউলি ওকে পিছন থেকে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের ওই অঙ্কস্যার তোমাকে তাড়া করছিল কেন বললে না তো? অঙ্ক পারোনি?'

পিছন ফিরে তাকাল অচ্যুত, হাসল : 'হ্যাঁ, খুব কমপ্লিকেটেড অঙ্ক। পরে সব বলব। অনেক সময় লাগবে।'

অনেকটা জেদি ভঙ্গিতে মউলি অচ্যুতের কাছে এগিয়ে এল। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল। তারপর বেশ চাপা গলায় বলল, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ। সেদিন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম...দেখলাম, তুমি

সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরোলে...বেশ রাত করে ফিরলে। তারপর...তারপর...আজকে এইরকম...কী হয়েছে, অচ্যুত?'

অচ্যুত অবাক হয়ে মউলির মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখে নিজের নামটা এই প্রথম শুনল...শুনে খারাপ লাগল না। সত্যি, এই মুহূর্তে মউলিকে সব বলতে পারলে খুব ভালো লাগত। ওর চোখে কী সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসের ছাপ! কী আশ্বাসে ভরা ওর দৃষ্টি!

অচ্যুত দোটানায় দুলছিল। মউলিকে সবকিছু খুলে বলবে? এখনই?

'আমাকে তুমি সব বলবে না?' মউলির গলায় একইসঙ্গে শাসন আর অভিমানের ছোঁওয়া।

'বলব। সত্যি বলছি, বলব। আজ নয়। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। মা চিন্তা করছে।...আসি।' বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল অচ্যুত।

তরতর করে সিঁড়ি নামার সময় চেঁচিয়ে বলল, 'কাকিমা, আমি যাচ্ছি—।'

ওর মনে হল, মউলির ডিয়োডোর‍্যান্টের গন্ধটা ওর সঙ্গে যেন সদর দরজা পর্যন্ত এল।

দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই বলতে গেলে মায়ের মুখোমুখি।

অচ্যুতকে দেখামাত্রই মায়ের চোখে জল এসে গেল। অভিমানভরা চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'কোথায় ছিলি তুই? আমি...।' আর বলতে পারল না...গলা ভেঙে গেল।

'ভেতরে চলো, সব বলছি—।'

সাইকেলটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকল অচ্যুত। রাজীবের কথা ভেবে ও শিউরে উঠল।

রাজীব বোধহয় আর...।

রাজীবের কথাগুলো ওর মনে পড়ল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো?'

ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে গুছিয়ে বসতে-না-বসতেই মা আর বাপি এসে হাজির।

মা বলল, 'তলে-তলে তুই কী করছিস বল তো? আজ তোকে সব খুলে বলতেই হবে।'

বাপি কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই ও-ঘরে বসে টিভি দেখছিল, মা জেদ করে ডেকে এনেছে। ছেলেকে শাসন করে না বলে দু-চার কথা হয়তো বাপিকে শুনিয়েও দিয়েছে।

আমতা-আমতা করে বাপি বলল, 'শেষকালে আবার কী-না-কী বিপদে পড়বি...।'

অচ্যুত হাত নেড়ে বলল, 'সব বলছি। শুধু তার আগে রাজীবের বাড়িতে একটা ফোন করতে দাও—।'

অচ্যুতের কথায় কী যেন ছিল, মা-বাপি ওকে বাধা দিল না। ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করে বলল, 'অঙ্কস্যারের কোচিং-এ গিয়ে রাজীব বিপদে পড়েছে।'

রাজীবের মাম্মি খবরটা শুনেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। অচ্যুতকে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অচ্যুত দিশেহারাভাবে বলল, 'অ্যান্টি, আমি এর বেশি কিচ্ছু জানি না। আপনি শিগগিরই পুলিশে খবর দিন! দেরি করবেন না...এক্ষুনি...কে জানে, এখনও হয়তো সময় আছে!'

ফোন নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ হাঁফ ছাড়ল অচ্যুত। লক্ষ করল, মা-বাপি ওর দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে যেন ও ভিনগ্রহের প্রাণী।

একটু পরে আবার রিসিভার তুলল ও। একে-একে প্রতীক, সৌরভ আর কুলদীপকে খবর দিতে চাইল। সৌরভ আর কুলদীপকে বাড়িতে পেল না—তবে প্রতীক বাড়িতে ছিল। ওকে সংক্ষেপে রাজীবের বিপদের কথা জানাল অচ্যুত। বলল, 'কাল স্কুলে জরুরি মিটিং করতে হবে।'

ফোনের পালা শেষ হলে ও মা-কে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। খেতে-খেতে ব্যাপারটা বলছি...।'

মা আর বাপি অবাক হয়ে অচ্যুতের কাছে গোটা গল্পটা শুনল।

শুনে মায়ের মুখ ভয়ে বদলে গেল।

বাপি বলল, 'হাতে-পায়ে ফেভিকল লাগিয়ে তোর অঙ্কস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়ায়নি তো! টিভিতে ফেভিকলের যেরকম বিজ্ঞাপন দেখায়!'

এত সমস্যার মধ্যেও অচ্যুত হেসে ফেলল। বলল, 'না, একেবারে জেনুইন ম্যাজিক।'

তারপর ফটোগ্রাফটা বের করে মা আর বাপিকে দেখাল।

বাপিকে তার জায়গা থেকে নড়ানো মুশকিল। কারণ, ফটোটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বাপি বলল, 'তুই ঠিক জানিস, তোদের স্যারের ব্লাড ব্যাঙ্ক টাইপের কোনও সাইড বিজনেস নেই!'

অচ্যুত মাথা নেড়ে 'না' বলল।

'এখন কী করবি?' মা ভয়-পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

'এই টাইপের ব্লাডসাকারদের আগুন ছাড়া খতম করা যায় না...।' বিড়বিড় করে বলল বাপি।

মা বলল, 'কাল থেকে তুই স্কুলে যাস না—।'

'কখখনও না!' রুখে দাঁড়াল অচ্যুত : 'এইজন্যেই তোমাদের কিছু বলতে নেই! ভুলে যেয়ো না, স্যার একা, আর আমরা অনেক! কাল স্কুলে গিয়ে ব্যাপারটা অন্য স্যারদেরও জানাব। রাজীবের যদি কিছু হয়...।'

রাত বারোটার পর কুলদীপ অচ্যুতকে ফোন করে খবর দিল, রাজীব মারা গেছে।

অচ্যুত ভেবেছিল, এইবার বুঝি সত্যবানস্যারকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, হাজাররকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু তার কিছুই হল না।

কারণ, রাজীবের মৃতদেহ পাওয়া গেল স্যারের কোচিং থেকে অন্তত বিশ হাত দূরে আগাছার ঝোপের ভেতরে। ফলে পুলিশের কাছে সমস্যাটা ধানকলের মাঠের জোড়া খুনের মতোই দাঁড়াল।

এলাকায় খবরটা খুব তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে গিয়ে অচ্যুত শুনল ক্লাস হবে না। রাজীবের জন্য শোকপালন করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে।

শোকসভায় দাঁড়িয়ে রাজীবের জন্য নীরবতা পালন করার সময় অচ্যুতের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। একইসঙ্গে ভীষণ রাগ হল ওর। ওরা এতজন বন্ধু মিলে শেষ পর্যন্ত রাজীবকে ধরে রাখতে পারল না!

শোকপালন শেষ হলে অচ্যুত, কুলদীপ, বাসবরা জোট পাকাল।

অচ্যুত গতকালের ঘটনাটা ওদের খুলে বলল।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, 'রাজীবের বডিটা কোচিং-এর বাইরে গেল কী করে?'

'হয়তো স্যারই ওটা বাইরে আগাছার ঝোপের মধ্যে ফেলে এসেছেন।'

কুলদীপ শিস দিয়ে উঠল।

বাসব অচ্যুতকে বলল, 'এইবার পুলিশ তোকে হ্যারাস করবে।'

'সে করে করুক—যা সত্যি তাই বলব।'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা এবার স্যারদের জানানো উচিত।'

প্রতীক আর সৌরভও বাসবের কথায় সায় দিল।

অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল ওরা অমিয়স্যারকে পুরো ব্যাপারটা জানাবে।

স্কুলের ভিড় ফিকে হয়ে এসেছিল। স্যাররাও অনেকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। হঠাৎই বাসবের নজরে পড়ল, একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অমিয়স্যার দুজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলছেন।

বাসব বলল, 'চল, এখনই যাই—স্যারকে গিয়ে বলি।'

অচ্যুত আর প্রতীক ইতস্তত করছিল। কিন্তু কুলদীপও যেন খেপে গেল : 'আর দেরি করলে হবে না, অচ্যুত। রাজীব গেছে, এরপর কার পালা কে জানে! যা করার এখনই করতে হবে। চল—।'

ওরা পাঁচজন অমিয়স্যারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্যার ওদের দিকে একবার জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে অন্য দুজন ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন।

'কী ব্যাপার রে! রাজীবের জন্যে দুঃখ হয়। কী অরুন্তুদ ঘটনা বল তো!' হাতের একটা ভঙ্গি করে মাথায় চুল ঠিক করলেন অমিয়স্যার।

'স্যার, রাজীবের ব্যাপারেই কয়েকটা কথা আমরা আপনাকে বলতে চাই।' মনিটর বাসব বলল।

'তার মানে!' অমিয়স্যারের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বাসব : 'ও আপনাকে সব বলবে। আপনাকে যে-করে-হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে আমাদের স্কুল ছারখার হয়ে যাবে।'

'বলিস কী রে! আমাদের স্কুল অবনমিত হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ, স্যার—ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। প্লিজ, ওই জামগাছটার তলায় চলুন।' অচ্যুত অনুনয় করে বলল।

অমিয়স্যার বেশ হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু পাঁচটা নিষ্পাপ মুখের আকাঙ্ক্ষায় তিনি জল ঢেলে দিতে পারলেন না। আলতো করে বললেন, 'চল...।'

আকাশ ঘোলাটে। বৃষ্টি হবে কি হবে না বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন বুলবুলির ডাক ভেসে আসছিল। একটু দূরে ইলেকট্রিকের তারে একটা বাঁশপাতি পাখি পোকার আশায় বসে আছে। দুটো ছোট মাপের হলদে প্রজাপতি স্কুলের মাঠের ওপর দিয়ে এলোমেলোভাবে উড়ে যাচ্ছে।

অচ্যুত ভাবছিল, প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের কোনও খবর রাখে না। তাই এরকম বিপদের সময়েও উদাসীন হয়ে সেজেগুজে বসে আছে।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপরে পা ফেলে ওরা সবাই জামগাছ-তলার বেদির কাছে গেল। স্যারকে বসিয়ে শুরু করল ওদের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

মনোযোগী ছাত্রের মতো অমিয়স্যার গোটা গল্পটা শুনলেন। তারপর 'হুম' শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'সবাই বলবে, এ তোদের খপুষ্প কল্পনা। কোনও প্রমাণ কি তোদের কাছে আছে?'

এ-কথা বলামাত্রই তিনটে হাত ছিটকে এল অমিয়স্যারের চোখের সামনে। তিনটে হাতে ধরা রয়েছে তিনটে রঙিন ফটোগ্রাফ। সত্যবানস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

অমিয়স্যার অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে-ধীরে উচচারণ করলেন, 'তোরা আজকালকার ছেলে—ভূত-প্রেত-পিশাচে তোদের তেমন বিশ্বাস নেই। এখন বুঝতে পারছিস তো, বিজ্ঞানটাই সব নয়, যুক্তি-প্রযুক্তিই সব নয়! তার বাইরেও একটা রহস্যময় অন্ধকার জগৎ আছে। তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে...।' কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করলেন অমিয়স্যার। তারপর : 'মনে হয়...একমাত্র বীতিহোত্র ছাড়া এ-পিশাচকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।'

'বীতিহোত্র! সেটা কি কোনও ফলের বীজ বা গাছের শিকড়?' ভাবল অচ্যুত।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, 'বীতিহোত্র কী, স্যার...কোনও মন্ত্র?'

অমিয়স্যার মোলায়েম হেসে কুলদীপের দিকে তাকালেন : 'ওঃ, বীতিহোত্র জানিস না! বীতিহোত্র মানে আগুন!'

ওরা পাঁচজন লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাব্বাঃ, স্যার পারেনও বটে!

অচ্যুত বলল, 'স্যার, আমার বাপিও তাই বলছিল...।'

অমিয়স্যার সামান্য ঘাড় দোলালেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা স্কুলকে জড়িয়ে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আগে পুরকায়স্থবাবুকে জানানো দরকার। তোরা আমার সঙ্গে চল, ওঁকে এখনই গিয়ে এইসব সান্নিপাতিক ঘটনাবলির কথা খুলে বলি।'

ওরা স্যারের সঙ্গে স্কুল-বাড়ির দিকে হাঁটা দিচ্ছিল, দেখল সত্যবানস্যার হাসিমুখে ওদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন।

'কীরে, তোরা সব কোথায় চললি? এখনও বাড়ি যাসনি? যা-যা, বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা কর।'

এত স্বাভাবিক কথা বলার ঢং, এত সহজ পা ফেলার ভঙ্গি যে, অচ্যুতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অমিয়স্যার অপছন্দের চোখে সত্যবানস্যারের দিকে তাকালেন। একটু বোধহয় ভয়ও পেলেন। কারণ, অমিয়স্যারের মোটাসোটা শরীরটা পলকের জন্য কেঁপে উঠল।

অচ্যুত বেপরোয়া ঢঙে এক পা এগিয়ে গেল সত্যবানস্যারের দিকে। বেশ জোরালো গলায় বলল, 'স্যার, শুনেছেন তো, রাজীব মারা গেছে!'

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'হ্যাঁ রে, শুনেছি। ভেরি স্যাড। তবে চিন্তার তো কিছু নেই! তোরা তো আছিস!'

কথাটা বলেই সত্যবানস্যার আচমকা ঘুরে চলে গেলেন।

অমিয়স্যার রাগে ফেটে পড়লেন : 'চোরের মায়ের বড় গলা! কী স্পর্ধা! কী আটোপটংকার! চল, এখনই হেডস্যারের কাছে চল!'

স্যারের কথায় ওরা পা বাড়াল।

স্কুল এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওরা দেখল, বানজারা নীচের ক্লাসরুমগুলোর দরজা বন্ধ করে তালা লাগাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে অমিয়স্যার বললেন, 'পুরকায়স্থবাবুকে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে বলব ভাবছি। উনি বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইবেন না। হয়তো বলবেন...।'

'কেন, স্যার, ফটো তো আছে!' বাসব বলল।

'হুঁ, তা আছে। আসলে কী জানিস, আমারই বিশ্বাস হতে চাইছে না। যদিও জানি, তোরা সব সত্যি কথাই বলছিস।'

কথা বলতে-বলতে হেডস্যারের ঘরের দরজায় চলে এল ওরা।

ঘরের বাইরে কালো কাঠের নেমপ্লেট—তার ওপরে সাদা হরফে নাম লেখা : মোহনলাল পুরকায়স্থ, এম. এসসি., এম. এড.।

দরজায় খয়েরি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না।

অমিয়স্যার একটু উসখুস করতে লাগলেন। বললেন, 'এতজন একসঙ্গে ঢোকার দরকার নেই। উনি হয়তো কিছু মনে করবেন। বাসব আর অচ্যুত আমার সঙ্গে আয়।' হাতের ইশারায় ওদের কাছে ডাকলেন স্যার। প্রতীক, কুলদীপ, আর সৌরভকে লক্ষ করে বললেন, 'তোরা বাইরে প্রতীক্ষমাণ হয়ে থাক। দরজা ছেড়ে কোথাও যাবি না, বুঝলি...।'

ওরা তিনজন পরদা সরিয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছোট্ট ঘর। রং-খসা ড্যাম্প-ধরা দেওয়াল। সিলিং-এ কাঠের কড়িবরগা। শুধু জানলা-দরজার পরদাগুলোই যা বেমানানরকম আধুনিক।

পুরোনো কাঠের চৌকো টেবিলের ওপারে বসে মোহনলালবাবু কী একটা ফাইল খুলে পড়ছিলেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট।

'আসতে পারি, স্যার?' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অমিয়স্যার কুণ্ঠিতভাবে জিগ্যেস করলেন।

হেডস্যার মুখ তুলে তাকালেন। হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন—বসুন...।'

তারপরই বাসব আর অচ্যুতকে দেখে বললেন, 'আরে তোরা! কী ব্যাপার?'

'ওরা আমার সঙ্গে এসেছে। ক্লাস নাইনের ''এ'' বিভাগের ছেলে—অচ্যুত আর বাসব।' ওদের পিঠে একে-একে হাত দিয়ে অমিয়স্যার বললেন, 'ইস্কুলের ভয়ংকর বিপদ, স্যার...আপনাকে কিছু একটা করতে হবে। ওরা আপনাকে সব...।'

'কী, রাজীবের ব্যাপারে কিছু?' হেডস্যার সিগারেটে টান দিলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের গলা কেঁপে গেল।

'ফাঁড়ি থেকে বড়বাবু আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি বলেছি, আজ কনডোলেন্স-এর ব্যাপার আছে—স্কুল তাড়াতাড়ি ডিজলভ করে যাবে। কাল দুপুরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

অমিয়স্যার বললেন, 'মাত্র পাঁচ-দশমিনিট সময় নেব, স্যার। অচ্যুত, তুই বল—সংক্ষেপে বলবি।'

অচ্যুত ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করল। রাজীবের মায়া মাখানো করুণ মুখটা কল্পনা করে ও নিজেকে জেদ আর সাহস জোগাল।

একটানা গল্পটা ও বলে গেল। আগ্রহ আর চাপা কৌতুক নিয়ে মোহনলালবাবু ওর সব কথা মন দিয়ে শুনে গেলেন।

গল্প বলা শেষ হলে পকেট থেকে সত্যবানস্যারের ফটোগ্রাফটা বের করল অচ্যুত। ঘন-ঘন শ্বাস নিয়ে বলল, 'যদি স্যার, আপনার বিশ্বাস না হয়, স্যার...তা হলে এটা দেখুন...সত্যবানস্যার দেওয়ালে হাঁটছেন...।' ফটোটা হেডস্যারের দিকে এগিয়ে দিল ও।

অমিয়স্যার বললেন, 'একেবারে অবিশ্বসনীয় ঘটনা, স্যার...।'

'অবিশ্বাসের কী আছে!' টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন হেডস্যার। বললেন, 'আপনারা কি আর আমার কাছে এসে মিথ্যে কথা বলবেন!'

'আপনার অবাক লাগছে না?'

'না, অবাক লাগবে কেন! পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কত কী আছে। সেগুলো কি মিথ্যে, বলুন?'

অমিয়স্যার থতমত খেয়ে চুপ করে রইলেন। মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওঁদের সবাইকে পাগল ভাবছেন। মনস্তত্ত্ববিদরা যে-ঢঙে কথা বলেন উনি অনেকটা যেন সেই ঢঙে কথা বলছেন।

'দেওয়ালে সত্যবানবাবু ঠিক কেমন করে হাঁটছিল বল তো? এইরকম?'

ওরা অবাক হয়ে দেখল, হেডস্যার সিগারেটটা ঠোঁটে নিলেন। তারপর দু-হাত টান-টান করে পিছনের দেওয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হাতের পাতা দুটো চুম্বকের মতো দেওয়ালে সেঁটে গেল। তারপর ওঁর গোটা শরীরটা যেন বাতাসে ভেসে দেওয়ালে পৌঁছে গেল।

ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা অবস্থায় তিনি টিকটিকির মতো দেওয়ালে হাঁটতে লাগলেন। তারপর সিগারেটটা ডানহাতে নিয়ে ঘাড় কাত করে তাকালেন অচ্যুতদের দিকে। খিলখিল করে হেসে বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, 'দ্যাখ তো, এইরকম?'

অমিয়স্যার চেয়ারে কাত হয়ে পড়লেন। ওঁর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল।

বাসব অচ্যুতকে ভয়ে জাপটে ধরল। ফটো দেখা আর সামনাসামনি দেখায় অনেক তফাত আছে।

অচ্যুত অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় ততটা পায়নি। এই কসরত দেখে-দেখে ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। সত্যবানস্যারের কথাটা ওর মনে পড়ল : '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না...।' 'আমাদের' মানে তা হলে হেডস্যার আর সত্যবানস্যার! ধানকলের মাঠে কুলদীপের বন্ধুরা নিশ্চয়ই স্যাটাস্যাটের সঙ্গে হেডস্যারকেই দেখেছিল! আর তারপরই জোড়া খুন!

অচ্যুত আর ভাবতে পারছিল না।

হেডস্যার তখন দেওয়াল থেকে সিলিং-এ চলে গেছেন। হাতের সিগারেটে টান দিতে-দিতে তিনি শরীরটাকে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলিয়ে দিলেন। পায়ের চেটো সিলিং-এ এঁটে আছে, মাথাটা নীচের দিকে।

সেই অবস্থাতেই সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মোহনলালবাবু। ধোঁয়াটা ওঁর পায়ের দিকে যেতে শুরু করল।

'দ্যাখ তো, এইরকম সবুজ চোখ?'

অচ্যুত দেখল, কখন যেন হেডস্যারের চোখ স্যাটাস্যাটের মতো সবুজ হয়ে গেছে। ও সেই সবুজ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। একটা নেশার ঘোর ওকে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরছিল।

‘আমি আর তোদের অঙ্কস্যার—আমরা অনেক কিছু পারি। আসলে আমরা কিন্তু আলাদা নই, বুঝলি...একই...।’ মিহি খিলখিল হাসি। তারপর : ‘এ নিয়ে পাঁচকান করে কোনও লাভ নেই, শোরগোল কিংবা থানা-পুলিশ করেও কোনও লাভ নেই। এ পর্যন্ত যা-কিছু দেখেছিস, বা এখন দেখছিস—সবকিছু ভুলে যাওয়াই ভালো।’

স্রেফ পায়ে হেঁটে সিলিং থেকে দেওয়ালে, এবং দেওয়াল থেকে মেঝেতে নেমে এলেন মোহনলালবাবু। টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ছোট- হয়ে-যাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিলেন। তারপর ধীরেসুস্থে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অমিয়স্যার তখন থরথর করে কাঁপছেন। বাসব চোখ বুজে অচ্যুতকে জাপটে ধরে রয়েছে। অচ্যুত সোজা হয়ে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে—একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না।

ওর রাজীবের কথা মনে পড়ছিল, আর উলটোদিকের চেয়ারে বসা টাকমাথা, চশমা পরা লোকটাকে দেখে বমি পাচ্ছিল। ভাবছিল, কীভাবে এই একজোড়া রক্তপিশাচকে খতম করা যায়।

মোহনলালবাবুর চোখ এখন কটা রং থেকে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তিনি হাতছানি দিয়ে অচ্যুতকে কাছে ডাকলেন।

ডাকটা অনেকটা নিশির ডাকের মতন। অচ্যুতের সেরকমই মনে হল।

অতিকষ্টে বাসবের বাঁধন ছাড়িয়ে ও টেবিলের পাশ ঘুরে হেডস্যারের কাছে গেল। বাসব ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

হেডস্যার ছোবল মারার মতো পলকে হাত বাড়িয়ে অচ্যুতের চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকায় ওকে কাছে টেনে নিলেন। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে দাঁত খিঁচিয়ে হিসহিস করে বললেন, ‘তুই-ই যত নষ্টের গোড়া! তোকে ছেড়ে রেখে আমরা ভুল করেছি। তোকে কতকগুলো জরুরি কথা বলার আছে...।’ ওকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে গালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন হেডস্যার। আচমকা পালটে গিয়ে স্নেহ আর ভালোবাসার হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে। থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, ‘তুই বড় দুরন্ত আর দুষ্টু। তবে লেখাপড়ায় ফার্স্টক্লাস। দেখবি, সামনের পরীক্ষায় তুই ফার্স্ট হবি—আমরা তোকে ফার্স্ট করাব। কোনও চিন্তা নেই। আজ রাত আটটার সময়ে ধানকলের মাঠে চলে আয় দেখি। আমি আর সত্যবানস্যার থাকব। তোর সঙ্গে আমাদের খুব জরুরি আলোচনা আছে। মনে করে আসবি কিন্তু।’ অচ্যুতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বারবার : ‘অবশ্য না এসে তুই পারবি না...আসতে তোকে হবেই...। আমি জানি তুই আসবি।’

সম্মোহন করার ভঙ্গিতে একদৃষ্টে অচ্যুতের চোখে তাকিয়ে রইলেন হেডস্যার। আর সাপ-খেলানো সুরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ‘লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...আসতে তোকে হবেই...না এসে তুই পারবি না...।’

অচ্যুতের কেমন ঘোরের মতো লাগছিল। ও ঘাড় হেলিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, স্যার, যাব। যাব, যাব, যাব।’

‘লক্ষ্মী ছেলে।’ হেডস্যার আদরের গলায় বললেন, ‘তুই এখন যা। আর শোন, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে, অমিয়বাবু আর বাসবের এসব কিছুই মনে থাকবে না। তবে তুই কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবি না।’

অচ্যুত টেবিলের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে সরে এল।

হেডস্যার এবার অমিয়স্যার আর বাসবের দিকে পালা করে তাকালেন। ওঁর চোখ আবার সবুজ হয়ে গেল। অমিয়স্যার আর বাসব অপলকে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুতের মনে হল, কোনও অদৃশ্য রশ্মি যেন হেডস্যারের চোখ থেকে বেরিয়ে অমিয়স্যার আর বাসবের চোখ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

প্রায় একমিনিট পর হেডস্যারের চোখ আবার স্বাভাবিক হল। তিনি বেশ সহজ গলায় অমিয়স্যারকে বললেন, ‘ঠিক আছে, অমিয়বাবু... আপনারা তা হলে আসুন। ওই কথাই রইল...।’

অমিয়স্যার ঘাড় নেড়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। বাসবের হাত ধরে সাবধানে পা ফেলে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন। অচ্যুত ওঁদের পাশে-পাশে হেঁটে চলল।

বাসব আর অচ্যুতের দিকে পালা করে তাকিয়ে অমিয়স্যার যান্ত্রিক স্বরে মিনমিন করে বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, বুঝলি?'

বাসব ফ্যালফ্যাল করে অমিয়স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অচ্যুতের মাথায় কিছুই ঢুকল না।

ওর মনে শুধু পাগলাঘণ্টি বাজছিল : ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত...।

ওরা তিনজন হেডস্যারের ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রতীক, কুলদীপ আর সৌরভ দেখল যে-তিনজন মানুষ হেডস্যারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের মুখ-চোখ দেখে মনে হয় এইমাত্র ওরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

প্রত্যেকেরই চোখে হতভম্ব শূন্য দৃষ্টি। যেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে সদ্য পা ফেলেছে পৃথিবীর মাটিতে।

ওদের পাশাপাশি হেঁটে যেতে-যেতে একের পর এক প্রশ্ন করে চলল কুলদীপ।

উত্তরে অচ্যুত অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কীসব বলে একরকম দৌড়ে চলে গেল ওর সাইকেলের দিকে।

কুলদীপরা এবার বাসবকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু বাসবও কোনও কথা বলতে পারল না। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও কাঁদতে শুরু করে দিল।

সৌরভ একটু রুক্ষভাবেই অমিয়স্যারকে বলল, 'স্যার, হেডস্যার কী বললেন? সত্যবানস্যারের ব্যাপারে উনি কি কোনও স্টেপ নিচ্ছেন?'

অমিয়স্যার সিঁড়ি নামতে-নামতে খোলা উঠোনের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। সেই অবস্থাতেই আলতো করে বললেন, 'ওই কথাই রইল...ওই কথাই রইল।...বীতিহোত্র, বীতিহোত্র...বীতিহোত্র ছাড়া নিস্তার নেই রে...নিস্তার নেই।'

ওদের তিনজনকে বোকার মতো মাঠের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখে অমিয়স্যার চলে গেলেন। বাসবও ওঁর পিছন-পিছন ছুট লাগাল।

কুলদীপরা বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ওরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা শুরু করল।

হঠাৎ ওরা দেখল, সত্যবানস্যার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন।

প্রতীক আর সৌরভকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে কুলদীপ সত্যবানস্যারের পিছু নিল।

দোতলায় এসে সত্যবানস্যার সটান এগিয়ে গেলেন হেডস্যারের ঘরের দিকে। এবং পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কুলদীপও পা টিপে-টিপে পৌঁছে গেল হেডস্যারের ঘরের কাছে। তারপর ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে দরজার পাশে আড়ি পাতল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর ঘরের ভেতরে থেকে রক্ত-হিম-করা খিলখিল হাসি শোনা গেল।

হেডস্যার বলছেন, 'ছেলেটাকে আজ রাত আটটায় ধানকলের মাঠে আসতে বলেছি...।'

সত্যবানস্যার বলছেন, 'হ্যাঁ, অচ্যুতটা বড্ড ডিসটার্ব করছে। ভেবেছিলাম ওকে কিছু করব না...কিন্তু ও এমন শুরু করেছে যে, এখান থেকে হয়তো পাততাড়ি গোটাতে হবে।'

হেডস্যার হেসে বললেন, 'তোমার ছবি তুলেছে দেখলাম। তুমি দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছ।'

'তাই! কখন তুলল কে জানে! অবশ্য ও-ছবি দেখিয়ে কোনওরকম সুবিধে করতে পারবে না। যদি পুলিশে গিয়ে জানায় তা হলে পুলিশও কোনও আমল দেবে না...।'

'কিন্তু বারবার যদি ও পুলিশকে বিরক্ত করতে থাকে তা হলে একসময় পুলিশও আমল দেবে। তখন...। প্র্যাকটিক্যালি সেইজন্যই একটা কড়া স্টেপ নিতে হল। তুমি সময়মতো গৌরী বস্ত্রালয়ের মোড়ে চলে এসো। দুজনে একসঙ্গে ধানকলের মাঠে যাব।'

'ওঃ...দারুণ হবে। একইসঙ্গে তেষ্টার তৃপ্তি, আর ছেলেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি...।'

'তোমার দেখছি জিভে জল এসে গেছে।' খিলখিল করে হাসলেন হেডস্যার।

'আর তোমার আসেনি বুঝি!' সত্যবানস্যারও খিলখিল করে হাসলেন।

দুজনের হাসি যেন আর থামতেই চায় না। দুই পিশাচের রক্ত-হিম-করা হাসি।

কুলদীপ বেড়ালের পায়ে ছুট লাগাল। ঘাম ফুটে বেরোল ওর কপালে। উত্তেজনায় ও চাপা সুরে শিস দিয়ে উঠল।

দুদ্দাড় করে একতলায় নেমে এসেই ও সৌরভ আর প্রতীকের হাত ধরে টান মারল। দৌড়ে সাইকেল স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে বলল, 'শিগগিরই আয়...সামনে এখন অনেক কাজ...।'

সাইকেল চালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ওরা মরিয়া হয়ে একটা সমাধান খুঁজতে লাগল।

ভেতরে-ভেতরে ওরা ভয় পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আরও ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, 'কিছুতেই হার মানা চলবে না! কিছুতেই না!'

অমিয়স্যারের কথাগুলো কুলদীপের মনে পড়ছিল বারবার।

।।নয়।।

চাঁদ মেঘে ঢাকা ছিল। হয়তো সেইজন্যই জোনাকির ঝাঁক বাড়াবাড়িরকম উড়ছিল।

অচ্যুত যখন সাইকেল নিয়ে ধানকলের মাঠে পৌঁছল তখন উড়ন্ত আলোর বিন্দুগুলো ওর প্রথম চোখ টানল। একটা ঘোরের মধ্যে থাকলেও ও মুগ্ধ হয়ে জোনাকির খেলা দেখতে লাগল।

আশপাশের অন্ধকারে আরও অন্ধকার গাছপালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বাদলা বাতাস ওদের পাতায় ঝাপটা মারতেই ফিসফাস শুরু হল।

অচ্যুতের মনে হল, ওরা বলেছে, 'অচ্যুত এসে গেছে...অচ্যুত এসে গেছে...।'

ঠিক সেইসময়ে ওর ঠিক পাশ থেকে ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল, 'এসে গেছিস! গুড বয়। সাইকেল রেখে দিয়ে মাঠের মাঝে চল। হেডস্যার ওখানে অপেক্ষা করছেন...।'

অচ্যুত মোটেই চমকে উঠল না। ধীরে-ধীরে পাশ ফিরে তাকাল।

সত্যবানস্যার ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর নিশ্বাস অচ্যুতের গায়ে এসে পড়ছে। ঠান্ডা নিশ্বাস। কিন্তু তাতেও অচ্যুত অবাক হল না। ওর মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

বিকেলে দু-পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর একটু রোদও দেখা গিয়েছিল—শরতের রোদ। তখন অচ্যুত একটা পুজো-পুজো গন্ধ টের পেয়েছিল।

ওর ভীষণ মন খারাপ লাগছিল। মনের ভেতর থেকে ফিসফিস করে কেউ যেন বলছিল, 'এ-পুজো আর দেখা হবে না।' তাই রোদ উঠতেই ও ছাদে গিয়েছিল বিকেলের শেষ রোদটা গায়ে মাখতে।

'এই যে, মিস্টার অ্যাক্সিডেন্ট!'

মউলি। হলুদরঙের একটা চুড়িদার পরেছে। ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে, বিকেলের রোদ দিয়ে তৈরি।

অচ্যুত ওর দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

'কাল রাতে কী হয়েছিল? অঙ্কস্যারকে দেখে পালিয়েছিলে কেন বলো। তোমার মতো গুড বয়রা কখনও এমন পালায়! তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ আমাকে সব বলবে। কখন বলবে বলো।'

অচ্যুতের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও কিছুই বলতে পারল না। কয়েকবার ঠোঁট নড়ল শুধু।

মউলি অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত অচ্যুত বিড়বিড় করে বলতে পারল, 'বলব।'

কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মউলির ভুরু কুঁচকে গেল। পাঁচিলের কাছে এসে অচ্যুতদের ছাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

অচ্যুত সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'পুজোয় তুমি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করবে?'

'হ্যাঁ। তুমি করবে না?'

ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকাল অচ্যুত। সেদিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওটা কী আনন্দ?'

'কী ব্যাপার! তোমার কী হয়েছে?'

অচ্যুতের চোখে জল এসে গেল। হাতের পিঠ দিয়ে মোছার চেষ্টা করে জড়ানো গলায় বলল, 'কিচ্ছু না। তোমার কথা বলো।'

'হঠাৎ আমার কথা জানতে চাইছ?' চোখ পাকিয়ে হাসল মউলি।

'আজ খুব জানতে ইচ্ছে করছে। পরে যদি আর জানতে না পারি...।'

'ও—। ঠিক আছে, বলছি।' স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের কাছে হাত জড়ো করে সোজা হয়ে দাঁড়াল মউলি। তারপর পড়া মুখস্থ বলার ঢঙে বলল, 'আমার নাম মউলি মিত্র। তোমাদের পাশের বাড়িতে থাকি। পড়াশোনায় মন নেই। রোজ বিকেলে অ্যাক্সিডেন্টের লোভে ছাদে উঠে ঘোরাঘুরি করি। ব্যস! আপাতত এইটুকুই।'

ঠিক এইসময় সিঁড়ির কাছ থেকে মা অচ্যুতকে ডাকল।

অচ্যুত ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের দরজার দিকে একবার তাকাল। তারপর হাত নেড়ে মউলিকে 'টা-টা' করে বলল, 'কাল যদি ছাদে দেখা হয় বেশ হবে...।'

বলেই দৌড়ে চলে গেল ছাদ থেকে।

মউলি অবাক বিষণ্ণ চোখে অচ্যুতের চলে যাওয়া দেখল। ও যেন কতকিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

সত্যবানস্যারের গুড বয় কথাটা মউলিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আশপাশের অন্ধকার, জঙ্গলের গন্ধ, সব কিছু কেমন ভুলে গিয়েছিল অচ্যুত। ভুলে গিয়ে মউলির কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু ঝিঁঝিপোকার কান্না, ব্যাঙের ডাক, জোনাকির আলো, সত্যবানস্যারের ঠান্ডা নিশ্বাস, অচ্যুতকে আচমকা ঝাঁপিয়ে ঘিরে ধরল।

স্যারের হাত ধরে ও মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বড়-বড় ঘাস কিংবা জল-কাদা টের পেল কি পেল না।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ও হেডস্যারের কালো ছায়াটা ঠাহর করতে পারল।

ওকে দেখেই হেডস্যার দু-হাত শূন্যে তুলে নাচের ভঙ্গি করলেন।

সত্যবানস্যার অচ্যুতের ঠিক পিছনে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর হিসহিস করে বললেন, 'আজ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তৈরি হবে...তেষ্টার সম্পর্ক...রক্তের সম্পর্ক। তারপর...তারপর তুই মুক্তি পাবি।'

অন্ধকারে হেডস্যারের ধূসর ছায়া খিলখিল করে হাসল।

আকাশের তুলো-তুলো মেঘ জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কয়েকটা দলছুট তারা চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে পালাই-পালাই চাঁদের একটা টুকরো।

প্রবল বাতাসের ঝাপটা হঠাৎই ওদের ঘিরে পাক খেয়ে গেল।

অচ্যুতের চুল উড়তে লাগল। মায়ের কথা মনে পড়ল। বাপির কথা মনে পড়ল। মউলির কথাও।

আর ঠিক তখনই দুটো রক্তপিশাচ অচ্যুতকে ঘিরে নাচ শুরু করল।

অন্ধকারের ওদের সিলুয়েট ছায়ামূর্তিগুলো কীরকম লম্বাটে দেখাচ্ছে। লিকলিকে হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে আঙুলে নানারকম মুদ্রা ফুটিয়ে ওরা পাগলের মতো নাচছে...নাচছে।

অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'মা...মা...মাগো...।'

ওর বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল। ও উবু হয়ে ভিজে মাঠের ওপর বসে পড়ল।

সাপ-খেলানো সুরে হেডস্যার তখন ফিসফিস করে বলছিলেন, 'এ আমাদের বলির নাচ। তোর জীবন আমাদের তেষ্টা মেটাবে। আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দেবে...।'

অচ্যুত জড়ভরতের মতো ফ্যালফ্যাল করে ওঁদের নাচ দেখছিল। আর শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটু পরে ওঁরা অন্ধকার মাঠের ওপরে শুয়ে পড়লেন। সাপের মতো বুকে হেঁটে অচ্যুতকে ঘিরে পাক খেতে লাগলেন।

একসময় হেডস্যার গলা উঁচু করে অচ্যুতের ঘাড়ে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। অচ্যুত সাপের মুখে-পড়া ব্যাঙের মতো নিশ্চল হয়ে গেল।

ঠিক তখনই ধানকলের মাঠের সীমানায় ফুলঝুরির মতো একটা সাদা আলো ফিনকি দিয়ে জ্বলে উঠল।

প্রথমে একটা।

তারপর আর-একটা।

তারপর একে-একে অসংখ্য।

সাদা, সবুজ, নীল, লাল—নানান রঙের রংমশাল জ্বলে উঠল মাঠের কিনারায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঠ ঘিরে রংমশালের রঙিন আলোর এক বৃত্ত তৈরি হয়ে গেল।

শ'য়ে শ'য়ে রংমশাল উদ্দাম ফুর্তিতে জ্বলছে। অন্ধকার মাঠে আলোর উৎসব শুরু হয়ে গেল যেন।

'দুর্গাপুজো কি এসে গেছে? নাকি কালীপুজো!' ঝাপসাভাবে ভাবতে চেষ্টা করল অচ্যুত।

ও চমকে তাকিয়েছিল আলোর দিকে। ঝলসানো আলোয় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে অনেকগুলো মুখ। ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলের দল হাজারো রংমশাল জ্বেলে নতুন এক অকালবোধন শুরু করে দিয়েছে।

সত্যবানস্যার আর হেডস্যারও থমকে গেলেন। ওঁরা চটপট সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আলোর রেখার দিকে।

রংমশালের আলোগুলো এবার তিরবেগে ছুটে আসতে শুরু করল ওঁদের দিকে। আলোর বৃত্তটা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল।

অচ্যুত ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। চোখ কচলে ও ছোট হয়ে আসা বৃত্তটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

অসংখ্য ছেলে, তাদের হাতে জ্বলন্ত রংমশাল—চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

একটু পরে চিৎকারটা বুঝে উঠতে পারল অচ্যুত। জিহাদ মিছিলের স্লোগানের মতো ওরা গলায় গলা মিলিয়ে বারবার বলছে, 'রক্তপিশাচ নিপাত যাক! রক্তপিশাচ নিপাত যাক!'

আনন্দে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। পুজোয় ও তা হলে মউলির মতো আনন্দ করতে পারবে!

ওই তো কুলদীপ! ওই তো সৌরভ! ওই তো বাসব!

সঙ্গে আরও অসংখ্য চেনা-অচেনা মুখ।

হইহই চিৎকার এতক্ষণে একেবারে কাছে এসে গেছে। জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। সত্যবানস্যার আর হেডস্যার ফাঁদে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো ভয়ে এলোমেলো দৌড়চ্ছেন।

অচ্যুত দৌড়ে গেল কুলদীপের কাছে।

কুলদীপ রংমশাল একহাতে সামলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এক অদ্ভুত আনন্দের ঢেউ ওর বুকের ভিতরে উথলে উঠে ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিল।

আর ঠিক তখনই কয়েকশো জ্বলন্ত রংমশাল ছুটন্ত সত্যবানস্যার আর হেডস্যারকে ছুঁয়ে ফেলল।

রক্ত-হিম-করা এক ভয়ংকর আর্তনাদ ধানকলের মাঠের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল। দপ করে জ্বলে উঠল দুই পিশাচের অভিশপ্ত শরীর। ওদের শরীরের ধুনি থেকে কালো ধোঁয়ার গাঢ় কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

সবাই মুখ তুলে সেই ধোঁয়ার দিকে দেখতে লাগল।

রংমশালের আগুন নিভলে অন্ধকারে কয়েকটা টর্চ এদিক-ওদিক জ্বলে উঠল। দেখা গেল দুই পিশাচের তালগোল পাকানো মৃতদেহ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। দুটো সাপবাজির ট্যাবলেট পাশাপাশি পোড়ানোর পর যেরকম দশা হয় অনেকটা সেইরকম।

আকাশে ভেসে যাওয়া কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে তখনও আর্তকান্না শোনা যাচ্ছে।

সৌরভ, প্রতীক আর বাসব অচ্যুতকে একেবারে জাপটে ধরল।

অচ্যুতের চোখের জল বাঁধ মানছিল না। কাঁদতে-কাঁদতেই ও বলল, 'তোরা আমাকে এত ভালোবাসিস!'

কুলদীপ হাতের মাসল ফুলিয়ে বলল, 'এসবের জন্যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে জানিস! রাজীবের মাম্মি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন রংমশাল কেনার জন্যে। পাড়ার দোকানে পাওয়া যায়নি—তাই বাজির আড়তে যেতে হয়েছে।'

আবেগে অচ্যুত কোনও কথা বলতে পারছিল না। ও কুলদীপের গালে একটা চুমু খেল।

এমন সময় কে একজন ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বলেছিলাম না, বীতিহোত্র!'

ওরা পাঁচজন অন্ধকারেই হেসে উঠল। তারপর কী ভেবে অমিয়স্যারকে ঢিপ-ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলল।

অমিয়স্যার অচ্যুতকে লক্ষ করে বললেন, 'তুই শুধু যে ভালো ছেলে তা নয়—অসাধ্বসও বটে!'

বাসব জিগ্যেস করল, 'অসাধ্বস মানে কী, স্যার?'

অমিয়স্যার হেসে বললেন, 'এও জানিস না! অসাধ্বস মানে হল সাহসী, শঙ্কাহীন।'

অচ্যুত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর শরীরটা সামান্য কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। অমিয়স্যারের 'ভালো ছেলে' কথাটা থেকে ওর 'গুড বয়' মনে পড়ল। তারপর 'গুড বয়' থেকে 'অ্যাক্সিডেন্ট'। আর সবশেষে 'অ্যাক্সিডেন্ট' থেকে একজনের কথা মনে পড়ে গেল।

ওকে এবার সব খুলে বলতে হবে।

।।দশ।।

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই।

এখন আমাকে আবার নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরোতে হবে।

আগেই তো বলেছি, আত্মা যদি অমর অবিনশ্বর হয় তা হলে আমার অমর হতে অসুবিধে কী! গীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।' অর্থাৎ, কোনও শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না। অগ্নি ইহাকে দহন করিতে পারে না।

তা হলে আমাকে অগ্নি দহন করবে কেমন করে!

তাই আকাশে, বাতাসে, ধুলোয় মিশে আবার শুরু হোক আমার পথ চলা।

চলতে-চলতে আবার আমাকে খুঁজতে হবে নতুন আশ্রয়। নিতে হবে আবার কোনও নতুন পরিচয়। তারপর আবার বিশ্রাম আর আরাম।

নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, শুরু হবে আমার নতুন জীবন।

আঃ, ভাবতেই কী তৃপ্তি!

সমাপ্ত